রচনা সম্ভার

নবম-দশম শ্রেণী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

রচনা সম্ভার

(নবম-দশম শ্রেণীর জন্য)

রচনা

ড. মাহবুবুল হক
ড. আহমেদ মাওলা

সম্পাদনা

জিয়াউল হাসান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

প্রসঙ্গ কথা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংযোগ ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এসবের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রথমবারের মতো প্রকাশ করল ৬ষ্ঠ, ৭ম-৮ম ও ৯ম-১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা রচনা বই **'রচনা সম্ভার'**।

২০০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত গ্রন্থ তিনটিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তক তিনটিতে রচনাগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কার-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য ও নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে এবং এ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি-চেতনা, নৈতিকতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের সুস্থ চিন্তার চর্চা করানোই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে প্রতিটি রচনাকে এক-একটি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করাই হবে আমাদের কাম্য। এ ছাড়া গ্রন্থগুলোর বিরচন অংশে যেসব বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন, বাক্য-সংকোচন, প্রতিশব্দ, পরিভাষা, বিপরীতার্থক শব্দ, চিঠিপত্র, অনুবাদ, ভাব-সম্প্রসারণ, সারাংশ ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে সেগুলোকেও মডেল হিসেবে গ্রহণ করাই হবে যৌক্তিক। এইসব উদাহরণ বা মডেল-এর ওপর ভিত্তি করে যেন শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন বিষয় নিয়ে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার আলোকে প্রবন্ধ রচনা ও কম্পোজিশন তৈরি করতে পারে, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। রচনা ও সম্পাদনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুধিজনদের পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াস থাকবে।

রচনা সম্ভার শীর্ষক এ গ্রন্থটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

সূচিপত্র

উৎসব ও বিনোদন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

পরিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষা

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

জাতীয় দিবস

গণমাধ্যম ও যোগাযোগ

সমস্যা ও উন্নয়ন

ক. বিরচন

১. বাগ্‌ধারা

বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষ প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাগ্‌ধারা। বিশেষ প্রসঙ্গে শব্দের বিশিষ্টার্থক প্রয়োগের ফলে বাংলায় বহু বাগ্‌ধারা তৈরি হয়েছে। এ ধরনের প্রয়োগের পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ আভিধানিক অর্থ ছাপিয়ে বিশেষ অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠে। যেমন : 'অন্ধকারে ঢিল ছোড়া' কথাটা দিয়ে বোঝানো হয় 'আন্দাজে কিছু করা'। এর সঙ্গে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার বাস্তব কোনো সম্পর্ক নেই।

যে পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ বিশিষ্টার্থক প্রয়োগের ফলে আভিধানিক অর্থের বাইরে আলাদা অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় বাগ্‌ধারা।

বাগ্‌ধারার সাহায্যে আমরা ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করি। ভাবের ইঙ্গিতময় প্রকাশ ঘটিয়ে বক্তব্যকে রসমধুর করে উপস্থাপনের অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে বাগ্‌ধারার। বাগ্‌ধারার মাধ্যমে সমাজের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। এদিক থেকে বাগ্‌ধারা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

বাগ্‌ধারা গঠনে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহারকে শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগও বলা হয়। একে বাগ্‌বিধিও বলা হয়ে থাকে।

বাক্যে বাগ্‌ধারা প্রয়োগের উদাহরণ :

অকাল কুষ্মাণ্ড (অকেজো) : অকাল কুষ্মাণ্ড লোকটা গতকালও কাজটা শেষ করতে পারেনি।
অকালপক্ব (ইঁচড়ে পাকা) : এমন অকালপক্ব ছেলেকে যে শিক্ষকরা প্রশ্রয় দেবেন না তাতে সন্দেহ নেই।
অকূল পাথার (মহাবিপদ) : ভালো কলেজে ভর্তি হতে না পেরে অনেক ছাত্র অকূল পাথারে পড়েছে।
অক্কা পাওয়া (মরে যাওয়া) : যে কোনো দিনই থুত্থুরে বুড়োটা অক্কা পেতে পারে।
অগাধ জলের মাছ (সুচতুর ব্যক্তি) : মোড়ল সাহেব অগাধ জলের মাছ, তাঁকে বোঝা বড় কঠিন।
অগ্নি-পরীক্ষা (কঠিন পরীক্ষা) : ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের শ্রীলংকা সফর ছিল অগ্নি-পরীক্ষা।
অগ্নিশর্মা (খুবই রাগান্বিত) : লোকটার বেয়াদপি দেখে বাবা রেগে অগ্নিশর্মা হলেন।
অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যবিড়ম্বনা) : অদৃষ্টের পরিহাসে অনেক ধনকুবের পথের ফকির হয়ে গেল।
অনধিকার চর্চা (অজানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ) : আমি ব্যবসায়ী মানুষ, সাহিত্যের আলোচনা আমার জন্যে অনধিকার চর্চা।
অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কষ্ট স্বীকার) : অনুরোধে অনেক ঢেঁকি গিলেছি, এখন আর পারছি না।
অন্ধের যষ্টি/নড়ি (অক্ষম লোকের একমাত্র অবলম্বন) : একমাত্র নাতিটি বুড়ির অন্ধের যষ্টি।
অন্ধকার দেখা (বিপদে সমাধানের উপায় না দেখা) : বাবার অকাল-মৃত্যুতে মেয়েটা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।
অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (আন্দাজে কিছু করা) : অন্ধকারে ঢিল না ছুড়ে আসল ঘটনাটা জেনে এসো।
অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ ব্যক্তি বা বস্তু) : আপনি দেখছি অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠেছেন আপনার দেখাই মিলছে না।
অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল অনুনয়) : লোকটা হাড়কৃপণ, ওর কাছে কিছু চাওয়া আর অরণ্যে রোদন একই কথা।
অর্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা) : দারোয়ান উটকো লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের করে দিল।
আকাশকুসুম (অবাস্তব ভাবনা) : শহরের সেরা কলেজে ভর্তি হওয়া অনেকের জন্যই এখন আকাশকুসুম ব্যাপার।
আকাশ থেকে পড়া (স্তম্ভিত হওয়া) : পাপিয়ার কথা শুনে তাসলিমা যেন আকাশ থেকে পড়ল।
আকাশ-পাতাল (সীমাহীন) : শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রায় এখনও আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।
আকাশ ভেঙে পড়া (মহাবিপদে পড়া) : বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ায় অনেক পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।
আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) : কেউ কেউ স্বার্থ হাসিলের জন্য কর্মকর্তাদের আকাশে তোলে।

আকাশের চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) : সেরা কলেজে ভর্তি হতে পেরে ভাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।
আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি অবস্থা) : ছেলেটার কথাবার্তা শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম!
আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) : ধাপ্পাবাজ লোকটার পাল্লায় পড়ে টাকাগুলো আক্কেল সেলামি দিতে হল।
আখের গোছানো (ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেওয়া) : দুর্নীতিবাজরা আখের গুছিয়ে নিলেও পার পাচ্ছে না।
আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বিত্তবান হওয়া) : শেয়ারের ব্যবসায় কুদ্দুস সাহেব এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ।
আট কপালে (হতভাগ্য) : আট কপালে লোকের ভাগ্যে চাকরি জোটা মুশকিল।
আঠারো মাসে বছর (ঢিলেমি) : আমার মামা সব কাজেই দেরি করেন। সবাই বলেন তাঁর নাকি আঠারো মাসে বছর।
আদাজল খেয়ে লাগা (উঠে পড়ে লাগা) : পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য মাহমুদ আদাজল খেয়ে লেগেছে।
আদায় কাঁচকলায় (শত্রুভাবাপন্ন) : ওদের ভাইয়ে ভাইয়ে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, কেউ কাউকে সহ্য করে না।
আবোল-তাবোল (এলোমেলো কথা) : আসল ঘটনা লুকোতে গিয়ে সে আবোল-তাবোল বকে চলেছে।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকেজো লোক) : ও একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি, ওকে দিয়ে কাজটা হবে না।
আমলে আনা (গুরুত্ব দেওয়া) : পুলিশ দারোয়ানের কোনো কথাই আমলে আনল না।
আলালের ঘরের দুলাল (বড় লোকের আদুরে ছেলে) : এই আলালের ঘরের দুলালটি কাজ দেখলে ভয় পায়।
আষাঢ়ে গল্প (বানানো কথা) : সময়মতো কাজে আসোনি, তার জন্যে আষাঢ়ে গল্প বলার দরকার কী?
আসমান-জমিন ফারাক (বিপুল ব্যবধান) : ধনী ও গরিবের জীবনযাত্রায় আসমান-জমিন ফারাক।
আস্তানা গাড়া (সাময়িকভাবে কোথাও থাকতে শুরু করা) : বানভাসি লোকগুলো বাঁধের ওপর আস্তানা গেড়েছে।
আহ্লাদে আটখানা (আনন্দে আত্মহারা) : মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ-প্লাস পেয়ে সে আহ্লাদে আটখানা।
ইঁচড়ে পাকা (অল্প বয়সেই পেকে গেছে এমন) : ওই ইঁচড়ে পাকা ছেলেটাকে পাত্তা দিলেই ঘাড়ে চেপে বসবে।
ইতর বিশেষ (সামান্য পার্থক্য) : ফলাফলে একই গ্রেড প্রাপ্তদের মধ্যে ইতর বিশেষ করা মুশকিল।
উড়ে এসে জুড়ে বসা (বিনা অধিকারে এসে সর্বেসর্বা হয়ে বসা) : উনি উড়ে এসে জুড়ে বসে মাতব্বরি করবেন, তা পুরোনোরা মানবেন কেন?
উত্তম-মধ্যম (প্রচণ্ড মার) : ছিনতাইকারীকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল।
উভয় সংকট (দু দিকেই বিপদ) : বিজ্ঞান না বাণিজ্য, কোনটা পড়ব এ নিয়ে উভয় সংকটে পড়েছি।
উলুবনে মুক্তো ছড়ানো (অস্থানে মূল্যবান কিছু প্রদান) : ওকে জ্ঞান দেওয়া আর উলুবনে মুক্তো ছড়ানো একই কথা।
এঁটে ওঠা (সমানে পাল্লা দিতে পারা) : তোমার সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল।
এক কথার মানুষ (কথা রাখে এমন) : আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, আমি এক কথার মানুষ।
একচোখো (পক্ষপাতদুষ্ট) : একচোখো লোকের কাছে কখনো সুবিচার আশা করা যায় না।
এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) : সওদাগর সাহেবের মেয়ের বিয়ে, এলাহি কাণ্ড তো হবেই।
একাই এক শ (যথেষ্ট সমর্থ) : ঐ পুঁচকে ছোঁড়াকে মোকাবেলার জন্য আমি একাই এক শ।
এসপার ওসপার (যে-কোনোভাবে মীমাংসা) : ঝামেলাটা আর সহ্য হয় না। এবার এসপার ওসপার করতেই হবে।
ওত পাতা (সুযোগের অপেক্ষায় থাকা) : বিড়ালটা মাছ চুরি করার জন্য ওত পেতে রয়েছে।
কড়ায় গণ্ডায় (সূক্ষ্ম হিসেব অনুযায়ী) : ও তাঁর পাওনা কড়ার গণ্ডায় বুঝে নিতে এসেছিল।
কথার কথা (হালকা কথা) : আমি কথার কথা একটা মন্তব্য করেছি আর তাতেই রাজু খেপে গেল।
কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ) : ছেলেটা হঠাৎ বিদেশে চাকরি পাওয়ায় চাচা-চাচির কপাল ফিরেছে।
কলুর বলদ (অন্যের জন্য একটানা খাটুনি) : সংসারের হাল ধরতে ছোট মামা কলুর বলদের মতো ঘানি টানছেন।
কাঁচা পয়সা (অল্প আয়াসে নগদ উপার্জন) : দুর্নীতি করে অনেকেই কাঁচা পয়সা কামাই করেছে।
কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব বস্তু) : বাংলায় ১০০-তে ১০০ নম্বর পাওয়া কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো।

কাছাটিলা (অগোছালো স্বভাবের) : যেমন কাছাটিলা লোক তুমি, ছাতা তুমি হারাবে না তো কে হারাবে?

কাঠখড় পোড়ানো (নানারকম চেষ্টা ও পরিশ্রম) : কাজটা হাসিলের জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

কাঠের পুতুল (নির্জীব, অসার লোক) : কোনো কোনো মন্ত্রী হয়ে যান কাঠের পুতুল, সব কাজ চালান তাঁর সচিব।

কান খাড়া করা (মনোযোগী হওয়া) : আদালতে কী রায় হয় তা শোনার জন্য আইনজীবীরা কান খাড়া করে রইল।

কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) : বড় সাহেব এমন কান পাতলা যে তার অধীনে কাজ করাই মুশকিল।

কান ভারী করা (কারও বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি) : তুমি নাকি আমার বিরুদ্ধে বড়কর্তার কান ভারী করেছ?

কুল কাঠের আগুন (তীব্র মনঃকষ্ট) : লাঞ্ছনা অপমানে তার মনের মধ্যে কুল কাঠের আগুন জ্বলতে লাগল।

কূপমন্ডূক (সংকীর্ণমনা লোক) : আমাদের সমাজে কূপমন্ডূক লোকের অভাব নেই।

কেউকেটা (নিন্দার্থে গণ্যমান্য লোক) : আপনি কী এমন কেউকেটা যে আপনার কথা শুনতেই হবে!

কেঁচে গণ্ডূষ করা (পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করা) : পুরো হিসাবটাই ভুল হয়েছে। আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ (সামান্য ঘটনার সূত্রে গুরুতর ঘটনা প্রকাশ) : জাল টাকা তদন্ত করতে গিয়ে বিরাট জালিয়াতি চক্র ধরা পড়ল—এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

কোমর বাঁধা (কাজে উঠে পড়ে লাগা) : পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য তাহমিনা কোমর বেঁধে পড়াশুনায় লেগেছে।

খন্ড প্রলয় (তুমুল কান্ড) : মোবাইল ফোন হারানোকে কেন্দ্র করে পাশের বাসায় একটা খন্ড প্রলয় ঘটে গেছে।

খয়ের খাঁ (খোশামোদকারী, চাটুকার) : ক্ষমতাসীনদের চারপাশে খয়ের খাঁ লোকের ভিড় জমে যায়।

খুঁটির জোর (পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা) : খুঁটির জোর আছে বলেই সে বারবার বদলি ঠেকায়।

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধের মতো অনুসরণ) : বিত্তের মোহে সমাজের অনেকে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়।

গণ্ডারের চামড়া (অপমান বা তিরস্কার গায়ে লাগায় না এমন) : ওর বোধ হয় গণ্ডারের চামড়া, তাই শত অপমানেও কোনো ভাবান্তর নেই।

গদাই লশকরি চাল (ঢিলেমি) : এমন গদাই লশকরি চালে চললে কাজটা এ মাসেও শেষ হবে না।

গলগ্রহ (দায় বা বোঝা) : অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে না থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।

গাছে তুলে মই কাড়া (কাজে নামিয়ে সরে পড়া) : তোমার ভরসায় এত বড় কাজে হাত দিয়েছি। এখন গাছে তুলে মই কেড়ে নিচ্ছ যে!

গায়ে পড়া (অযাচিত ঘনিষ্ঠতা) : অমন গায়ে পড়া লোককে চেয়ারম্যান সাহেব পাত্তা দেবেন বলে মনে হয় না।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা) : ও নেবে দায়িত্ব? গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানোই যে ওর স্বভাব।

গোঁয়ার গোবিন্দ (নির্বোধ ও একগুঁয়ে লোক) : কাজটা বুঝে শুনে করবে। গোঁয়ার গোবিন্দের মতো করলে চলবে না।

গোড়ায় গলদ (মূলে কিংবা শুরুতে ভুল) বিয়ের আয়োজনে গোড়ায় গলদ ছিল বলে এত বিশৃঙ্খলা।

গোবর গণেশ (বোকা, অকর্মণ্য লোক) : ছেলেটার না আছে বুদ্ধি, না পারে কোনো কাজ ও একেবারে গোবর গণেশ।

গোল্লায় যাওয়া (উচ্ছন্নে যাওয়া) : বাবা-মায়ের আদরের ঠেলায় ছেলেটা গোল্লায় গেছে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে স্বস্থি) : ছেলেটা ঘরে ফিরে আসায় সবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

ঘাস কাটা (বাজে কাজে সময় নষ্ট করা) : অন্যেরা কাজ করবে আর তুমি বসে বসে ঘাস কাটবে? তা হবে না।

ঘোড়া রোগ (উৎকট বাতিক) : ভাত জোটে না, বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করতে চায় গরিবের ঘোড়ারোগ আর কি!

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (উপরওয়ালাকে এড়িয়ে কাজ হাসিল) : সরকারি অফিসে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কঠিন।

ঘোড়ার ডিম (অস্তিত্বহীন বস্তু) : ও তোকে বইটা দেবে? ঘোড়ার ডিম দেবে।

চাঁদের হাট (সুখের সংসার) : অবসর জীবনে শরীফ সাহেব কৃতী সন্তানদের নিয়ে চাঁদের হাট বসিয়েছেন।

চোখে চোখে রাখা (সতর্ক নজরদারি) : অজানা-অচেনা কেউ এলে তাকে চোখে চোখে রাখা দরকার।

চোখে ধুলো দেওয়া (ফাঁকি দেওয়া) : পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অপরাধী গা ঢাকা দিয়েছে।

চোখের বালি (চক্ষুশূল; ক্রোধ বা বিরক্তির কারণ) : মা-মরা ছেলেটা কত শান্ত, তবু সে তার সৎ-মায়ের চোখের বালি।
ছিনিমিনি খেলা (বেহিসাবি খরচ) : উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।
ছেঁকে ধরা (ঘিরে ধরা) : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সবাই কারখানার মালিককে ছেঁকে ধরেছে।
ছেলের হাতের মোয়া (সহজপ্রাপ্য জিনিস) : ভালো ফলাফল ছেলের হাতের মোয়া নয়, এ জন্যে যথেষ্ট পড়াশুনা দরকার।
জগাখিচুড়ি (অবাঞ্ছিত জটিলতা) : তোমার জগাখিচুড়ি কাজ দেখলে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে।
জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি) : ওর মনে যে এত জিলিপির প্যাঁচ তা বুঝব কী করে!
ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝে কাজ করা) : ঝোপ বুঝে কোপ মারতে না জানলে ব্যবসায়ে টেকা মুশকিল।
টনক নড়া (চৈতন্য হওয়া) : ব্যবসা লাটে উঠতেই তার টনক নড়ল।
ঠাঁট বজায় রাখা (অভাব লুকানো) : জমিদারি নেই, কিন্তু চৌধুরী বংশে এখনও জমিদারি ঠাঁট বজায় আছে।
ঠোঁট কাটা (স্পষ্টবাদী) : ঠোঁট কাটা লোক অনেকেরই অপছন্দ।
ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য ব্যক্তি বা বস্তু) : কী ব্যাপার! তুমি হঠাৎ ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে?
ঢিমে তেতালা (খুবই মন্থর গতি) : এমন ঢিমে তেতালাভাবে পড়াশুনা করলে সিলেবাস শেষ হবে না।
তালকানা (তালজ্ঞান বর্জিত) : উনি তালকানা লোক। ওর কাছে পরিপাটি কাজ আশা করছ কেন?
থ বনে যাওয়া (বিস্ময়ে হতবাক হওয়া) : লোকটার কাণ্ড দেখে সবাই থ বনে গেল।
তাসের ঘর (ভঙ্গুর) : ওদের বন্ধুত্ব তাসের ঘরের মতোই ভেঙে গেছে।
তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) : তামার বিষে ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।
দা-কুমড়ো (নিদারুণ শত্রুতা) : ভাইয়ে ভাইয়ে এখন একেবারে দা-কুমড়ো সম্বন্ধ।
দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) : ধনীর দুলাল ছেলেটাকে দুধের মাছিরা ঘিরে রেখেছে।
দুমুখো সাপ (দু রকম আচরণকারী, ক্ষতিকর লোক) : লোকটা আস্ত দুমুখো সাপ, তোমাকে বলেছে একরকম আমাকে অন্যরকম।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অতিরিক্ত দম্ভে কিছুই গ্রাহ্য না করা) : পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।
ননির পুতুল (অল্প শ্রমে কাতর): ফারিহা তো ননির পুতুল, এত পরিশ্রমের কাজ ওকে দিয়ে হবে না।
নাক গলানো (অনধিকার চর্চা) : যে কোনো ব্যাপারে নাক গলানো কারো কারো স্বভাব।
নেই আঁকড়া (নাছোড়বান্দা) : কী যে নেই আঁকড়া লোকের পাল্লায় পড়েছি! রেহাই মিলছে না।
পটল তোলা (মারা যাওয়া) : চাঁদাবাজটা পটল তুলেছে শুনে এলাকার লোকজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
পথে বসা (সর্বস্বান্ত হওয়া) : বন্যায় সব হারিয়ে অনেকে এবার পথে বসেছে।
পালের গোদা (দলের চাঁই, সর্দার) : পুলিশ পালের গোদাকে কোর্টে চালান দিয়েছে।
পুকুর চুরি (বড় রকম চুরি) : রাস্তা মেরামত না করেই ঠিকাদার ৫০ লাখ টাকা নিয়েছে এ যে রীতিমতো পুকুর চুরি।
ফাঁক-ফোকর (দোষত্রুটি) : আইনের ফাঁক-ফোকর গলে সন্ত্রাসীরা জামিনে খালাস পেয়ে যাচ্ছে।
ফেঁপে ওঠা (হঠাৎ বিত্তবান হওয়া) : চোরাচালানি করে কেউ কেউ রাতারাতি ফেঁপে উঠেছে।
ফোঁড়ন কাটা (টিপ্পনী কাটা) : কথার মাঝখানে ফোঁড়ন কাটা ওর অভ্যাস।
ফোপরদালালি (নাক গলানো আচরণ) : সব ব্যাপারে ওর ফোপরদালালি করার অভ্যাস।
বকধার্মিক (ভণ্ড) : সমাজে বকধার্মিক লোকের অভাব নেই।
বর্ণচোরা আম (কপট লোক) : লোকটা একটা বর্ণচোরা আম। বাইরে থেকে ওকে বোঝা মুশকিল।
বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ দেওয়া-নেওয়া) : এ অফিসে বাঁ হাতের ব্যাপার ছাড়া ফাইল নড়ে না।
বাজিয়ে দেখা (পরখ করা) : সে ঘটনাটা জানে কিনা একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।
বাপের বেটা (সাহসী) : শাবাশ! বাপের বেটার মতোই করেছিস কাজটা।

বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) : বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর বালির বাঁধ একই কথা।
বিড়াল-তপস্বী (ভণ্ড সাধু) : সমাজে মাঝে মাঝে বিড়াল-তপস্বীদের তৎপরতা বেড়ে যায়।
বিদ্যার জাহাজ (মূর্খ বা অশিক্ষিত লোক) : যে নিজে বিদ্যার জাহাজ সে অন্যকে কী শেখাবে?
বুকের পাটা (সাহস) : মাস্তানটার বিরুদ্ধে তুই অভিযোগ করেছিস! তোর বুকের পাটা আছে বলতে হবে।
বুদ্ধির ঢেঁকি (নির্বোধ) : এ কাজের জন্য চাই চালাক-চতুর লোক, বুদ্ধির ঢেঁকি দিয়ে এ কাজ হবে না।
ভিজে বেড়াল (বাইরে নিরীহ ভেতরে ধূর্ত) : ভিজে বেড়ালদের অনেক সময় চেনা যায় না।
ভরাডুবি (সর্বনাশ) : আদমজি পাটকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাটচাষিদের এবার ভরাডুবি হয়েছে।
ভুঁইফোঁড় (হঠাৎ বড়লোক) : মানুষ সচেতন হলে ভুঁইফোঁড়দের দাপট না কমে পারে না।
ভূতের বেগার (অযথা শ্রম দান) : সারাক্ষণ ভূতের বেগার খাটছি, লাভ কিছুই হচ্ছে না।
মামাবাড়ির আবদার (চাইলেই পাওয়া যায় এমন) : গতকাল ১০০ টাকা নিলে। আজ আবার ২০০ টাকা চাইছ। একি মামাবাড়ির আবদার নাকি?
মিছরির ছুরি (আপাতত মধুর হলেও শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক) : তোমার কথাগুলো ঠিক যেন মিছরির ছুরি।
যক্ষের ধন (কৃপণের কড়ি) : পৈতৃক ভিটেটা সে যরে ধনের মতো আগলে রেখেছে।
রুই-কাতলা (প্রভাবশালী) : সমাজের রুই-কাতলাদের দাপটে চুনোপুঁটিদের অবস্থা এখন কাহিল।
লেফাফা দুরস্থ (বাইরের ঠাঁট ষোল আনা) : ঘরে যে এমন টানাটানি, তা ওর লেফাফা দুরস্থ ভাব দেখে কে বুঝবে?
রাশভারি (গম্ভীর) : আমাদের প্রধান শিক্ষক রাশভারি লোক। সবাই তাকে ভয় পায়।
শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) : আমার বড়মামা চাকরি না পেয়ে ব্যবসায়ে ঢুকেছেন। এতে তাঁর শাপে বর হয়েছে।
সেয়ানে সেয়ানে (দুই সমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে) : দুজনের মধ্যে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলছে অনেকদিন।
সোনায় সোহাগা (সার্থক মিলন) : পরীক্ষায় পাস করতে না-করতেই এমন ভালো চাকরি পাওয়া, এ যে সোনায় সোহাগা!
হ-য-ব-র-ল (উল্টোপাল্টা) : অনুষ্ঠানের হ-য-ব-র-ল অবস্থা দেখে চলে এসেছি।
হাড়-হাভাতে (একেবারে নিঃস্ব) : হাড়-হাভাতে ছেলেটা যে কীভাবে এ সংসারে এসে জুটল বলতে পারব না।
হাতটান (ছোটখাটো চুরির অভ্যাস) : ছেলেটা কাজে-কর্মে বেশ ওস্তাদ। তবে দোষের মধ্যে হাতটান আছে।
হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) : হাতের পাঁচ হিসেবে হাজারখানেক টাকা আছে। তোমাকে ধার দেব কেমন করে?
হালে পানি না পাওয়া (কাজ হাসিলের উপায় না পাওয়া) : সে বড় কাজে হাত দিয়েছে, কিন্তু হালে পানি পাচ্ছে না।

অনুশীলনী

প্রয়োগমূলক নমুনা-প্রশ্ন

১. নিচের বাগ্‌ধারাগুলোর প্রত্যেকটির অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর:

ক) অমাবস্যার চাঁদ, আকাশের চাঁদ, আকাশ কুসুম, কাঁচা পয়সা, ফাঁক-ফোকর।

খ) অনুরোধে ঢেঁকি গেলা, অন্ধকারে ঢিল ছোড়া, আকাশে তোলা, কাঠখড় পোড়ানো, কান খাড়া করা।

গ) অগাধ জলের মাছ, এক চোখো, কাঠের পুতুল, কেউকেটা, বিড়াল-তপস্বী।

ঘ) আক্কেল গুড়ুম, ইঁচড়ে পাকা, কান পাতলা, খয়ের খাঁ, দুমুখো সাপ।

ঙ) আখের গোছানো, আমলে আনা, টনক নড়া, পথে বসা, বাজিয়ে দেখা।

২. অর্থ-পার্থক্য দেখিয়ে বাক্য রচনা কর :

ক) অন্ধকার দেখা, অন্ধকারে ঢিল ছোড়া।

খ) আকাশ-কুসুম, আকাশ-পাতাল।

গ) আক্কেল গুড়ুম, আক্কেল সেলামি।

ঘ) কান খাড়া করা, কান ভারী করা।

ঙ) গায়ে পড়া, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো।

নৈর্ব্যক্তিক নমুনা-প্রশ্ন

ঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও :

১. ‘অকূল পাথার’ শব্দের প্রায়োগিক অর্থ কোনটি?

ক. সীমাহীন সাগর খ. মহাবিপদ

গ. বিশাল প্রস্তরখন্ড ঘ. গোমেদ পাথর

২. ‘অক্কা পাওয়া’ কথাটির অর্থ কী?

ক. আঘাত পাওয়া খ. মরে যাওয়া

গ. কষ্ট পাওয়া ঘ. দুঃখ পাওয়া

৩. ভাগ্য বিড়ম্বনা বোঝাতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. কপাল ফেরা খ. ফেঁপে ওঠা

গ. অদৃষ্টের পরিহাস ঘ. আঙুল ফুলে কলাগাছ

৪. ‘আকাশকুসুম’ বলতে কী বোঝায়?

ক. অতিরিক্ত প্রশংসা খ. অবাস্তব ভাবনা

গ. হতবুদ্ধি অবস্থা ঘ. বিস্তর ব্যবধান

৫. বোকামির দন্ড অর্থে কোন বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়?

ক. আক্কেল সেলামি খ. অর্ধচন্দ্র

গ. আক্কেল গুড়ুম ঘ. তামার বিষ

৬. ‘খণ্ডপ্রলয়’ প্রবাদটি কোন অর্থ প্রকাশ করে?

ক. মহা ঝড়-ঝাপটা খ. তুমুল কান্ড

গ. ছোটখাটো কথা কাটাকাটি ঘ. ভয়ংকর ঘটনা

৭. ‘কুল কাঠের আগুন’ বাগধারাটির অর্থ কোনটি?

ক. তীব্র মনঃকষ্ট খ. অগ্নিশর্মা

গ. কাঠখড় পোড়ানো ঘ. অগ্নিকান্ড

৮. একগুঁয়ে ভাবটি কোন প্রবাদে প্রকাশ পায়?

ক. উড়নচন্ডী খ. গোঁফখেজুরে

গ. রাঘব বোয়াল ঘ. গোঁয়ার গোবিন্দ

৯. 'গোল্লায় যাওয়া' বাগধারাটি কোন অর্থ বহন করে?

ক. উচ্ছন্নে যাওয়া খ. ঘর ছাড়া

গ. পরনির্ভরশীল হওয়া ঘ. আদর পাওয়া

১০. কোন বাগধারাটি 'তাসের ঘর' বাগধারার সমার্থক?

ক. ঘরের ঢেঁকি খ. ঘর ভাঙানো

গ. চোরাবালি ঘ. বালির বাঁধ

১১. 'তামার বিষ' কথাটার অর্থ কী?

ক. অহংকার খ. বিষদ্রব্য

গ. অর্থের কুপ্রভাব ঘ. বিষাক্ত তামা

১২. 'দুধের মাছি' বাগধারাটি কী অর্থ বহন করে?

ক. চালবাজ খ. সুসময়ের বন্ধু

গ. ভন্ড সাধু ঘ. দুর্দিনের সাথী

১৩. 'বাইরের ঠাঁট বজায় রেখে চলে' এমন ভাব বোঝাতে কোন বাগধারা প্রচলিত?

ক. ব্যাঙের আধুলি খ. ঠোঁটকাটা

গ. লেফাফা দুরস্থ ঘ. ভিজে বেড়াল

১৪. 'অনিষ্টে ইষ্ট লাভ' বোঝাতে কোন বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়?

ক. আহ্লাদে আটখানা খ. তামার বিষ

গ. শাপে বর ঘ. হিতে বিপরীত

২. সারমর্ম ও সারাংশ লিখন

গদ্য বা পদ্য রচনার কোনো না কোনো অন্তর্নিহিত মূল ভাব থাকে। সহজ ও সাবলীল ভাষায় সংক্ষেপে তা লেখার নাম সারমর্ম বা সারাংশ। সাধারণত গদ্যের ভাব-সংক্ষেপণ বোঝাতে সারাংশ ও পদ্যের ভাব-সংক্ষেপণ বোঝাতে সারমর্ম কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সারমর্ম/সারাংশ লেখার ক্ষেত্রে নির্দেশনা

সারমর্ম কিংবা সারাংশ লেখার দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়। চর্চা যত বেশি হয় ততই শিক্ষার্থীর পক্ষে রচনার মূল ভাববস্তু উপলব্ধির মতা ও রচনা-নৈপুণ্য বাড়ে। সারমর্ম/সারাংশ লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলো বিশেষ বিবেচনায় রাখা দরকার :

১. **পঠন :** সারমর্ম বা সারাংশ লিখতে গেলে অনুচ্ছেদের তথ্য লিখলে চলে না, মূল ভাব বুঝে নিয়ে তাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হয়। তাই প্রথমেই মূল ভাব বোঝার জন্য রচনাটি ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়া দরকার।

২. **মূল ভাব সন্ধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিহ্নিতকরণ :** প্রদত্ত রচনাংশে সাধারণত একটি মূল ভাব বা বক্তব্য থাকে। কখনো কখনো একাধিক মূল ভাব বা বক্তব্যও থাকতে পারে। তা উপলব্ধি করতে পারলে সারমর্ম ও সারাংশ লেখা সহজ হয়। মূল ভাব খুঁজে নেওয়ার একটা ভালো উপায় হচ্ছে, যেসব বাক্য বা বাক্যাংশ মূল ভাবের দ্যোতক বলে মনে হয় সেগুলো চিহ্নিত করা।

৩. **বাহুল্য বর্জন :** অপ্রয়োজনীয় অংশ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ আলাদা করার মাধ্যমে সহজে মূল ভাব বের করা যায়। এজন্যে মূল রচনাংশে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি, বর্ণনা, সংলাপ, উদাহরণ, অলংকার (উপমা-রূপক) ইত্যাদি বাদ দিতে হয়।

৪. **ভিন্নতর প্রসঙ্গের অবতারণা না করা :** সারমর্ম কিংবা সারাংশ অবশ্যই মূল রচনার ভাবধারণার মধ্যে সীমিত থাকে। তাই মূল ভাবের বাইরে অন্য কোনো ব্যক্তিগত মতামত বা মন্তব্য সারমর্মে/সারাংশে প্রকাশ করা চলে না।

সারমর্ম/সারাংশ রচনার কৌশল

ক. **অনুচ্ছেদ :** সারমর্ম কিংবা সারাংশ একটি অনুচ্ছেদে লেখা উচিত।

খ. **প্রারম্ভিক বাক্য :** প্রারম্ভিক বাক্য যথাসম্ভব সংহত ও আকর্ষণীয় হওয়া চাই। এতে পাঠক বা পরীক্ষক শুরুতেই চমৎকৃত হন।

গ. **প্রসঙ্গ বাক্য :** প্রসঙ্গ বাক্য (মূল ভাবটুকু প্রকাশের চুম্বক বাক্য) সারমর্ম/সারাংশের প্রথমে থাকলে ভালো। তা প্রয়োজনে মধ্যে কিংবা শেষেও থাকতে পারে।

ঘ. **প্রত্যক্ষ উক্তি : মূলে** প্রত্যক্ষ উক্তি থাকলে তা পরোক্ষ উক্তিতে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হয়।

ঙ. **পুরুষ :** সারমর্মে/সারাংশে উত্তম পুরুষে (আমি, আমরা) বা মধ্যম পুরুষে (তুমি, তোমরা) লেখা চলে না। বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিকভাবে লিখতে হয়।

চ. **উদ্ধৃতি :** মূলে কোনো উদ্ধৃতাংশ থাকলে সারমর্মে উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জিত হবে এবং সংক্ষিপ্ত ও সংহতরূপে তা প্রকাশ করতে হবে।

ছ. **ভাষা :** সারমর্ম ও সারাংশের ভাষা সরল ও সাবলীল হওয়া দরকার। তাই জটিল বাক্যের পরিবর্তে সরল বাক্য এবং দুরূহ শব্দের পরিবর্তে সহজ-সরল শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

জ. **হুবহু উদ্ধৃতি বা অনুকৃতি :** মূলের কোনো অংশের হুবহু উদ্ধৃতি বা অনুকৃতি সারমর্ম/সারাংশে গ্রহণীয় নয়। মূলের কোনো অংশকে সামান্য অদল-বদল করে লিখে দেওয়াও অনুচিত।

ঝ. **পরিসর :** সারমর্ম/সারাংশ কত বড় বা ছোট হবে তা নির্ভর করে প্রদত্ত অংশে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব ও গভীরতার ওপর। প্রদত্ত রচনার ভাববস্তু সুসংহত ও নিরেটভাবে প্রকাশিত হলে তা সংক্ষেপ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সারমর্ম/সারাংশ মূলের সমান, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা তার কমও হতে পারে।

ঞ. **খসড়া :** সারমর্ম কিংবা সারাংশ লেখার সময়ে প্রথম প্রদত্ত রচনার মূল ভাবটুকুর আলোকে একটি প্রাথমিক খসড়া দাঁড় করানো ভালো। তারপর প্রয়োজনমতো পরিমার্জনা করে পুনর্লিখন করে নিতে হয়।

সারমর্ম/সারাংশের নমুনা

১

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়েঘরে।

সারমর্ম: স্বর্গ ও নরক কেবল সুদূর পরলোকের ব্যাপার নয়। ইহলোকেও এদের অস্তিত্ব রয়েছে। বিবেকহীন মানুষের অপকর্ম ও নিষ্ঠুরতার বিস্তার ঘটলে জগৎ হয়ে ওঠে নরকতুল্য। আর মানুষে মানুষে সম্প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে উঠলে জগৎ হয়ে ওঠে স্বর্গীয় সুষমাময়।

২

তরুতলে বসে পান্থ শ্রান্তি করে দূর,
ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙে লয়,
তরু তবু অকাতর কিছু নাহি কয়।
দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছ যখন,
তরুর আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ।
পরার্থে আপন সুখ দিয়ে বিসর্জন,
তুমিও হও গো ধন্য তরুর মতোন।

সারমর্ম : গাছপালা ছায়া দিয়ে, ফল দিয়ে, শাখা দিয়ে মানুষের উপকার করে। পরের সেবা করেই বৃক্ষের জীবন ধন্য। মানুষেরও উচিত বৃক্ষের পরোপকারের আদর্শকে জীবনে অনুসরণ করা। তাহলেই মানবজীবন ধন্য ও সার্থক হবে।

৩

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ-পাতাল জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গালে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিক বুকে ধরে তুমি খোঁজো তারে দেশ-দেশ,
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে, তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টার খোঁজে আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে।
ইচ্ছা অন্ধ। আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অজানা জন্মদাতারে চিনি।

সারমর্ম : সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার অবস্থান। নিজেকে চিনে সৃষ্টির সেবাতে আত্মনিয়োগ করে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায়। বৈরাগ্য সাধনা করে তাকে পাওয়া যায় না।

৪

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

সারমর্ম : দুঃখ-বিপদ উত্তরণে মানুষের প্রধান অবলম্বন মানসিক দৃঢ়তা। অন্যের করুণা-নির্ভর না হয়ে আত্মশক্তি ও সংগ্রামী চেতনার বলেই মানুষ দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বঞ্চনা মোকাবেলা করতে পারে। আত্মশক্তির বলেই জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়।

৫

আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে সেবিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

সারমর্ম : শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রমে ও অপরিসীম ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদিক থেকে শ্রমজীবীরাই সত্যিকারের মহৎ মানুষ। কিন্তু সমাজজীবনে এরা বঞ্চিত, শোষিত ও উপেক্ষিত। এখন দিন এসেছে। শ্রমজীবী মানুষেরাই একদিন নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পালাবদলের সূচনা করবে।

৬

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মতো কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মতো কেন চলিস?
তোর নিজত্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন নামটা তার কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে,
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি নারে।

সারমর্ম : অন্ধ পরানুকরণ মানুষের জন্যে মর্যাদাকর নয়। কারণ, তা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির সৃজনশীল বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। বস্তুত, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি প্রকাশের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকারের মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

৭

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ-সুখ' করি কেঁদো না আর;

যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী ’পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম : আত্মস্বার্থে বিভোর না হয়ে পরের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করলে প্রকৃত সুখ মেলে। বস্তুত, মানবজীবন ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক নয়; একে অন্যের কল্যাণে ব্রতী হওয়াই মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য।

৮

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কি বা তাহে,
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্র রূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় ভেঙে পড়ে
ঊর্ধ্বে দু হাত বাড়াস।

সারমর্ম : ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মানুষকে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় পথ অতিক্রম করতে হয়। দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে লড়াই না করে এবং বিপদকে মোকাবেলা না করে জীবনে সাফল্য অর্জিত হয় না।

৯

সবারে বাস রে ভালো
নইলে মনের কালো মুছবে না রে!
আজ তোর যাহা ভালো
ফুলের মতো দে সবারে।
করি তুই আপন আপন,
হারালি যা ছিল আপন
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস ফণী
তারো মাথায় আছে মণি
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি
ভবের বনে ভয় বা কারে?
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে।

সারমর্ম : কেবল নিজেকে নিয়ে বিভোর থাকলে, অন্যকে দূরে ঠেললে মানুষ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। জীবনকে সার্থক ও মহীয়ান করতে হলে মানুষ মানুষে চাই প্রীতি ও প্রেমের মেলবন্ধন।

১০

ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি;

দাঁড়াইত স্থিরভাবে চলিত না, হায়
মন্ত্রবলে তুমি চক্র, না ঘুরাতে যদি।
ভবিষ্যৎ অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার;
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ, পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবনযুদ্ধে হায় অনিবার।
নাচায় পুতুল যেমন দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।

সারমর্ম : আশাই মানুষের জীবন-সংগ্রামের প্রণোদনা। আশাহীন জীবন হয়ে পড়ে স্থবির ও নিশ্চল। আশার জাদুতেই মানুষ জীবনে নানা সংকট ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে; মঙ্গল ও সমৃদ্ধির আশায় কাজ করে যায় সারা জীবন।

১১

"বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?"
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
"আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে;
তোমার গৌরব তাহে একেবারেই ছাড়ে।"

সারমর্ম : ধরণীর শস্যসম্পদ অনায়াসলভ্য নয়। তাই মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও শ্রমের এত মূল্য। অন্যের করুণা-নির্ভরতায় মানুষ মর্যাদা পায় না। পরিশ্রমই মানুষের অস্তিত্বের অবলম্বন এবং মর্যাদার কষ্টিপাথর।

১২

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার, আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে,
সাধকজনে বিস্তারিত তার মতো কে জানে?
বিনা মূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্বমাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপাভরে।

সারমর্ম : নিন্দুকের করা সমালোচনা আমাদের সবার জন্য মঙ্গলজনক। এতে আমরা আমাদের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারি। নিন্দুক সমালোচনার মাধ্যমে ত্রুটি নির্দেশ করে পরোভাবে ব্যক্তি ও সমাজের উপকার করে থাকে।

১৩

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে
জানি নে তোর ধন-রতন আছে কিনা রানীর মতোন,

শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এ
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন মেলে মুদিব নয়ন শেষে

সারমর্ম : জন্মভূমির প্রতি মানুষের ঋণ অপরিসীম। জন্মভূমির আলো-বাতাস, গাছপালা, মাটি ও পরিবেশ মানুষের জীবনের জিয়নকাঠি। তাই জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পারলে এবং জন্মভূমির মাটিতে শেষ আশ্রয় পেলে জীবন হয় সার্থক।

১৪

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুক স্তবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর,
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সারমর্ম : স্বদেশ ও স্বজাতির সেবার মাধ্যমে মানবজীবন হয়ে ওঠে মহৎ। জ্ঞান ও বিত্ত, প্রতিভা ও শক্তি, সম্পদ ও বিলাসিতার জোরে মানুষ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে পারে। কিন্তু দেশপ্রেম-বিবর্জিত মানুষের কোনো সম্মান ও মর্যাদা নেই। দেশ ও জাতির ঘৃণাই তার প্রাপ্য।

১৫

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
ব্যথা নাহি পায় কোনো, তারে দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ড বেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারেও দিও না।
যে তোমার পুত্র নহে, তারও পিতা আছে
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

সারমর্ম : অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল বিচারই আদর্শ বিচার। অপরাধকে গর্হিত চিহ্নিত করে অপরাধীকে মমতার চোখে দেখে সংশোধনমুখী করাই প্রকৃত বিচারকের দায়িত্ব।

১৬

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থ বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচন্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় করতে না পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

সারাংশ : অর্থ-সম্পদের অন্ধ নেশা একালে মানুষকে এক চরম অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণ না পেলে মানুষের মনুষ্যত্বই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে।

১৭

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

সারাংশ : অন্য সব প্রাণীর মতো জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তার মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব অর্জনে প্রধান ভূমিকা রাখে শিক্ষা। শিক্ষাই তার অন্তরকে আলোকিত করে, তার মধ্যে জীবনরস সঞ্চার করে। শিক্ষার গুণেই মানুষ জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে শেখে।

১৮

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মতো দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎকাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়বিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

সারাংশ : অতীতের ব্যর্থতার জন্য আপে করে কিংবা ভবিষ্যতের সাফল্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে বর্তমানকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। বরং বর্তমানকে কাজে লাগানো উচিত সবচেয়ে বেশি। কারণ বর্তমানের কাজের মধ্যেই নিহিত মানুষের ভবিষ্যৎ সুখ ও সমৃদ্ধি।

১৯

জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদশালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান বর্ষার বারিপাতের মতো সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। দেশে সরল ও সহজ ভাষায় নানা প্রকারের পুস্তক প্রচার করলে এই কাজ সিদ্ধ হয়। শক্তিশালী দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদের লেখনীর প্রভাবে একটা জাতির মানসিক ও পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সংসাধিত হয়ে থাকে। দেশের প্রত্যেক মানুষ তার ভুল ও কুসংস্কার, অন্ধতা ও জড়তা, হীনতা ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে একটা বিনয়-মহিমোজ্জ্বল উচ্চজীবনের ধারণা করতে শেখে; মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম মনে করে; আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং গভীর দৃষ্টি লাভ করে। তারপর বিরাট জাতির বিরাট দেহে শক্তি জেগে ওঠে।

সারাংশ : জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপায় হল সবার মধ্যে শিক্ষার প্রসার। সহজ-সরল ভাষায় লেখা বই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সহায়ক। মহৎ লেখকরাই পারেন জাতিকে কুসংস্কারমুক্ত করে মহৎ জীবনে ব্রতী করতে। এভাবেই জাতি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে।

২০

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্রবলেই মানুষের জীবনে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই।
জগতে যে-সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরব মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক। এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও, তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর; তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়। চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ : চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মের ওপর নির্ভর করে মানুষের মর্যাদা। এসবের মধ্যে চরিত্রই মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। চরিত্রগুণেই মানুষ শ্রদ্ধা অর্জন করে। যিনি সত্যবাদী, বিনয়ী, জ্ঞানী, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীনতাপ্রিয় ও সজ্জন তিনিই চরিত্রবান।

২১

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস। একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন মিথ্যা বলবে না। ছ মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্যকথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দুদিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্যকথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা কোরো না তাহলে সব পড হবে।

সারাংশ : অভ্যাসের দাস না হয়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। এটাই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ। মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনের জন্য চাই সাধনা। সাধনার মাধ্যমেই মানুষ পাপ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হতে পারে।

২২

নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না, সেই ভালো কাজের দাম কী? একটা ভালো কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কী হইতে পারে? জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোনো মন্দ লোক তাহার মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা সে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল। মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে চায়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সংগতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্তকাজ।

সারাংশ : নিন্দার মাধ্যমেই ভালো কাজ পায় গৌরবজনক স্বীকৃতি। নিন্দুকের সমালোচনার মাধ্যমেই ভুল-ত্রুটি সংশোধিত হয়। তাই নিন্দার কাছে হার মানলে গৌরবের জয়মাল্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

২৩

ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হল জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে-মৌমাছি পর্যন্ত যখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য। ফকির-সন্ন্যাসী যে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আহার-নিদ্রা ভুলে পাহাড়-জঙ্গালে চোখ বুজে বসে থাকে, সেটা যদি নিতান্ত গঞ্জিকার কৃপায় না হয়, তবে বলতে হবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে। সমস্ত জীবজন্তুর দুটো চোখ সামনে

থাকবার মানে হল ভবিষ্যতের দিকে যেন নজর থাকে। অতীতের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। পণ্ডিতেরা তো বলে গেছেন, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। আর বর্তমান সে-তো নেই বললেই চলে। এই যেটা বর্তমান সেই এই কথা বলতে বলতে অতীত হয়ে গেল। কাজেই তরঙ্গ গোনা আর বর্তমানের চিন্তা করা, সমানই অনর্থক। ভবিষ্যৎটা হল আসল জিনিস। সেটা কখনও শেষ হয় না। তাই ভবিষ্যতের মানব কেমন হবে, সেটা একবার ভেবে দেখা উচিত।

সারাংশ : চিন্তাশীল মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবেই কাজ করেন। অতীত গত, আর বর্তমান নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তাই অতীতের জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই। ক্ষণস্থায়ী ভবিষ্যৎ ভেবে বর্তমান কাজের পরিকল্পনা করে অগ্রসর হওয়াই দূরদর্শিতার লক্ষণ।

২৪

বাল্যকাল হইতেই আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারাদি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া আবশ্যক। তেমনি একটি শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পারিবার শক্তি অলতিভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

সারাংশ : প্রচলিত শিক্ষার একটা বড় সীমাবন্ধতা হল মুখস্থবিদ্যা। এর সঙ্গো আনন্দের যোগ নেই। ফলে প্রকৃতপক্ষে পাঠ আয়ত্ত হয় না। প্রকৃত শিক্ষার জন্য পাঠ্যবই ছাড়াও চাই পাঠ-সহায়ক আনন্দকর শিক্ষা-উপকরণ। শিক্ষার সঙ্গো আনন্দের যোগে মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

২৫

কিসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়, গাড়ি-ঘোড়া, না ঠাকুর-দাদার কালের উপাধিতে? না, মর্যাদা এসব জিনিসে নেই। আমি দেখতে চাই তোমার ভিতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর। আমি জানতে চাই, তুমি চরিত্রবান কিনা, তুমি সত্যের উপাসক কিনা। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয়, তোমায় দেখলে দাস-দাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর। বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন, আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলব —যাও।

সারাংশ : অর্থ-বিত্ত, বংশগরিমা, প্রতাপ-প্রতিপত্তি মানুষকে করে তোলে দাম্ভিক ও অহংকারী। তাতে প্রকৃত মর্যাদা অর্জিত হয় না। চরিত্রবান, সত্যবাদী মানুষ ও জ্ঞানী-গুণীজনরাই মহৎ গুণাবলির শক্তিতে জীবনে প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী হন।

২৬

বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো—এ সেইরকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত; স্বভাবতই সেখানে আরাম, আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লিতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছায় তা যৎকিঞ্চিৎ।

সারাংশ : বর্তমান সভ্যতায় উৎপাদন ও পরিভোগে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। পল্লীর বিপুল জনগণ অন্ন উৎপাদন করেও দারিদ্র্যকবলিত। অথচ নগরের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীরা ভোগবিলাসিতায় আচ্ছন্ন। অর্থের কেন্দ্রীভবন নগরকে দিয়েছে নানা নাগরিক সুবিধা। পক্ষান্তরে, পল্লী সুবিধাবঞ্চিত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত।

সারাংশ : বর্তমান সভ্যতায় উৎপাদন ও পরিভোগে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। পল্লীর বিপুল জনগণ অন্ন উৎপাদন করেও দারিদ্র্যকবলিত। অথচ নগরের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীরা ভোগবিলাসিতায় আচ্ছন্ন। অর্থের কেন্দ্রীভবন নগরকে দিয়েছে নানা নাগরিক সুবিধা। পক্ষান্তরে, পল্লী সুবিধাবঞ্চিত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত।

২৭

শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালি-ধুলার মাঝে, রৌদ্র-বৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার দরকার নেই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভেতর কুবুদ্ধি কুমতলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্ফূর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করার কোনো প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিতসাধন হয় না। মানব সমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে।

সারাংশ : কর্মহীন জীবন মানুষকে নির্জীব ও হীনপ্রবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলে। বস্তুত, পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ পায় স্বাস্থ্যময় জীবন ও পরিচ্ছন্ন মন, হয়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কর্মসূত্রেই মানুষ সৌজন্য শেখে, লাভ করে কাজের ও অবকাশের আনন্দ, অবদান রাখে জগতের কল্যাণে।

২৮

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারাংশ : জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী বলে মানুষ সৃষ্টির সেরা প্রাণী। পাশব শক্তি ও বিত্তের দাপট মানুষের মহিমার পরিচায়ক নয়। বরং জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মানুষ হয়ে ওঠে যথার্থ মানুষ। এ ধরনের মানুষের অবদানেই অর্জিত হয় জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতি।

২৯

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার, দালানকোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায়, আর জীবন পণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দুর্মূল্য হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সবরকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা, তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।

সারাংশ : জাতির অগ্রগতির মাপকাঠি বাইরের আড়ম্বর নয়, অন্তরের ঐশ্বর্যে। মনের এই ঐশ্বর্যের অন্য নাম সামাজিক মূল্যবোধ। তার প্রকাশ ঘটে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীনতায় ও নৈতিক চেতনায়। জাতির ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হলে এই মূল্যবোধের প্রসার দরকার। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বত্র তা সঞ্চারিত করার দায়িত্ব লেখকদের।

৩০

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যেসব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মানুষ

বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখিল, কে প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা নূতন কোনো প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাতত মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুই দিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল দ্বীপ যেরূপ একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞান রাজ্যও সেইরূপ তিলতিল করিয়া বাড়িতেছে।

সারাংশ : নানা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির পেছনে রয়েছে অগণিত মানুষের ছোট ছোট কর্ম-প্রচেষ্টা। যুগ যুগ ধরে নাম না-জানা অজস্র মানুষের নিরন্তর পরিশ্রম ও আবিষ্কারে এবং বিজ্ঞান ও সভ্যতার অসামান্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছি আমরা। এমনি করে ছোট ছোট অনেক অবদানে ঘটছে জ্ঞান রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধি।

অনুশীলনী

সারমর্ম/ সারাংশ (অনুশীলনের জন্য রচনাংশ)

১

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্

২

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা একজন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

৩

যাক   বান ডেকে যাক   বাইরে এবং ঘরে;
আর   নাচুক আকাশ   শূন্য মাথার পরে,
আসুক জোরে হাওয়া,
এই   আকাশ মাটি   উঠুক কেঁপে কেঁপে,

শুধু ঝড় বয়ে যাক মরা জীবন ছেপে,
বিজলি দিয়ে ছাওয়া।
আয় ভাই-বোনেরা ভয়-ভাবনাহীন
সেই বিজলি দিয়ে গড়ি নতুন দিন।
আয় অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার খুলে
বুনো হাওয়ার মতো আয়রে দুলে দুলে
গেয়ে নূতন গান।
যত আবর্জনা উড়িয়ে দেরে দূরে,
আজ মরা গাঙের প্রান্তে নতুন সুরে
ছড়িয়ে দে রে প্রাণ

৪

এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচ সত্রাসে যাবে মিশে
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে ॥

৫

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি ॥

৬

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে এক হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

৭

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব যে অমর
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোনো জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
কোরো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
ব্রতী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

৮

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে, সেও অতি নির্বোধ অধম।
খেয়া তরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,
কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে?

৯

এ জগতে যিনি উঠেন, তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যে বাড়িয়া, সাধারণের ওপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান। তিনি অভ্যন্তরীণ মাল-মশলার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কৃশকায় লতা যেমন বৃষ্টির সাহায্যে মাচার ওপর ওঠে, তেমনি কোন কাপুরুষ, কোন অলস শ্রমকাতর মানুষ কেবল অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া-পড়িয়া, রহিয়া-সহিয়া, ভাঙিয়া-গড়িয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া মানুষ হইতে হয়। ইহা ছাড়া মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের অন্য পথ নাই।

১০

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও আমি বলতে চাই নে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে এটকুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটার দিকে একটু করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন। পরের দুঃখ ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

১১

নিষ্ঠুর ও কঠিন মুখ শয়তানের। কখনও নিষ্ঠুর বাক্যে প্রেম ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। কঠিন ব্যবহারে ও রূঢ়তায় মানবাত্মার অধঃপতন হয়। সাফল্য কিছু হইলেও যে আত্মা দরিদ্র হইতে থাকে, সুযোগ পাইলেই সে আপন পশু-স্বভাবের পরিচয় দেয়।

যে পরিবারের কর্তা ছোটদের সঙ্গে অতিশয় কদর্য ব্যবহার করে, সে পরিবারের প্রত্যেকের স্বভাব অতিশয় মন্দ হইতে থাকে। শিশুর প্রতি একটি নিষ্ঠুর কথা, এক-একটা মায়াহীন ব্যবহার, তাহার মনুষ্যত্ব অনেকখানি রক্তের মতো শুষিয়া

নেয়; পক্ষান্তরে স্নেহ-মমতা শিশুর মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করে। পরিবারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ইহাই পরিবারের প্রতি প্রেম।

১২

তুমি জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিতে চাও? কিন্তু সেজন্য তোমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। মহৎ কিছু লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনার দরকার। তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। এইসব তুচ্ছ করিয়া যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে পার তবে তোমার জীবন সুন্দর হইবে। আরও আছে, তোমার ভেতরে এক 'আমি' আছে। সে বড় দুরন্ত। তাহার স্বভাব পশুর মতো বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগ-বিলাস চায়, সে বড় লোভী। এই 'আমি'-কে জয় করিতে হইবে। তবেই তোমার জীবন সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

১৩

জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন তাহাই সাহিত্য। বাতাসের ওপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না, মানবজাতি তাই অর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোনো যুগে পাথরে, কোনো যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমানে কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সেই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি তেমনি অস্বীকার করিতে পার না উহাতে তোমার মৃত্যু, তোমার দুঃখ ও অসম্মান হয়।

১৪

যাহারা মুখ্যভাবে ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে যায় আমরা তাহাদিগকে শীঘ্রই চিনিয়া ফেলি এবং 'শঠ', 'তস্কর', 'অত্যাচারী' ইত্যাদি নিন্দিত বিশেষণের কলঙ্কে চিহ্নিত করিয়া জগৎকে সতর্ক করি। কিন্তু যাঁহারা গৌণভাবে ঠকাইয়া কার্যোদ্ধার করেন তাঁহাদের বাহ্য উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহাদিগকে 'উদ্যোগী', 'কৃতী', 'যশস্বী, ইত্যাদি প্রশংসিত আখ্যায় বিভূষিত করি। কেহ সোনা বলিয়া পিতল বিক্রয় করিলে আমরা তাহাকে শঠ বলি, কিন্তু যখন কেহ সোনাই উচিতমূল্য অপেক্ষা অধিক টাকায় বিক্রয় করিয়া বড়লোক হয়, আমরা তাহাকে কৃতী পুরুষ বলি।

১৫

বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের ওপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এই উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান স্রেফ জমিতে সার দিয়ে। তারা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয়, তাহলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে, সে হচ্ছে মানবজমিন; আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদ করা এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এই দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে।

৩. ভাব-সম্প্রসারণ

'ভাব-সম্প্রসারণ' কথাটির অর্থ কবিতা বা গদ্যের অন্তর্নির্মিত তৎপর্যকে ব্যাখ্যা করা, বিস্তারিত করে লেখা, বিশ্লেষণ করা। ঐশ্বর্যমণ্ডিত কোনো কবিতার চরণে কিংবা গদ্যাংশের সীমিত পরিসরে বীজধর্মী কোনো বক্তব্য ব্যাপক ভাবব্যঞ্জনা লাভ করে। সেই ভাববীজটিকে উন্মোচিত করার কাজটিকে বলা হয় **ভাব-সম্প্রসারণ**।

ভাববীজটি সাধারণত রূপকধর্মী, সংকেতময় বা তৎপর্যপূর্ণ শব্দগুচ্ছের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকে। নানা দিক থেকে সেই ভাবটির ওপর আলোকসম্পাত করে তার স্বরূপ তুলে ধরা হয় ভাব-সম্প্রসারণে। ভাববীজটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, এ ধরনের কবিতার চরণে বা গদ্যাংশে সাধারণত মানবজীবনের কোনো মহৎ আদর্শ, মানবচরিত্রের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য, নৈতিকতা, প্রণোদনমূলক কোনো শক্তি, কল্যাণকর কোনো উক্তির তাৎপর্যময় ব্যঞ্জনাকে ধারণ করে আছে। ভাব-সম্প্রসারণ করার সময় সেই গভীর ভাবটুকু উদ্ধার করে সংহত বক্তব্যটিকে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। সেই ভাব রূপক-প্রতীকের আড়ালে সংগুপ্ত থাকলে, প্রয়োজনে যুক্তি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হবে।

ভাব-সম্প্রসারণের কিছু নিয়ম

ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন :

ক. প্রদত্ত চরণ বা গদ্যাংশটি একাধিকবার অভিনিবেশসহকারে পড়তে হবে। লক্ষ্য হবে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত ভাবটি কী, তা সহজে অনুধাবন করা।

খ. অন্তর্নিহিত মূলভাবটি কোনো উপমা, রূপক-প্রতীকের আড়ালে সংগুপ্ত আছে কিনা, তা বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে। মূলভাবটি যদি রূপক-প্রতীকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে ভাব-সম্প্রসারণের সময় প্রয়োজনে অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ-যোগে ব্যাখ্যা করলে ভালো হয়।

গ. সহজ ভাষায়, সংক্ষেপে ভাবসত্যটি উপস্থাপন করা উচিত। প্রয়োজনে যুক্তি উপস্থাপন করে তাৎপর্যটি উদ্ধার করতে হবে।

ঘ. মূল ভাববীজকে বিশদ করার সময় সহায়ক দৃষ্টান্ত, প্রাসঙ্গিক তথ্য বা উদ্ধৃতি ব্যবহার করা চলে। এমনকি প্রয়োজনে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্যও উল্লেখ করা যায়। তবে ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, উদ্ধৃতি দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভালো।

ঙ. ভাব-সম্প্রসারণ করার সময় মনে রাখতে হবে যে, যেন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বারবার একই কথা লেখা ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দোষণীয়।

নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকটি ভাব-সম্প্রসারণের উদাহরণ দেওয়া হল :

১

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অপরের উপকার করেই মানবজীবন ধন্য ও সার্থক হয়। অন্যের উপকার সাধনই তাই সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। চারপাশের মানুষের কথাও ভাবতে হবে, ভাবা উচিত। সমাজে বাস করতে হলে একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে চলতে হবে। কারণ পারস্পরিক সহযোগিতাই মানবজীবনের উন্নতির মূল। এই সহযোগিতা ছাড়া সুস্থ, সুন্দররূপে বাঁচা সম্ভব নয়। অন্যকে বঞ্চিত রেখে কেউ কখনো বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। তাই সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করে বৃহত্তর মানুষের কথা ভাবতে হবে। সেখানেই রয়েছে মানবজীবনের সার্থকতা। অন্যের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এগিয়ে যাওয়াই প্রত্যেকের কর্তব্য। প্রয়োজনে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মহৎ মানসিকতাই দিতে পারে বৃহত্তর মুক্তি। পুষ্পের ন্যায় পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের সার্থকতা।

স্বার্থপর হয়ে কেউ পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না। তাই পরের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার মাধ্যমেই জীবনকে সার্থক ও ধন্য করা সম্ভব।

২

নানান দেশের নানান ভাষা

বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে তার মাতৃভাষা শ্রেষ্ঠ। অন্য ভাষা যতই সহজ হোক না কেন, মাতৃভাষা ছাড়া মনের ভাব উত্তমরূপে আর কোনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মাতৃভাষা যে-কোনো মানুষের অস্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশের অবিকল্প একটি বাহন। বিদেশি ভাষায় যতই দক্ষতা অর্জন করুক, মাতৃভাষার ন্যায় এমন সাবলীলভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা বিদেশি ভাষায় সম্ভব নয়। মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে মানুষ যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং আনন্দ পায়, অন্য ভাষায় তা অসম্ভব। কারণ মাতৃভাষার সঙ্গে রয়েছে তার আত্মিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তার আনন্দ-বেদনা, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মাতৃভাষা। মাতৃভাষা মানুষের অস্তিত্বের মহৎ অবলম্বন। তা দেশ ও জাতির সঙ্গে গড়ে তোলে অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক বন্ধন। মাতৃভাষায় কথা বলে যে আনন্দ, আত্মতৃপ্তি আর প্রশান্তি অনুভব করা যায়, বিদেশি ভাষায় কথা বলে হৃদয়ের সেই তৃষ্ণা কিছুতেই মেটে না।

মাতৃভাষাই মানুষের মত প্রকাশের সর্বোত্তম বাহন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিমূর্ত চেতনা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সঠিক প্রতিমূর্তি লাভ করে। বিদেশি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে মানুষ খ্যাতি অর্জন করতে পারে কিন্তু মাতৃভাষাই তার অস্তিত্বের আসল পরিচয়।

৩

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির

লিখে রেখ এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে, যারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। বরং তারা সামান্য উপকার করতে পারলেই, দম্ভভরে তা প্রচার করে বেড়ায়।

দিঘির বিশাল জলরাশির মধ্যে শৈবালের অবস্থান ও অস্তিত্ব। এই শৈবালের ওপর জমেছে ভোরের শিশির। শিশিরের ক্ষুদ্র ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে দিঘির অগাধ জলে। এই সামান্য শিশির-ফোঁটাকে শৈবাল দিঘির প্রতি তার মহৎ দান বলে গণ্য করছে। অথচ দিঘির বিশাল জলরাশির কাছে এক ফোঁটা শিশির অতি তুচ্ছ। দিঘির জলেই যার অস্তিত্ব, সেই দিঘির প্রতি শৈবালের এমন দম্ভোক্তি সত্যি হীনম্মন্যতার পরিচায়ক।

শৈবালের মতো মানবসমাজেও এমন অনেক অকৃতজ্ঞ লোক আছে, যারা পরের দয়া-দাক্ষিণ্য দু'হাতে গ্রহণ করে কিন্তু সামান্য উপকার করতে পারলেই মনে করে আমি মহৎ কিছু করে ফেলেছি। প্রকৃতপক্ষে যিনি মহৎ এবং যথার্থ পরোপকারী তিনি অপরের উপকার করে কখনো দম্ভ প্রকাশ করেন না। নিছক আত্মপ্রচারের জন্য নয়, বরং নিঃস্বার্থভাবেই তিনি পরের উপকার করেন।

প্রতিদানের প্রত্যাশা নয়, মানবকল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করাই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির কাজ।

৪

আলো বলে, 'অন্ধকার, তুই বড় কালো'

অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো।'

বৈপরীত্য আছে বলেই আমরা বস্তুর আসল স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। পৃথিবীতে মন্দ আছে বলেই ভালোর এত কদর।

আলো ও অন্ধকার—আপাতদৃষ্টিতে দু'টোকে বিপরীত মনে হলেও আলোর স্বরূপ বুঝতে হলে অন্ধকারের প্রয়োজন হয়। রাত্রি ও দিনের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য না থাকত, একটানা আলো বা একটানা অন্ধকার হলে আমরা রাত্রি ও দিনের কোনো তফাত বুঝতে পারতাম না। ভালো-মন্দ, সাদা-কালো, ইতর-ভদ্র, সুজন-কুজন, পাহাড়-সমতল, মরুভূমি-সমুদ্র এসব প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ জগৎ-সংসার। এই বৈপরীত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেই মানুষ বেছে নেয় সঠিক পথ ও পন্থা। তৈরি হয় বিবেচনাবোধ। তুলনার মধ্য দিয়ে কোনো বস্তুর স্বরূপ অনুধাবন করা যায় সহজ। আলো ও অন্ধকারের এ ঝগড়া অমূলক। আসলে ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার একে অপরের পরিপূরক।

অন্ধকার কালো বলে তাকে নিন্দা করার কিছু নেই। কারণ, অন্ধকার আছে বলেই আলোর এত কদর।

৫

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।

পৃথিবীতে কোনো বস্তুকেই তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়। অতি তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেও হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে বিশাল কোনো সম্ভাবনা।

বস্তুর প্রয়োজন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। কাজেই বস্তুর স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত গুণের কথা চিন্তা করে সব জিনিসকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। অতি ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কোনো বস্তুর মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে এমন কিছু শক্তি বা সম্ভাবনা, যা মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে উন্নতির চরম শিখরে।

মানুষ সাধারণত বড় বা মূল্যবান জিনিসের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে এবং ছোট ও নগণ্য জিনিসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অবহেলা করে। আসলে তা উচিত নয়, কারণ অনেক ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেও অনেক মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বর্ণকার যে ছাই ফেলে দেয়, তা ধুয়েও স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ছাই বলতে বোঝানো হয়েছে পৃথিবীর তাবৎ তুচ্ছ অথচ মূল্যবান বস্তুকে।

ক্ষুদ্র বলে কোনো বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়। প্রয়োজনে ক্ষুদ্র বস্তুকে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা উচিত।

৬

পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন
নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন।

অন্যের ক্ষতিসাধন করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। তাই জেনেশুনে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, সেখানে কল্যাণচিন্তাই প্রধান। যে মানুষ সর্বদা অন্যের উপকারের কথা ভাবে, সে সমাজে সম্মানিত হয়। অপরদিকে, যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের ক্ষতির চিন্তা করে, সে অবশ্যই হীনম্মন্য। অন্যের অনিষ্ট করার চিন্তা করতে করতে তার মন ছোট হয়ে যায়। মানুষ হিসেবে সে হয়ে পড়ে ক্ষুদ্র, নিকৃষ্ট। খারাপ চিন্তার কারণে তার চিত্তে শান্তি থাকে না, শুদ্ধি আসে না। ফলে সে কর্মক্ষেত্রেও উন্নতি করতে পারে না। পার্থিব কর্মের ফল মানুষ কোনো না কোনোভাবেই পৃথিবীতে পেয়ে যায়। তাই এ ধরনের ব্যক্তিকে নিজ জীবনেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

বিশ্বের মহৎ ব্যক্তিরা সবসময় অপরের কল্যাণ চিন্তা করেছেন। 'পরার্থে জীবন' এই মহান বাক্যে তারা সর্বদা ছিলেন নিবেদিত।

কথায় বলে- 'ফুল আপনার জন্য ফোটে না।' অন্যের জীবন সুন্দর এবং সুবাসিত করার জন্যই ফুল ফোটে। অপরের উপকার সাধন করার মধ্যেই রয়েছে জীবনের সার্থকতা। তাই অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা উচিত নয়। অপরের ক্ষতি করার চিন্তার মধ্যেই রয়েছে নিজের অপরিণামদর্শী ক্ষতির আশঙ্কা।

৭

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

মানুষের চাওয়া-পাওয়ার কোনো শেষ নেই। প্রাপ্তিতে তার কোনো তৃপ্তি হয় না। কাঙ্ক্ষিত বস্তু তার ভাগ্যে জোটে না, অথচ যা পায়, তা সে চায় না।

পৃথিবীতে চাওয়া-পাওয়া নিয়ে মানুষের রয়েছে নিরন্তর দ্বন্দ্ব। কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা একান্ত মনোবাঞ্ছা তার কোনোদিন পূরণ হয় না। কঠিন-কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যা সে পায়, তা হয়তো তার মোটেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। না পাওয়ার বেদনা তার আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে তোলে।

অর্থ-সম্পদ, বিলাসের মধ্যে কিছুদিন কাটাবার পর বৈরাগ্যের জন্য কারো মন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। আবার বৈরাগ্যের বিশুষ্ক জীবন কিছুদিন কাটানোর পর তার মন ছুটে যায় ভোগের আনন্দময় জীবনের দিকে। মানুষের মনের এ অস্থিরতা, এ চিত্তচাঞ্চল্য তাকে কখনো স্থির হতে দেয় না।

সে যে সত্যিকার অর্থে কী চায়, তা সে নিজেও জানে না। তাই মানুষ তার কাম্যবস্তু পেয়ে কখনো পরিতৃপ্তি অর্জন করে না। এটা মানবমনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। চাওয়া-পাওয়ার এ দ্বন্দ্ব তাকে সারাজীবন যন্ত্রণা দেয়, ব্যথিত করে, তাকে সুখ দেয় না।

মানব হৃদয়ে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সাধ এবং সাধ্য, চাওয়া এবং পাওয়ার যোগফল কখনো মেলে না। প্রাপ্তিতেও তার পরিতৃপ্তি নেই। ভুল চাওয়ার পেছনে সারাজীবন হেঁটে মনে হয়, যা পাওয়ার কথা ছিল তা সে পায়নি, যা পেয়েছে, তা সে চায়নি।

৮

গ্রন্থগত বিদ্যা পর হস্তে ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

বিদ্যা ও ধন, এ দুটো মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। এ দুটোকে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে অর্জন করতে হয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে এ দুটো কাজে না লাগলে বিদ্যা ও ধন দুটোই অর্থহীন বোঝার মতো মনে হয়।

বিদ্যা ও জ্ঞান মানুষ পরিশ্রম করে আত্মস্থ করে। বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে সেই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়। এটাই প্রত্যাশিত। অনুরূপভাবে ধনসম্পত্তি মানুষ কঠিন পরিশ্রম করে অর্জন করে এ জন্য যে, তা প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে, নিজেকে বিপদমুক্ত করতে পারবে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেই ধন যদি অন্যের হাতে থাকে, নিজের কাজে লাগাতে না পারে, তখন সেই ধনের কোনো মূল্য থাকে না। মুখস্থ বা গ্রন্থগত বিদ্যাও ঠিক সেরকম, বাস্তব জীবনে মুখস্থ বা গ্রন্থগত বিদ্যাও কোনো কাজে আসে না।

বিদ্যা ও ধনের সার্থকতা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে না লাগলে এ দুটোরই কোনো মূল্য নেই। তাই বিদ্যা ও ধনকে আয়ত্তাধীন রেখে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৯

স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন।

স্বদেশ ও স্বজাতির উপকার সাধন মানুষের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশের উপকার সাধনে দ্বিধাগ্রস্ত, স্বদেশ ও স্বজাতির বিপদে যার প্রাণ কাঁদে না, সে মানুষ হয়েও পশুর সমান।

দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের কল্যাণ ছাড়া যে অকল্যাণ চিন্তা করে, সে সত্যিকার মানুষ হতে পারে না। পশু আর তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ হয়েও কেউ যদি জন্মভূমির কল্যাণে কাজ না করে, উল্টো স্বদেশের ক্ষতি করে, মা-মাটির বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে স্বদেশও একসময় তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্যিকার দেশপ্রেমিক মানুষ দেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে সবসময় ভাবে এবং তাদের উপকার সাধনে সে দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু যারা আত্মকেন্দ্রিক,

কেবল নিজের স্বার্থচিন্তায় বিভোর থাকে, তারা মানুষ নামের কলঙ্ক। দেশপ্রেমহীন বিবেকবর্জিত এ মানুষগুলো পশুর তুল্য। পশুর যেমন থাকা-খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা থাকে না; উপলব্ধিহীন, বিবেকবর্জিত এ মানুষগুলোও তেমনি। দেশপ্রেমহীন মানুষ তাই পশুর নামান্তর।

সত্যিকারের মানুষ হতে হলে অবশ্যই দেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। দেশপ্রেমহীন মানুষ প্রকৃতপক্ষে পশুর সমান।

১০

কতবড় আমি, কহে নকল হীরাটি
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

মিথ্যা পরিচয় নিয়ে যারা বড়াই করে, তাদের গর্ব ঠুনকো। আর যারা প্রকৃত অর্থে বড়, তারা নিরহংকার ও বিনয়ী হয়।

মিথ্যা, ভিত্তিহীন পরিচয়ের অহংকার নিয়ে বেশিদিন চলা যায় না। একদিন না একদিন তার আসল পরিচয় ধরা পড়বেই। তখন তার অহংকার চূর্ণ হয়ে কচুপাতার পানির মতো গড়িয়ে পড়ে।

হীরা খুবই মূল্যবান জিনিস। কিন্তু নকল হীরার সেই মূল্য নেই। আসল বা খাঁটি হীরার মতো সে যদি নিজেকে মহামূল্যবান ভেবে অহংকার করে, তবে তার দর্প চূর্ণ হতে বাধ্য। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা সত্যিকার অর্থে খুবই তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, হীনচিত্ত; কিন্তু অহমিকায় অন্ধ হয়ে তারা বাইরে প্রচার করে যে তারা অনেক বড়। শুধু তাই নয়, অনেক সময় হীনচিত্তের এ মানুষগুলো নকল হীরের মতো আমাদের সমাজের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। একদিন তাদের সত্যিকার মুখোশ বেরিয়ে পড়ে। তখন তাদের মুখ লুকোবার জায়গা থাকে না।

যার গুণ আছে তার সুনাম এমনিতেই প্রকাশ পায়। তার পরিচয় জাহির করার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, মিথ্যা পরিচয়ে যে অহংকার করে, একদিন তার সত্য পরিচয় উন্মোচিত হলে সে লজ্জিত হয়।

১১

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

কোনোকিছু অর্জন করতে হলে নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার কোনো বিকল্প নেই। পরিশ্রম করেই বিরূপ ভাগ্যকে করায়ত্ত করতে হয়।

ভাগ্যে বিশ্বাসী লোক অলস এবং শ্রমবিমুখ হয়। 'ভাগ্যে থাকলে পাব'— এই আশায় কেউ বসে থাকলে জীবনে তার কোনো উন্নতি হবে না। আসলে সৌভাগ্য নিয়ে কেউ পৃথিবীতে আসে না। কঠিন, কঠোর পরিশ্রম করেই বিরূপ ভাগ্যকে জয় করতে হয়। লক্ষ্য স্থির করে, সঠিক পদ্ধতিতে পরিশ্রম করলে সৌভাগ্য আপনা-আপনি ধরা দেয়। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যারা সফল হয়েছেন, তাদের সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে পরিশ্রমের জাদু। কৃষক ভাগ্যের ওপর বসে থেকে ফসল ফলায় না, তাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপন্ন করতে হয়। তেমনি পরিশ্রম ছাড়া দুনিয়াতে ভালো কিছু অর্জিত হয় না।

আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে কিংবা তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা নিরলস পরিশ্রম করেই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। একমাত্র শ্রমশক্তিই তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমবিমুখ, অলস কত যুবক বেকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছে।

জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য। যে জাতি যত পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নত। তাই অযথা ভাগ্যের পেছনে না দৌড়ে, লক্ষ্য স্থির করে সঠিক পদ্ধতিতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা উচিত।

১২

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ

চরিত্রের গুণেই মানুষ মর্যাদাবান হয়ে ওঠে। চরিত্রহীন ব্যক্তিকে সবাই ঘৃণা করে। চরিত্র মানবজীবনের মুকুটস্বরূপ।

মানুষের সামগ্রিক আচরণের সমষ্টিই তার চরিত্র। একজন মানুষ কতটা ভালো বা কতটা মন্দ তা শনাক্ত করা হয় তার সামগ্রিক চরিত্র দিয়েই। স্বকীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে মানুষ মর্যাদা লাভ করে, সমাদৃত হয়। চরিত্র ব্যক্তির— অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। নারীদের ক্ষেত্রে অলংকার যেমন তার রূপের মাধুর্যকে বাড়িয়ে দেয়, তেমনি ব্যক্তির আচার-আচরণ, কথাবার্তা, রুচি, জ্ঞান ও বুদ্ধি, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি তার চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। সুন্দর ও শোভন চরিত্রের মানুষকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, মর্যাদা দেয়। অপরদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কেউ বিশ্বাস করে না, মর্যাদাও দেয় না। লক্ষ টাকার সম্পদ নষ্ট হলেও তা আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু চরিত্র একবার হারালে তা কোটি টাকার বিনিময়েও ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য চরিত্রকে অমূল্য সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

পার্থিব ধনসম্পদের চেয়ে চরিত্রের মূল্য অনেক বেশি। মানবজীবনে চরিত্রের মতো বড় অলংকার আর কিছু নেই। চরিত্রকে তাই মাথার মুকুটের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

১৩

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোনো প্রাণী উঠে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না।

শিক্ষা জাতির প্রধান চালিকাশক্তি। শিক্ষাহীন মানুষ পশুর সমান। নিরক্ষর মানুষ সমাজের জন্য শুধু বোঝা নয়, দেশের অগ্রগতির পথেও বাধাস্বরূপ। কারণ, শিক্ষা মানুষকে কর্মদক্ষ ও সচেতন নাগরিক হতে সাহায্য করে। দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য দরকার সচেতন ও কর্মদক্ষ মানুষ। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। এ জন্য শিক্ষাকে মেরুদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত।

শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান সোপান। আত্মশক্তি অর্জনের প্রধান উপায় শিক্ষা। তাই জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিক্ষাকে সহজলভ্য ও সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার।

১৪

নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে।

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রতিভাবান মানুষ সেই অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে হতে পারেন স্মরণীয়, বরণীয়। ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম স্বাক্ষরিত করতে পারেন স্বর্ণাক্ষরে।

সুন্দর নাম মানুষকে সুন্দর করে না, দেয় না কোনো খ্যাতি বা সুনাম। বরং সৎকর্মের জন্যই মানুষের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকে। কারণ, মানুষের চূড়ান্ত পরিচয় ও ভূমিকা মূল্যায়িত হয় তার কৃতকর্মের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই তিনি স্মরণীয় নন, পারিবারিক পরিচয় ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর অনন্য সাহিত্যকর্মের জন্যে। অনুরূপভাবে নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি সাধারণ দরিদ্র পরিবারে, কিন্তু অসামান্য অবদানের জন্য নজরুলের নাম আজ ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এ উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, মানুষই তার নামকে মহিমান্বিত করতে পারে মহৎ সাধনা কিংবা কীর্তিময় কাজের জন্য। একটা গানে আছে-

নামের বড়াই কোরো নাকো
নাম দিয়ে কী হয়
নামের মাঝে পাবে নাকো
সবার পরিচয়॥

অর্থাৎ কোনো কীর্তি না থাকলে কারো নাম মানুষ স্মরণ করে না।

ক্ষণস্থায়ী জীবনকে মানুষ মহিমান্বিত করতে পারে তার সৎকর্ম বা মহৎ অবদানের মধ্য দিয়ে। মহৎ কীর্তির বলেই মানুষের নাম দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

১৫

দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়।

নীতিহীনতাই দুর্নীতি। নীতিহীন ব্যক্তি স্বার্থ-অন্ধ। এ ধরনের ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। তারা দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নৈতিকভাবে উন্নত, সৎ, বিবেকবান মানুষ যে পদেই থাকুন না কেন, তিনি সমাজ ও দেশের বড় সম্পদ। তাঁকে দিয়ে উপকার না হলেও অন্তত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। অপরদিকে নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যক্তি যতই উচ্চ আসনে অবস্থান করুক না কেন, তিনি মোটেও শ্রদ্ধার পাত্র নন। পদ মর্যাদার কারণে তাকে হয়তো মানুষ সামনে কিছু বলে না কিন্তু পেছনে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। তার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কাও বেশি। কারণ, তিনি স্বার্থ-অন্ধ, বিবেকবর্জিত। তিনি সবসময় নিজের স্বার্থ সিদ্ধির মতলবে থাকেন। স্বার্থ-অন্ধ ব্যক্তি নিজের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার কাজেই ব্যস্ত থাকেন। সমাজের কল্যাণ, দেশের মঙ্গলের কথা তিনি ভাবেন না। জাতীয় জীবনের উন্নতি, সমৃদ্ধির কথা ভাবতে তার বিবেক সায় দেয় না। এজন্য বিবেকবর্জিত, দুর্নীতিগ্রস্ত লোক দেশের সকল উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ।

দুর্নীতি বাংলাদেশের প্রধান অভিশাপ। বেশ কয়েকবার বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ছিল লজ্জাজনক অবস্থান। আমাদেরকে এ কলঙ্কজনক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যে দেশের জনগণ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে পেরেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও তাদের বিজয়ী হতে হবে। তাহলেই দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হবে।

১৬

প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

যার বিবেক ও বুদ্ধি আছে সে-ই মানুষ, পশুদের তা নেই। মানুষ হতে হলে চাই প্রশস্ত মন। চাই মানবীয় গুণাবলির অধিকারী হওয়া।

মানুষ আর অন্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কেবল প্রাণের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকে। অন্য প্রাণীরা জন্মসূত্রেই প্রাণী কিন্তু মানুষ জন্মসূত্রে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। তাকে মানুষ হওয়ার জন্য, মানবীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতে হয়। যে মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করতে পারে এবং মহৎ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করে, সে যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে। মনের বিকাশের মাধ্যমে মানুষ মহৎ গুণাবলি অর্জন করতে পারে এবং যথার্থ মানুষের মর্যাদা পায়। তাই শুধু প্রাণ নয়, মনই মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিকশিত চৈতন্য আর মনের সৌন্দর্যস্পৃহাই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ ও আলাদা করেছে।

মানুষ এবং অন্য প্রাণীর মধ্যে তফাত হচ্ছে : মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায় বোধ, সুন্দর-অসুন্দর বোধ, মহানুভবতা, ভালোবাসার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলি রয়েছে, কিন্তু পশুদের তা নেই। মানবমনের এ শক্তিই তাকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে।

১৭

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

অথবা

মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নহে।

দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে অনেকে পৃথিবীতে স্মরণীয় হতে পারে না। বরং সংক্ষিপ্ত জীবন যাপন করেও অনেকে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন তাঁদের স্মরণীয় কীর্তির জন্যে।

এ নশ্বর পৃথিবীতে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। একদিন না একদিন তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। মৃত্যু অমোঘ জেনেও এ সংক্ষিপ্ত জীবনে কেউ কেউ মানবকল্যাণে এমন কিছু কীর্তি রেখে যান, মৃত্যুর পরও যাঁরা মানুষের হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলে পৃথিবীতে কেউ তাকে আর স্মরণ করে না। অথচ কীর্তিমানের মৃত্যু হলে তাঁর শরীরের অবসান হয় বটে কিন্তু তাঁর মহৎ কাজ, অম্লান কীর্তি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। কীর্তিমান মানুষের

মৃত্যুর শত শত বছর পরেও মানুষ তাঁকে স্মরণ করে। বায়ান্নর মহান ভাষা-আন্দোলনে শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, কিংবা মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাংলার মানুষের হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। তাঁদের অম্লান কীর্তি বাঙালি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু মহৎ কীর্তি অবিনশ্বর। মৃত্যুর শত শত বছর পরেও কীর্তিমান মানুষের অমর অবদানের কথা মানুষ স্মরণ করে। তাই বলা হয়, কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

১৮

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

পরাধীন জাতি বোঝে স্বাধীনতার মর্ম কী। রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করা হয়তো সহজ, কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চেয়ে বেশি দুরূহ।

পরাধীন হয়ে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে চায় না। তাই মানুষ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে। অনেক অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়ে এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে। স্বাধীনতা অর্জিত হলেই সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না। তখন বিজয়ী জাতির সামনে আসে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। সে সংগ্রাম আরো বেশি কঠিন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় শত্রু চিহ্নিত থাকে, তাই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও সহজ, কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রকৃত শত্রুদের চেনা যায় না। তাই তাদের দমন করা খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। স্বাধীন দেশের ভেতরের শত্রু আর বাইরের শত্রু একত্রিত হয়ে যে-কোনো সময় স্বাধীনতা নস্যাৎ করে দিতে পারে। সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল, মীর জাফরি চরিত্রের হিংসাত্মক তৎপরতা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয় সতর্ক নজরদারি।

পরাধীন জাতি অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার গৌরবময় সূর্যকে অর্জন করে। জাতির যে-কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যেন পরাজিত শত্রু স্বাধীনতার সেই সূর্যকে ছিনিয়ে নিতে না পারে, সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

১৯

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

দুর্জন মানে দুষ্ট-প্রকৃতির লোক। এ ধরনের মানুষ বিদ্বান হলেও অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দুষ্ট লোক দেশ ও সমাজের শত্রু। তারা বিদ্বান হলেও লোকে তাদের ঘৃণা করে।

বিদ্যা মানুষের অমূল্য সম্পদ। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র সম্মানিত। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি চরিত্রবান না হন, বরং দুষ্ট-প্রকৃতির হন, তবে তার কাছ থেকে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক। কারণ, শিক্ষিত অথচ দুশ্চরিত্র লোক সবচেয়ে ভয়াবহ। যে-কোনো মুহূর্তে এ ধরনের লোক নৃশংসতম কাজটি করতে পারে। বিদ্যা যার চরিত্রকে সংশোধন করতে পারেনি, তাকে দিয়ে মানুষের কোনো কল্যাণ হতে পারে না। দুর্জন ব্যক্তি সাপের সাথে তুলনীয় এবং তার অর্জিত বিদ্যা সাপের মাথার মণির সঙ্গে তুলনীয়। সাপকে মানুষ ভয় করে। কারণ যে-কোনো সময় সাপ তার ছোবল দিয়ে প্রাণনাশ করতে পারে। তেমনি বিদ্বান হয়েও যিনি দুর্জন, তার কাছ থেকে যে-কোনো সময় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের ব্যক্তির সান্নিধ্য কেউ কামনা করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে।

চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিদ্বান ব্যক্তি দুশ্চরিত্র হলে সে অমানুষে পরিণত হয়। তাই শিক্ষিত হলেও চরিত্রহীন দুর্জন ব্যক্তির সাহচর্য থেকে দূরে থাকা উচিত।

২০

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সৌন্দর্য মোটেই নিরপেক্ষ নয়। স্থান-কাল-পাত্রের ওপর সৌন্দর্যের পূর্ণতা নির্ভর করে।

যে জিনিস যে স্থানে থাকা উচিত, সেখানে থাকলে শুধু যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয় তা নয়, দেখতে সুন্দরও

লাগে। যথার্থ স্থানেই বস্তুর স্বাভাবিক বিকাশ হয়। অস্থানে, কৃত্রিমভাবে যতই তাকে পরিচর্যা করা হোক তার স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটবে না। পাখিকে যতই সোনার খাঁচায় রেখে বুলি শেখানো হোক, সেটা পাখির জন্য কারাগার, মানুষের জন্যও অসুন্দর। তেমনি, মায়ের কোলে একটি শিশু যেমন ফুলের মতো স্বাভাবিক, অন্যের কোলে তেমন নয়। ফুল যতক্ষণ গাছের ডালে প্রস্ফুটিত, ততক্ষণ তার মধ্যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য থাকে, কিন্তু বোঁটা থেকে ছিঁড়লে ফুলের সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য আর থাকে না। এ জন্য বলা হয়, যার যে স্থান, তাকে সে স্থানে থাকতে দাও। যার যে কাজ, তাকে সে কাজ করতে দাও। তাকে স্থানান্তর করলে সৌন্দর্যের অবলুপ্তি ঘটে।

স্বাভাবিক স্থানে বস্তুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। তাকে স্থানান্তর করলে পরিবেশের ভারসাম্য যেমন নষ্ট হয়, তেমনি সৌন্দর্যেরও হানি ঘটে।

২১

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

ভোগে নয়, ত্যাগেই মানুষের প্রকৃত সুখ ও মুক্তি। অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের সার্থকতা।

মানুষকে তার অর্জিত গুণাবলি আত্মস্বার্থে ব্যয় করলে চলে না, পরের জন্য ভাবতে হয়। ফুল যখন গাছের ডালে ফোটে, তখন তার সৌন্দর্য রূপপিয়াসী মানুষকে মুগ্ধ করে, মধুলোভী মৌমাছিকে করে আকর্ষণ। মানুষ প্রশংসা করে তার সৌন্দর্যের, ঘ্রাণ নিয়ে মুগ্ধ হয়। মেয়েরা খোঁপায় গোঁজে, সাজায় ফুলদানিতে। মধুকর পান করে ফুলের মধু, গড়ে তোলে মৌচাক। এভাবে একসময় ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে। অপরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে ফুল তার জীবন সার্থক করে তোলে।

পৃথিবীর বুকে এমন অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা ফুলের মতোই অন্যের কল্যাণে নিজের মেধা, জ্ঞান, শ্রম, এমনকি মূল্যবান জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁরাই স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। বস্তুত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা মানুষের গুণ নয়, স্বার্থসর্বস্ব পশুর বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীতে এসেছি একে অপরের জন্য জীবনধারণ করে সার্থক হতে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে।

ফুলের জীবনের কাছে মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে। ফুল অন্যের জীবন সাজাতে, সুন্দর করতে, সৌরভময় করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে পারলে, মানুষের জীবনও ফুলের মতো সুন্দর ও সৌরভময় হয়ে উঠতে পারে।

২২

আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের কর্মশক্তি অর্জন ও মনষ্যত্বের বিকাশ। মানুষের মনোদৈহিক ক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করা।

অর্থ উপার্জনই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যদিও বর্তমান যুগে ভালো ফলাফল করার উদ্দেশ্য হল ভালো একটি চাকরি পাওয়া এবং অধিক অর্থ উপার্জন করা, কিন্তু এতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে যায়।

মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষের বোধবুদ্ধি, বিবেক জাগ্রত করা, ভেতরের শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ এবং সভ্যতার বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা। কেননা, মানুষ জন্মসূত্রে মানুষ নয়, তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন বা মানুষ হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয়। শিক্ষার মাধ্যমই কেবল মানুষ্যত্ব অর্জন করা সম্ভব। এ জন্য বলা হয়ে থাকে, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত। একজন শিক্ষিত মানুষ অন্যের থেকে আলাদা হয়ে ওঠে তাঁর মার্জিত আচরণ, উন্নত চিন্তা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলির কারণে। এ গুলো মানুষের মানবিক গুণ, আত্মগত শক্তি। শিক্ষা মানুষকে এ সমস্ত সামর্থ্যের অধিকারী করে তোলে।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের ভেতরের সমতাগুলো সক্রিয় করা। সুপ্ত মনোদৈহিক শক্তিগুলোকে জাগ্রত করা। অপ্রকাশিত মানবিক গুণগুলোকে বিকশিত করা। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

২৩

ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

বাস্তব জীবনে মানুষ ভোগকে অধিক গুরুত্ব দেয়। মনে করে ভোগের মধ্যেই জীবনের সর্বসুখ। কিন্তু ত্যাগই প্রকৃত সুখের আকর।

মানুষ লোভের কাছে পরাজিত। কামনায় পরাভূত। প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবনের সার্থকতা খোঁজে মানুষ। ভোগের আসক্তিতে নিমজ্জিত মানুষের মধ্যে কেবল ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। অধিক ভোগ করেও তার তৃপ্তি মেটে না। আত্মমুক্তি ঘটে না হৃদয়ের। এভাবে ভোগের শৃঙ্খলে বন্দি মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। ভোগের বশবর্তী মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে না। অন্যদিকে ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ খুব সহজেই স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ত্যাগের বিনিময়ে মানুষ পায় শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান। স্বার্থত্যাগকারী মানুষের কাছে উপকৃত মানুষের কৃতজ্ঞতার থাকে না। তাই ত্যাগই মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ অন্তরে যে প্রশান্তি আর সুখ অনুভব করতে পারে, জগতে কোটি টাকার বিনিময়েও সেই সুখ কেনা সম্ভব নয়।

মানুষ যদি অপরের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে পারে, তবে মরেও অমর হয়। ভাষা-আন্দোলনে শহীদ রফিক, সালাম, বরকত জাতির কল্যাণে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন বলেই আজ তারা জাতীয় বীর। বাঙালি হৃদয়ে চিরকাল তারা অমর হয়ে থাকবে। তাই বলা যায়, ভোগে নয়, ত্যাগেই জীবনের গৌরব। অর্থাৎ প্রকৃত সুখ ত্যাগেই নিহিত।

২৪

দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নেই।

পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়। তেমনি মানবজীবনে কোনো কোনো দুঃখময় ঘটনা ক্ষুদ্র মানুষকে মহৎ মানুষে রূপান্তরিত করে।

আগুনে পোড়ালে যেমন খাঁটি সোনার পরিচয় স্পষ্ট হয়, তেমনি দুঃখের দহন মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করে । আঘাতে আঘাতে, বেদনায় বেদনায় মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, সত্যনিষ্ঠা ও বিবেকবোধ জাগ্রত হয়। দুঃখে না পড়লে কোনো মানুষই জীবনের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। মনীষীগণ তাই দুঃখকে পরশপাথরের সাথে তুলনা করেছেন। পরশপাথরের ছোঁয়ায় যেমন লোহা সোনায় পরিণত হয়, তেমনি দুঃখের আঘাত অমানুষকে মহৎ মানুষে পরিণত করতে পারে। বেদনার অশ্রুতে যখন ভেসে যায় সমস্ত গ্লানি, তখন অপার্থিব এক পবিত্রবোধ জন্ম নেয় হৃদয়ে। সেই পবিত্রবোধই তাকে সুন্দর করে, নতুন এক মানুষে পরিণত করে।

সুখ-দুঃখ মানবজীবনের এক অনিবার্য ফসল। তবে বাস্তব জীবনে এমন অনেক বিষাদময় ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যা সাধারণ মানুষকে মহৎ হৃদয়ের মানুষে পরিণত করে। স্রষ্টার পক্ষ থেকে দুঃখ একধরনের পরীক্ষা। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে সাধারণ মানুষ উত্তম মানুষে পরিণত হয়।

২৫

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

সাধনা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। পরিশ্রম ছাড়া জগতে ভালো কিছু অর্জন করা যায় না।

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। পরিশ্রম ছাড়া ভাগ্যের দুয়ার কখনো খোলে না। যথার্থ পরিশ্রমই ভাগ্যের লক্ষ্মীকে ডেকে আনে। পরিশ্রমবিমুখ, অলস ব্যক্তির কাছে সবকিছুই নাগালের বাইরে থাকে। পক্ষান্তরে কষ্ট করলেই কেষ্ট মিলে। দুনিয়াতে যাঁরা খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সুনাম, সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁদের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,

তাঁরা বিনা আয়াসে এসব অর্জন করেননি। বরং তাদের সৎ সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম, কঠিন সাধনা। একজন কৃষক যেমন মন্ত্র পড়ে ফসল ফলান না; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলান, তেমনি অলৌকিক কোনো জাদুমন্ত্রের বলে নয়, সনিষ্ঠ শ্রমের মাধ্যমে বিমুখ ভাগ্যকে জয় করতে হয়।

মন্ত্রবলে নয়, শ্রমের মাধ্যমেই আসে কাজের সাফল্য। বিনা আয়াসে কোনোকিছু লাভ করা যায় না। বরার্ট ব্রুস বারবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও হতাশ হননি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তিনি অবশেষে জয়লাভে সমর্থ হন। তাই 'একবার না পারিলে দেখ শত বার' —এ উক্তিই যথার্থ।

অনুশীলনী

ভাব-সম্প্রসারণ কর :

১. আলো বলে, 'অন্ধকার, তুই বড় কালো।'
অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো।'

২. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

৩. যে জাতি জীবনহারা অচল অসার,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

৪. দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে বুখি
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।

৫. নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।

৬. দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

৭. সংসার সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা।

৮. বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসঙ্গে বাঁধা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

৯. পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ।

১০. বেঁচেও মরে যদি মানুষ দোষে
মরেও বাঁচে যদি মানুষ ঘোষে।

১১. শুধাল ফটিক, 'সাগর হতে কী অধিক ধনবান?'
জ্ঞানী বলেন, 'বাছা, তুষ্ট হৃদয় তারো চেয়ে গরীয়ান।'

১২. চাঁদ কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।

১৩. প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক।

১৪. অতি দীন ও অশক্ত লোকেরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে।

১৫. পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

১৬. এ পৃথিবী অলস ভীরু কাপুরুষের জন্য নয়।

১৭. বিত্ত হতে চিত্ত বড়।

১৮. অভাব অল্প হলে দুঃখও অল্প হয়ে থাকে।

১৯. বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং
জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

২০. কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই।

২১. পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা কর।

২২. স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা ভালো।

৪. পত্রলিখন

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে চিঠিপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানা প্রয়োজনে আমাদেরকে চিঠি লিখতে হয়। আত্মীয়, বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে চিঠির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অফিস-আদালত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজ অনেকাংশে চিঠিপত্রের ওপরই নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিগত চিঠি লেখার গুরুত্ব কিছুটা কমেছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য চিঠি লেখার প্রয়োজন এতটুকুও কমেনি। চিঠি লেখার রীতি আমাদের সংস্কৃতির এক অনুষঙ্গী উপাদান। যোগাযোগ এবং ভাব-বিনিময়ের এক অনুপম মাধ্যম হিসেবে চিঠি লেখার এ রীতি অব্যাহত থাকবে। কাগজ আবিষ্কারের আগে মানুষ গাছের পাতায়, গাছের ছালে, চামড়ায়, ধাতব পাতে লিখত। পাতায় লিখত বলেই এর নাম হয় 'পত্র'। সুন্দর, শুদ্ধ চিঠির মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। সুলিখিত চিঠি অনেক সময় উন্নত সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র'।

চিঠির প্রকারভেদ

বিষয়বস্তু, প্রসঙ্গ ও কাঠামো অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পত্রকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

ক. ব্যক্তিগত চিঠি
খ. আবেদনপত্র বা দরখাস্ত
গ. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি
ঘ. মানপত্র ও স্মারকলিপি
ঙ. বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িকপত্র
চ. আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণপত্র

চিঠি লেখায় অনুসরণীয় পন্থা

চিঠি যে ধরনেরই হোক না কেন, তা লেখার সময় কয়েকটি দিক বিবেচনায় রাখা দরকার :

১. বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের ওপর চিঠির কাঠামো নির্ভর করে। ব্যক্তিগত চিঠি আর ব্যবসায়িকপত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই এক-একরকম পত্রের জন্য এক-একরকম পদ্ধতি, ভাষাভঙ্গি অনুসরণ করতে হয়।
২. চিঠির মাধ্যমে মানুষের রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। তাই অস্পষ্ট এবং কাটাকাটি যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
৩. ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নির্ভুল বানান, যথাযথ শব্দ এবং বাগাড়ম্বরহীন বাক্য ব্যবহারের ওপর চিঠির মান নির্ভর করে। ভুল বানান, এলোমেলো বাক্য অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি করে। তা পত্রলেখক সম্পর্কে বিরূপ ধারণার জন্ম দিতে পারে।
৪. চিঠি নিজের হওয়া চাই। অর্থাৎ নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, অভিরুচি, ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ থাকতে হবে। পাঠ্যবইতে নমুনাচিঠি ধারণা তৈরি করার জন্য দেওয়া হয়। তা হুবহু মুখস্থ না করে, পাঠ্য বইয়ের নমুনা অনুসরণ করে চিঠিতে নিজস্বতা আনা উচিত।

চিঠির বিভিন্ন অংশ

একটি চিঠি মূলত দুটি অংশে বিভক্ত :

ক. শিরোনাম
খ. পত্রগর্ভ

শিরোনাম অংশে চিঠির খামের ওপর বামদিকে প্রেরকের ঠিকানা ও ডানদিকে প্রাপকের ঠিকানা লিখতে হয়। বর্তমানে সরকারি পোস্ট অফিসে প্রাপ্ত খামের সামনের অংশে প্রাপকের ঠিকানা লেখার নির্দিষ্ট ছক এবং পেছনের অংশে

প্রেরকের ঠিকানা লেখার আলাদা ছাপানো ছক রয়েছে। **পত্রগর্ভ** হচ্ছে চিঠির ভেতরের অংশ।

ব্যক্তিগত চিঠি : ব্যক্তিগত চিঠির কাঠামোতে ছয়টি অংশ থাকে। নিচে প্রদর্শিত ছকের মাধ্যমে এ ছয়টি অংশ তুলে ধরা হয়েছে -

চিঠির ছক

[১. মঙ্গলসূচক শব্দ]

২. স্থান ও তারিখ

৩. সম্বোধন

৪. মূল বক্তব্য

৫. পত্র-লেখকের স্বাক্ষর

৬. শিরোনাম

	ডাক টিকিট
প্রেরক– নাম : ---------------------------- ঠিকানা : ----------------------------	প্রাপক– নাম : ---------------------------- ঠিকানা : ----------------------------

১. **মঙ্গলসূচক শব্দ** : এককালে ব্যক্তিগত চিঠির প্রথমে কাগজের পৃষ্ঠার মাঝামাঝি জায়গায় পত্রলেখক নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মঙ্গলসূচক শব্দ লিখতেন। মুসলমানরা লিখতেন : এলাহী ভরসা, আল্লাহ্ সহায়, হাবিব ভরসা, খোদা ভরসা, বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম ইত্যাদি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা লিখতেন : ওঁ, ওঁমা, শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়, শ্রীহরি ইত্যাদি। এটা লেখা না-লেখা ব্যক্তিগত অভিরুচির ওপর নির্ভরশীল। আজকাল ব্যক্তিগত চিঠিতে এগুলো আর লেখা হয় না।

২. **স্থান ও তারিখ** : চিঠির ডানদিকে তারিখ এবং যে স্থানে বসে পত্র লেখা হচ্ছে তার নাম লিখতে হয়।

৩. **সম্বোধন** : পত্র লেখার শুরুতে পত্রের বামদিকে প্রাপকের সঙ্গে সম্পর্ক অনুযায়ী সম্বোধন বা সম্ভাষণ লিখতে হয়। পত্রদাতার সঙ্গে প্রাপকের সম্পর্ক অনুসারে এবং পত্র-প্রাপকের মান, মর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী সম্বোধনসূচক শব্দ নির্বাচন করতে হয়। ধর্ম-সম্প্রদায় অনুসারে এই সম্বোধন বা সম্ভাষণসূচক শব্দের পার্থক্য হতে পারে। যেমন :

ব্যক্তিগত পত্রের সম্ভাষণ রীতি

শ্রদ্ধাভাজন (পুরুষ) : শ্রদ্ধাস্পদেষু, পরম শ্রদ্ধাভাজন, মাননীয়, মান্যবরেষু, মান্যবর,

		শ্রদ্ধাভাজনেষু ইত্যাদি।
শ্রদ্ধাভাজন (মহিলা)	:	মাননীয়া, মাননীয়াসু, শ্রদ্ধেয়া, শ্রদ্ধাস্পদাসু ইত্যাদি।
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি	:	সুধী, মান্যবর, সৌম্য ইত্যাদি।
সমবয়স্ক প্রিয়জন/বন্ধু (পুরুষ)	:	বন্ধুবরেষু, অভিন্নহৃদয়েষু, প্রিয়বরেষু, প্রিয়, প্রিয়বর, বন্ধুবর, প্রিয়বন্ধু, সুপ্রিয়, সুহৃদবরেষু, প্রীতিভাজনেষু ইত্যাদি।
সমবয়স্ক প্রিয়জন/বন্ধু (মহিলা)	:	সুচরিতাসু, প্রীতিভাজনীয়াসু, প্রীতিনিলয়াসু, সুহৃদয়াসু ইত্যাদি।
বয়ঃকনিষ্ঠ (ছেলে)	:	কল্যাণীয়, কল্যাণীয়েষু, স্নেহাস্পদেষু, স্নেহভাজনেষু, স্নেহের, প্রিয়, প্রীতিভাজনেষু, প্রীতিনিলয়েষু ইত্যাদি।
বয়ঃকনিষ্ঠ (মেয়ে)	:	কল্যাণীয়া, কল্যাণীয়াসু, স্নেহের, স্নেহভাজনীয়া, স্নেহভাজনীয়াসু ইত্যাদি।

৪. মূল পত্রাংশ (মূল বক্তব্য)

এই অংশে পত্রলেখকের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি, ঔৎসুক্য ইত্যাদি লিখতে হয়। সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী করে লেখার ওপরই চিঠির সার্থকতা নির্ভর করে। রচনার গুণেই চিঠি উৎকৃষ্ট ও শিল্পনিপুণ হয়ে ওঠে। চিঠির পূর্বাপর বক্তব্যের সামঞ্জস্য, সংগতি ও ধারাবাহিকতা যেন রক্ষা হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এ জন্য বক্তব্যকে প্রয়োজন মতো অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে লিখলে ভালো হয়। যেমন : প্রথম অনুচ্ছেদে সালাম বা শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লেখার কারণ বা পটভূমি তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মূল বক্তব্যকে যথাসম্ভব স্পষ্ট বাক্যে লেখা উচিত। তৃতীয় অনুচ্ছেদে ইচ্ছা বা অভিপ্রায় প্রকাশ এবং প্রয়োজনে বক্তব্যকে আরো বিস্তার ঘটিয়ে সমাপ্তি টানা যেতে পারে। ব্যক্তিগত চিঠি আন্তরিকতাপূর্ণ এবং হৃদয়স্পর্শী হতে হয়। পত্রের শেষের দিকে পত্র-সমাপ্তিসূচক বিদায় সম্ভাষণ জানানোর রীতি সৌজন্যের পরিচায়ক। পত্র-সমাপ্তিসূচক শব্দ হিসেবে সাধারণত ইতি, নিবেদন-ইতি ইত্যাদি লেখাই দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। তবে এখন ইতি না লিখে শুভেচ্ছান্তে, ধন্যবাদান্তে, ধন্যবাদসহ, সালামান্তে, প্রণামান্তে, নিবেদনান্তে ইত্যাদি প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুযায়ী ব্যবহৃত হচ্ছে।

পত্র-সমাপ্তিসূচক অভিব্যক্তির পর বিদায় সম্ভাষণ হিসেবে পত্র-প্রাপকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক অনুযায়ী বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে পত্র-প্রাপকের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে বিশেষণ ব্যবহারের পার্থক্য দেখা যায়।

প্রাপক শ্রদ্ধাভাজন (পুরুষ)	:	স্নেহধন্য, স্নেহাকাঙ্ক্ষী, প্রীত্যর্থী, গুণমুগ্ধ, প্রণত, বিনীত, প্রীতিধন্য, প্রীতিস্নিগ্ধ ইত্যাদি।
প্রাপক শ্রদ্ধাভাজন	:	(পত্রলেখক মহিলা) স্নেহধন্যা, প্রণতা, বিনীতা, গুণমুগ্ধা, প্রীতিধন্যা, প্রীতিস্নিগ্ধা ইত্যাদি।
প্রাপক অনাত্মীয় সম্মানীয় লোক	:	(পত্রলেখক পুরুষ) নিবেদক, ভবদীয়, বিনীত, বিনয়াবনত ইত্যাদি।
	:	(পত্রলেখক মহিলা) নিবেদিকা, বিনীতা, বিনয়াবনতা, ইত্যাদি।
প্রাপক বন্ধুস্থানীয় বা প্রিয়ভাজন	:	(পত্রলেখক পুরুষ) প্রীতিধন্য, প্রীতিমুগ্ধ, অভিন্নহৃদয়, আপনারই, তোমারই ইত্যাদি।
	:	(পত্রলেখক মহিলা) প্রীতিধন্যা, প্রীতিমুগ্ধা, অভিন্নহৃদয়া ইত্যাদি।
প্রাপক বয়সে ছোট হলে	:	আশীর্বাদক, আশীর্বাদিকা, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী ইত্যাদি।

বিদায় সম্ভাষণ সাধারণত পত্রের ডানদিকে লিখতে হয়।

৫. নাম-স্বাক্ষর (পত্রলেখকের স্বাক্ষর)

নাম-স্বাক্ষর চিঠির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই চিঠির শেষে অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হয়। মা-বাবা, নিকট আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে পুরো নাম না লিখে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর বা ডাক নাম ব্যবহার করাই সংগত। নাম স্বাক্ষরের

আগে কেউ কেউ 'তোমার পুত্র', 'তোমার প্রিয় মুখ', 'তোর বন্ধু' ইত্যাদি পরিচিতি লিখে তারপর নাম-স্বাক্ষর করে।

৬। শিরোনাম

শিরোনাম পত্র পাঠাবার খামের উপর লিখতে হয়। খামের উপর বাম দিকে পত্রলেখকের (প্রেরক) ঠিকানা এবং ডান দিকে পত্র প্রাপকের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখতে হয়। খামের উপরে ডান কোণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মূল্যের ডাক টিকিট লাগাতে হয়। আজকাল বড় বড় পোস্ট অফিসে ডাক টিকিটের পরিবর্তে মেশিনের সাহায্যে খামের উপর ছাপ মারার ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

ক. ব্যক্তিগত চিঠি

১. বাবার কাছে মেয়ের চিঠি।

০২/১০/২০০৮
সদর রোড, বরিশাল

শ্রদ্ধেয় বাবা,

আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম নেবেন। মাকেও আমার সালাম জানাবেন। ফারজানা ও ছোট্টভাই রিয়াদের প্রতি রইল অশেষ স্নেহ।

সেদিন বাস স্টপে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ভালোভাবেই বরিশাল এসে পৌঁছেছি। যদিও সারা পথ বাড়ির কথা ভেবে কী-যে মন খারাপ লেগেছে। প্রতিবারই বাড়ি থেকে আসার সময় আমার এরকম হয়। এখানে আসার পর হোস্টেলের বান্ধবীদের পেয়ে ভালো লাগছে। আগামী ১০ই নভেম্বর থেকে আমাদের প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা। তাই পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বাবা, আপনার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার কথা আমার মনে আছে। আপনি শুধু আমার জন্য দোয়া করবেন, যেন আমি ভালো ফল করে আপনার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি। মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। খোদার অশেষ কৃপায় আমি ভালো আছি। আপনি আমার জন্য কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। চিঠিতে আপনাদের খবর বিস্তারিত জানাবেন।

ইতি
আপনার স্নেহধন্যা
শিমু

প্রেরক	ডাক টিকিট
শামীমা আক্তার শিমু সদর রোড , বরিশাল	প্রাপক নাম : অধ্যাপক জাকির হোসেন গ্রাম : হোসনাবাদ পোস্ট : হোসনাবাদ গৌরনদী , বরিশাল।

২. মায়ের কাছে ছেলের চিঠি।

২০-১১-২০০৮
মিরপুর, ঢাকা।

প্রিয় মা,

সালাম নিও। আমি কলেজের ছাত্রাবাসে নিরাপদে পৌঁছেছি।

এসেই দেখলাম আমাদের টেস্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় বেশ অবহেলা করা হয়েছে। অনেক পড়া বাকি। আমি আর দেরি করছি না। বেশি পরিশ্রম করে লেখাপড়ার সাময়িক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে। আমার জন্য দোয়া কোরো। আমি যেন তোমাদের আশা পূরণ করতে পারি। আসার সময় মিনুকে কিছুটা অসুস্থ দেখে এসেছি। এখন ও কেমন আছে জানিও। বিদেশ থেকে বাবার কোনো চিঠি এসেছে কি? আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না। আমি এখানে ভালো আছি।

ইতি
তোমার স্নেহের
রাশেদ

	ডাক টিকিট
প্রেরক রাশেদ আহমদ মিরপুর, ঢাকা।	প্রাপক বেগম শামসুন নাহার প্রযত্নে : জনাব এম. রেজাউল হক গ্রাম : দক্ষিণ আলীপুর ডাক : চৌধুরী হাট জেলা : বগুড়া।

৩. সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বন্ধুকে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি।

২/১১/২০০৮
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

প্রিয় রাজন,

সড়ক দুর্ঘটনায় তুমি আহত হয়েছ শুনে ভীষণ চিন্তিত আছি। আজ সকালে তুহিন ফোন করে জানাল যে, তুমি রিক্শা উল্টে পড়ে গেছ। ডান হাত আর ডান পায়ে মারাত্মক জখম হয়েছে। শুনে খুব কষ্ট পেলাম। আশা করি, জখমগুলো শরীরের স্থায়ী ক্ষতি করবে না।

পা এক্স-রে করেছ কি? ডাক্তার কী বলেছেন? ওখানে যদি ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা না হয়, তবে দ্রুত চট্টগ্রাম চলে এসো। আমার মামা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বোন্-স্পেশালিস্ট। মামাকে আমি তোমার কথা বলে রাখব, কোনো সমস্যা হবে না। সরাসরি আমাদের বাসায় এসে উঠবে। কোনো দ্বিধা করবে না। আমার মনে হয়, ভয়ের কিছু নেই। এখন চিকিৎসা-ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। দরকার শুধু সময়মতো ডাক্তারের কাছে যাওয়া। আশা করি, পরম করুণাময়ের কৃপায় দ্রুত তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। আমাদের ফোন নম্বর তো তোমার জানা। প্রয়োজনে ফোন কোরো। তুমি দ্রুত ভালো হয়ে ওঠো এটাই কামনা করি।

ইতি-
তোমার বন্ধু
মুনতাসির

	ডাক টিকিট
প্রেরক মুনতাসির জিলানি বাড়ি নং- ৫, লেন নং- ৩, বক- এ হালিশহর আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম।	প্রাপক রাজন বড়ুয়া প্রযত্নে : সবুজ স্টোর পি.সি রোড কুটাখালি, কক্সবাজার।

৪. বন্ধুর বাবার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি।

৩-৬-২০০৮
ঢাকা।

প্রিয় বন্ধু মাসুদ,

তোমাকে কী বলে যে সান্ত্বনা দেব জানি না। শোকাহতকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা আমার জানা নেই। তবু একান্তভাবে চাইছি, জীবনের এই বুকভাঙা শোক যেন তুমি কাটিয়ে উঠতে পার। এ কঠিন শোক সহ্য করার শক্তি যেন আল্লাহ তোমাকে দেন।

আজ স্কুলে জাভেদের কাছে শুনলাম, হার্ট অ্যাটাকে তোমার বাবা মারা গেছেন। খবরটা শুনে আমি খুবই মর্মাহত। সাথে সাথে চাচার চেহারাটা মনের পর্দায় ভেসে উঠল। যখনই তোমাদের বাড়ি গেছি, দেখেছি তাঁর হাসি-হাসি মুখ। আহ্, আমাকে কী আদরটাই না করতেন! খুব ভালোমানুষ ছিলেন তিনি। আমার চোখের জল যেন বাধা মানছে না। মৃত্যুর ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। চিরদিন কারো বাবা বেঁচে থাকে না। এই বাস্তবতা আজ তোমাকে মেনে নিতে হবে।

মাসুদ, তুমি বাবার বড় ছেলে। তোমার মা এবং ছোটবোন তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। তাদের দিকে চেয়ে মনকে শক্ত কর। আর দোয়া করি, তোমার বাবার বিদেহী আত্মা যেন শান্তি পায়।

ইতি-
তোমারই
রুবেল

ডাক টিকিট

প্রেরক	প্রাপক
কাজী জিয়াউদ্দিন রুবেল	ইমদাদ হোসেন মাসুদ
৫১ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা।	আমজাদ সর্দারের বাড়ি
	রৌমারি
	রংপুর।

৫. ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি।

৬-১১-২০০৮
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রিয় নরেশ,

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিস। অনেকদিন তোর কোনো চিঠিপত্র পাচ্ছি না। আমার কথা কি ভুলে গেছিস? কোন অভিমানে তুই চিঠি লেখা বন্ধ করেছিস জানি না। আশা করি, আমার এ চিঠি পাওয়ার পর তোর অভিমানের বরফ গলবে।

আজ তোকে লিখতে বসেছি এক ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জানাতে। গত 'মাঘী পূর্ণিমার' ছুটিতে আমি আর রতন গিয়েছিলাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোনারগাঁ দেখতে। ইতিহাস বইতে বাংলার বারোভূঁইয়াদের কাহিনী পড়েছি। সেই বারোভূঁইয়াদের একজন ছিলেন ঈশা খাঁ। তারই অমর কীর্তি সোনারগাঁ। এর প্রাকৃতিক শোভা, প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা চিঠিতে লিখে ঠিক তোকে বোঝাতে পারব না।

সকাল সাতটায় নাশতা সেরে আমরা দুজন সোনারগাঁর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ঢাকার কাছেই, তাই পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। রাস্তার পাশে বিরাট দ্বিতল ইমারত। এখন ভগ্নপ্রায়। সামনে মস্ত পুকুর। চারপাশে সারিসারি গাছ। শানবাঁধানো ঘাটের পাশে পাথরে খোদাই করা বীরযোদ্ধার গর্বিত প্রতিমূর্তি। তা বাংলার অবলুপ্ত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুলের প্রচেষ্টায় নির্মিত লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং ঈশা খাঁর রাজধানীর মূল ভবন। রাস্তার দুপাশে রয়েছে অনেক পুরানো অট্টালিকা। প্রাচীন যুগের অবাক-করা সব স্থাপত্য নিদর্শন। ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনী। এসব দেখতে দেখতে যেন অতীতে হারিয়ে গেলাম।

সময় পেলে তুইও একবার দেখে আসিস বাংলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোনারগাঁ। তোর পড়ালেখা কেমন চলছে জানাবি। ভালো থাকিস।

ইতি

দীপঙ্কর

প্রেরক দীপঙ্কর দাস ৩২/এ, তাজমহল রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	ডাক টিকিট প্রাপক নরেশচন্দ্র দাস ৪৪, কান্দির পাড়, কুমিল্লা।

৬. এস.এস.সি. পরীক্ষার পর অবসর দিনগুলো কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

৫.১.২০০৮
নীলফামারী

প্রিয় মুকুল,

শুভেচ্ছা নিস। অনেকদিন পর তোর চিঠি পেলাম। চিঠিতে তুই জানতে চেয়েছিস, আসন্ন পরীক্ষার পর কী করব? কেন, তোর কোনো পরিকল্পনা আছে নাকি? সিঙ্গাপুর, কলকাতা, কাঠমান্ডু কিংবা কক্সবাজারে সমুদ্রসৈকতে আনন্দভ্রমণে যাবার প্ল্যান? আসলে পরীক্ষার পর তিনমাস সময়টা যে খুব দীর্ঘ তা নয়। দেখতে দেখতে হয়তো কেটে যাবে। তবে আমি এই সময়টা কাজে লাগাতে চাই। নিরর্থক আনন্দভ্রমণের চেয়ে আমি বরং সময়টাকে অর্থময় করে তুলতে চাই।

প্রথমে আমার ইচ্ছে, পরীক্ষার পর কিছুদিন আমি গ্রামের বাড়িতে কাটাবো। সেখানে আমার একটা পরিকল্পনা আছে। আমরা গ্রামের বন্ধুরা মিলে ১০০০টি ফলজ, বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করব। গাছগুলো চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে আমাদের গ্রামের যে নতুন রাস্তাটা আছে, তার দুপাশে লাগাবো। কয়েকদিন গ্রামের বাড়িতে থাকাও হবে, বন্ধুদের নিয়ে গ্রামের জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগবে। আমাদের দেশে যে হারে বৃক্ষনিধন চলছে, তাতে পরিবেশ বিপর্যয় অত্যাসন্ন।

তারপর ঢাকায় আমার বড়মামার বাসায় কিছুদিন বেড়াবো। ঢাকায় বেশকিছু দর্শনীয় স্থান আমার দেখা হয়নি। মামা-মামি কতবার যেতে বলেছেন। কিন্তু পড়াশোনার জন্যে এতদিন যাওয়া হয়নি। ভাবছি মামার বাসায় বেড়ানো হবে, দর্শনীয় স্থানও দেখা হবে। আপাতত পরিকল্পনা হচ্ছে, ঢাকার রায়েরবাজারে অবস্থিত শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল দেখা। সম্ভব হলে ঈশা খাঁর সোনারগাঁ পরিদর্শন করব।

তুই তো জানিস, আমার বড়মামা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমার মেঝমামাকে পাকিস্তানি আর্মিরা গুলি করে হত্যা করেছে। এসব আমার জন্মেরও আগের কথা। মায়ের মুখে মেঝমামার নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা শুনতে শুনতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্মে গেছে। তাই প্রথমে রায়েরবাজারের বধ্যভূমি এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব। তারপর অন্যান্য জায়গা। মোটামুটি এই আমার পরিকল্পনা। ইচ্ছে করলে তুইও আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারিস।

আমার পরিকল্পনা তো জানালাম। এবার তোর অবসর কাটানোর পরিকল্পনা লিখে জানা। চাচা ও চাচিকে আমার সালাম দিস। তোর সুন্দর, বিকশিত জীবন কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে
নজরুল

	ডাক টিকিট
প্রেরক আহ্‌মেদ নজরুল ভেড়ামারা কুষ্টিয়া।	প্রাপক আমিরুল ইসলাম মুকুল প্রযত্নে : রমিজ মাতবরের বাড়ি গ্রাম : বিরামপুর জেলা : দিনাজপুর।

৭. মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

৫.৩.২০০৮
সুনামগঞ্জ

প্রিয় জিল্লুর,

আমার আন্তরিক ভালোবাসা নাও। গতকালই তোমার চিঠি পেলাম। চিঠিতে তুমি আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। তবে কি তুমি নিজের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে শুরু করেছ? জীবন সম্পর্কে তোমার এ সচেতনতা দেখে সত্যি আমি আনন্দিত। আসলে জীবন সম্পর্কে, জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার এটাই উৎকৃষ্ট সময়।

তুমি জেনে খুশি হবে যে, আমার এস.এস.সি. পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। ইন্‌শাল্লাহ্‌ আমি ভালোভাবে উত্তীর্ণ হব। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আমি ভালো কোনো কলেজে ভর্তি হতে চাই। বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাই। তারপর মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার আমার খুব ইচ্ছা। কারণ ভবিষ্যতে ভালো ডাক্তার হওয়াই আমার স্বপ্ন। জানি না তা কতটা সফল হবে।

কেন ডাক্তার হওয়ার কথা ভাবছি জানো? আমাদের গ্রামে এখনো কোনো এম.বি.বি.এস. ডাক্তার নেই। আমি দেখেছি, চিকিৎসার অভাবে আমাদের গ্রামে কত দরিদ্র মানুষ কষ্ট পায়, অকালে প্রাণ হারায় কত মানুষ। আমার ইচ্ছা, ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে আমি এই হতদরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করব। চিকিৎসা সেবাকে আমি মহৎ মানবিক সেবা বলে মনে করি। আমি এ সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে চাই।

এ মহৎ পেশার মাধ্যমে আমি যেন জনগণের সেবা দান করতে পারি, প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি একজন মহৎপ্রাণ চিকিৎসক হিসেবে, এই দোয়াই সবার কাছে প্রত্যাশা করি।

ভালো থেকো।

তোমারই

মোস্তাফিজ

ডাক টিকিট

প্রেরক	প্রাপক
মোস্তাফিজুর রহমান	জিল্লুর রহমান
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।	২/সি ,উপজেলা স্টাফ কোয়ার্টার
	মাগুরা।

৮. গ্রামকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

২২.৭.২০০৮

নওগাঁ

সুপ্রিয় সাজিদ,

আমার শুভেচ্ছা নাও। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। তোমার সাথে অনেকদিন কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি। এর কারণ 'নিরক্ষরতার অভিশাপ' থেকে আমাদের গ্রামকে মুক্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম এতদিন। এ ব্যস্ততার কারণে তোমার কাছে চিঠি লিখতে দেরি হল।

তুমি তো নিরক্ষরতার ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন, কারণ তুমি তো শহরে থাক। কিন্তু গ্রামের নিরক্ষর মানুষ যে কী অভিশপ্ত জীবনযাপন করে, তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। নিরক্ষরতার কারণে তারা প্রতিনিয়ত ঠকছে, বঞ্চিত হচ্ছে, ধোকা খাচ্ছে, রোগ-শোকে ধুঁকে মরছে। এসব চিত্র কোনো ক্রমেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

তাই সমমনা কয়েকজন মিলে 'প্রত্যয়' নামে একটা সংগঠন গড়ে তুলি। এর প্রথম কাজ হল, যে-কোনো মূল্যে আমাদের গ্রামকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। তাই আমরা প্রথমে গ্রামের মুরুব্বিদের সাথে কথা বলি। তাঁরা আমাদের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং নানা পরামর্শ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমার উদ্যোগের কথা জেনে, তার কাছারিঘরটা নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিলেন। আমরা কয়েকজন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করি। পুরো গ্রামে উৎসাহের ধুম পড়ে গেল। নিরক্ষর ছেলে, বুড়ো, বৌ-ঝিরা এ নৈশবিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে। আমরা প্রত্যেকে কাজ ভাগ করে নিলাম। এভাবে আজ ছয়মাস কাজ করছি। আশা করছি আর ছয়মাস কাজ করলে গ্রামের সব বয়স্কদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যাবে।

ইতোমধ্যে উপজেলা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আমাদের নৈশবিদ্যালয় পরিদর্শন করে গেছেন। কিছু সাহায্যেরও আশ্বাস দিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে 'প্রথম আলো' পত্রিকায় একটা সচিত্র প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছে।

আমি বুঝলাম, আসলে উদ্যোগ নিলেই হয়। উদ্যোগ নিয়েছি বলেই আজ গ্রামের বয়স্করা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চলছে। তুমি সময় পেলে একবার আমাদের নৈশবিদ্যালয়টি এসে দেখে যেও। আজ আর নয়। চিঠির উত্তর দিও।

ইতি

তোমার প্রীতিধন্য

নুরুল আমিন

	ডাক টিকিট
প্রেরক মো. নুরুল আমিন বদলগাছি নওগাঁ	প্রাপক সাজিদ আরমান ২৮/২, সেগুনবাগিচা ঢাকা- ১২০৭।

৯. সম্প্রতি পড়া একটা বই সম্পর্কে মতামত জানিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র।

২.৭.২০০৮

ভেড়ামারা

প্রিয় নভেরা,

আন্তরিক শুভেচ্ছা নাও। আশা করি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছো। গতকাল তোমার চিঠি পেয়ে বিস্তারিত জেনে খুশি হলাম। এভাবে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে খবরাখবর নিলে ভালো লাগে। চিঠিতে তুমি জানতে চেয়েছ পরীক্ষার ঝামেলা শেষে আমি এখন কী করছি? কীভাবে সময় কাটাচ্ছি?

আমি এখন বিভিন্নরকম বই পড়ে সময় কাটাচ্ছি। ইতোমধ্যে পড়েছি 'ছোটদের রামায়ণ', 'রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেঝদিদি', 'বিন্দুর ছেলে', হুমায়ূন আহমেদের 'তোমাদের জন্য রূপকথা', মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'দীপু নাম্বার টু' ইত্যাদি। গতকাল পড়ে শেষ করলাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'।

'পথের পাঁচালী'র অপুর সঙ্গে আমার জীবনের অদ্ভুত কিছু মিল খুঁজে পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। 'দুর্গা' যেন আমার আপার হুবহু সংস্করণ। গ্রামের প্রান্তে কাশবনে লুকোচুরি খেলা, হঠাৎ রেল আসতে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকা- এসবের মধ্যে আমি আমার কিশোরবেলাকে খুঁজে পেয়েছি। বিভূতিভূষণের বর্ণনাও অসাধারণ। যেন আমাদের দেবরামপুর গ্রাম মুহূর্তে নিশ্চিন্দপুর হয়ে গেছে। অপু, দুর্গার মা সর্বজয়া যেন আমার দুখিনী মা। সবচেয়ে কষ্ট লেগেছে দুর্গার মৃত্যু। বিশ্বাস কর, এ অংশটি পড়তে গিয়ে আমি কেঁদে ফেলেছি। রাতে ভাত খেতে পারিনি। সারারাত লেপের নিচে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। আমার মা ধমকের সুরে বলেছেন, যে বই পড়ে কাঁদতে হয়, সেরকম বই পড়ার দরকার কী? মাকে কী করে বোঝাই, দুর্গার মৃত্যুতে আমার কী যে কষ্ট হচ্ছে। ইন্দিরা ঠাকুরনের চরিত্রও আমার

হৃদয়কে স্পর্শ করেছে প্রবলভাবে। আজ অবধি আমি যত বই পড়েছি, তার মধ্যে 'পথের পাঁচালী' আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। এটি বিভূতিভূষণের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

আজ আর লিখছি না। ভালো থেকো। তোমার সময় কীভাবে কাটছে জানিয়ে চিঠি লিখো।

ইতি
জান্নাতুল ফেরদৌসী

ডাক টিকিট

প্রেরক	প্রাপক
জান্নাতুল ফেরদৌসী	নভেরা আহমেদ
ফিলিপনগর	প্রযত্নে : আলম মাস্টারের বাড়ি
ভেড়ামারা	গ্রাম : জয়নগর
কুষ্টিয়া।	ঈশ্বরদী, পাবনা।

১০. বিদ্যালয়ে শেষ দিনের মানসিক অবস্থা জানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি।

১৭.৫.২০০৮
শিবচর।

প্রিয় মনজুর,

অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি খোদার কৃপায় ভালো আছ। অন্যরকম একটি দিনের কথা লিখতে বসেছি আজ তোমাকে। আজ আমার স্কুলজীবনের শেষদিন। এ দিনটির কথা আমি আগে কখনো ভাবিনি। একদিকে দীর্ঘ দশ বছরের অভ্যস্ত জীবন, পরিচিত পরিবেশের মায়া ছিন্ন করার কষ্ট, অন্যদিকে স্কুলের দেয়াল ডিঙিয়ে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। মনের মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতি তৈরি হয়েছে।

এ স্কুলের প্রতিটি ইট-কাঠের সঙ্গে আমার কেমন যেন মায়াময় সম্পর্ক অনুভব করছি আজ। শ্রদ্ধেয় শিকমন্ডলী, অগণিত ছাত্রছাত্রী, পরিবেশের সঙ্গে একধরনের আত্মিক সম্পর্ক রচিত হয়েছিল। এগুলো ছেড়ে যেতে হৃদয় হাহাকার করছে। শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কেন জানি অজান্তেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তাঁদের অমূল্য উপদেশ আর দোয়া নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

স্কুলের শেষদিনে আমার মনের অবস্থা ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার ক্ষুদ্র জীবনের আজ এক স্মরণীয় দিন। স্মৃতির অ্যালবামে পাতাঝরা দিনের মতো এ দিনটি গচ্ছিত থাকবে চিরদিন।

তোমার খবর কী? কেমন লেগেছে স্কুলের শেষ দিনটাতে? তোমার অনুভূতি জানিয়ে চিঠির উত্তর দিও।

ইতি-
তোমারই
রফিক

ডাক টিকিট	
প্রেরক রফিকুল ইসলাম উমেদপুর শিবচর মাদারীপুর।	প্রাপক মনজুরুর রহমান ১৬৭, পাইক পাড়া মিরপুর-১ ঢাকা-১২১৬

১১. ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক সফরের উপকারিতা বর্ণনা করে বন্ধুর কাছে পত্র।

২৪/৪/২০০৮
কুড়িগ্রাম।

প্রিয় জসীম,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। আমরাও খোদার কৃপায় ভালো আছি। গত সপ্তাহে আমাদের স্কুলের সবাই মিলে ইতিহাসখ্যাত বগুড়া মহাস্থানগড় শিক্ষাসফরে গিয়েছিলাম। তোমাকে আজ লিখছি আমাদের সেই শিক্ষাসফর সম্পর্কে।

সেদিন সকাল সাড়ে আটটায় স্কুল ক্যাম্পাস থেকে আমাদের বাস ছেড়েছে। গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর সোয়া বারোটা। শিক্ষাসফরে যাব বলে সবার মাঝে ছিল দারুণ আনন্দ। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি, বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বইতে শুধু পড়েছি। সেখানে দাঁড়িয়ে যখন সেই লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের কথা আমাদের মমতাজ স্যার বলতে শুরু করলেন, কল্পনায় আমি যেন মুহূর্তে ফিরে গেলাম অতীতের সেই সমৃদ্ধ যুগে।

আমি উপলব্ধি করলাম, আসলে শুধু বই পড়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে শিক্ষাসফরে যাওয়া উচিত। এতে জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক যেমন গড়ে উঠতে পারে, তেমনি বইতে পড়া ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদের অনেক কিছু জানাও সম্ভব হয়।

বাস্তব শিক্ষার জন্য আসলে শিক্ষাসফরের কোনো বিকল্প নেই। তাই জীবনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে শিক্ষাসফরের খুবই প্রয়োজন। এতে আনন্দও হয়, আবার বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা ও বোঝার সুযোগ ঘটে। আজ আর নয়। ভালো থেকো।

ইতি-
ফিরোজ

ডাক টিকিট	
প্রেরক ফিরোজ চৌধুরী রাজারহাট কুড়িগ্রাম।	প্রাপক মো. জসীমউদ্দিন কলারোয়া সাতক্ষীরা

১২. পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র।

৩.৬.২০০৮
ঢাকা।

বন্ধুবরেষু শাকিল,

আজ তোমাকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাই। তোমার কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে আজ আমরা যারপরনাই আনন্দিত।

'যুগান্তর' পত্রিকায় কৃতী ছাত্র হিসেবে ছবিসহ তোমার রেজাল্টের খবর পড়ে আমি আনন্দে ও উত্তেজনায় কেঁপে উঠলাম। আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে যেন মহাসাগরের আনন্দহিল্লোল বয়ে গেল। চট্টগ্রাম বোর্ডের আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র তিনশ সাঁইত্রিশ জন এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে। তার মধ্যে তুমি একজন। তোমার এ সাফল্যে এক সোনালি ভোরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ গৌরবোজ্জ্বল ফলাফলের জন্য তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

নিঃসন্দেহে তুমি একদিন জাতির অন্যতম কর্ণধার হবে। তোমার জ্ঞানসাধনার সঙ্গে সততা ও নিষ্ঠা থাকবে। তুমি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে একদিন ভূমিকা রাখবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে এখানেই শেষ করলাম। ভালো থেকো।

ইতি-
তোমার প্রীতিমুগ্ধ
দিলীপ

প্রেরক	প্রাপক
দিলীপ ঘোষ	শাকিল ইমতিয়াজ
৫১, বড় মগবাজার	গ্রাম : দেবরামপুর
ঢাকা।	পোস্ট: ইয়াকুবপুর
	দাগনভুঁইয়া, ফেনী।

ডাক টিকিট

খ. আবেদনপত্র বা দরখাস্ত

কোনো পদে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্যে বা ছুটি, বদলি, সাহায্য চেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে যে আনুষ্ঠানিক পত্র লেখা হয়, তাকে দরখাস্ত বা আবেদনপত্র বলে। আবেদনপত্র শুদ্ধ, সুলিখিত এবং তথ্য সংবলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অসম্পূর্ণ এবং ভাষাগত ত্রুটিময় আবেদনপত্র অনেক সময় মূল উদ্দেশ্যের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে সুন্দর, নির্ভুল, সুলিখিত দরখাস্ত প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষা ও রুচি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অনুকূল দৃষ্টি লাভে ও উচ্চ ধারণা পোষণে সাহায্য করে।

তাই যে-কোনো আবেদনপত্র বা দরখাস্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকা দরকার। দরখাস্ত লেখার সময় নিম্নলিখিত দিকগুলোর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে :

১. **প্রাপকের নাম-ঠিকানা** : প্রাপকের অংশে নিয়োগকর্তার নাম, পদ বা নিয়োগকারী সংস্থার নামের বানান সঠিক এবং ঠিকানা নির্ভুল হতে হবে। অনেক সময় ঝামেলা এড়াতে বা গোপনীয়তা রক্ষা করতে পোস্টবক্স কিংবা কোনো পত্রিকার মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। যেমন :

   বিজ্ঞাপন দাতা
   পোস্ট বক্স নং ০৬৫
   প্রযত্নে : দৈনিক ইত্তেফাক
   ঢাকা।

২. **বিষয়** : এ অংশে কাঙ্ক্ষিত বিষয় বা পদের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। আবেদনের মূল বিষয়টি যেন কর্তৃপক্ষ সহজে অনুধাবন করতে পারে সে জন্য সরল ভাষায় তার উল্লেখ প্রয়োজন।

৩. **সম্বোধন** : আনুষ্ঠানিক সম্বোধন হবে : মহোদয়, মহাত্মন ইত্যাদি।

৪. **আবেদনের সূত্র** : সাধারণত পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চাকরির নিয়োগের কথা জানা যায়। তাই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখসহ সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সূত্র উল্লেখ করে অথবা বিশ্বস্ত সূত্রের কথা জানিয়ে আবেদনপত্রের বক্তব্য শুরু করতে হয়।

৫. **আবশ্যিক তথ্য** : আবেদনপত্রে আবেদনকারীর পূর্ণ নাম, বাবা-মায়ের নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, জন্মতারিখ, নাগরিকত্ব, শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ ইত্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবেশ করতে হবে।

৬. **অতিরিক্ত তথ্য** : কোনো উচ্চতর ডিগ্রি, প্রশিক্ষণ কোর্স বা সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে তাও আবেদনপত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৭. **সংযুক্তি** : দরখাস্তের শেষে আবেদনে বর্ণিত তথ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে যা কিছু সংযুক্ত করা হয়, যেমন : বিভিন্ন পরীক্ষা পাসের সনদ, প্রাপ্ত নম্বরপত্র, প্রশংসাপত্র, নাগরিকত্বের সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ, সত্যায়িত করা ছবি ইত্যাদির উল্লেখ করতে হয়। কী কী প্রামাণ্য কাগজ দেওয়া হল, তা ক্রমানুসারে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

৮. **মার্জিন** : আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় মার্জিন থাকতে হয়। পৃষ্ঠার উপরে এবং বামে প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে দরখাস্ত লিখতে হবে।

আবেদনপত্রের নমুনা

১. 'প্রশংসাপত্র' চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট দরখাস্ত।

তারিখ : ১৪/৬/২০০৮
প্রধান শিক্ষক
জাহানারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ
নোয়াখালী।

বিষয় : প্রশংসাপত্রের জন্য আবেদন।

জনাব,

সবিনয়ে নিবেদন এই, আমি আপনার স্কুলের একজন নিয়মিত ছাত্রী। ২০০৭ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি. পরীক্ষায় আমি জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। স্কুলে গত পাঁচ বছর অধ্যয়নকালে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম। কোনো আইনশৃঙ্খলা বিরোধী কাজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। আমি কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। তাই আপনার স্বাক্ষরিত একটি প্রশংসাপত্র অত্যন্ত প্রয়োজন।

অতএব অনুগ্রহপূর্বক আমাকে চারিত্রিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রশংসাপত্র প্রদান করে বাধিত করবেন।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত-

(নাহিদ সুলতানা পলি)
এস.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী
পরীক্ষার ক্রমিক নম্বর ৭
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৩২৭
ব্যবসায় শিক্ষা শাখা
জাহানারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী।

২. দরিদ্র তহবিল/ছাত্রকল্যাণ তহবিল হতে সাহায্যের আবেদন।

তারিখ : ৫/৭/২০০৮
প্রধান শিকক্ষ
পটিয়া আদর্শ বিদ্যালয়
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিষয় : ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন।

মহোদয়,
আমি আপনার স্কুলের নবম শ্রেণীর একজন নিয়মিত ছাত্র। পাঁচ বছর যাবৎ আমি এ স্কুলে পড়ালেখা করছি। গত বার্ষিক পরীক্ষায়ও আমি প্রথম স্থান অধিকার করে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি আর্থিক অনটনে আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।
আমার বাবা একজন কৃষক। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে শয্যাশায়ী। তাঁর

চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ দরকার। এ বিপদে সাহায্য করবে এরকম আত্মীয়স্বজনও তেমন নেই। ভাইবোনের লেখাপড়া, ভরণপোষণ, বাবার চিকিৎসার ব্যয়, সব মিলিয়ে আমাদের পরিবারের অবস্থা বিপন্ন। তাই নিরুপায় হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। পারিবারিক দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ এবং ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক কিছু সাহায্য প্রদান করলে বিশেষভাবে উপকৃত হব। না হয় আমার পড়ালেখা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে আমার জীবনে নেমে আসবে গভীর অন্ধকার।
অতএব বিনীত প্রার্থনা, আমাকে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ এবং দরিদ্র তহবিল থেকে এককালীন কিছু অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

(মো. শামসুল আলম)
নবম শ্রেণী, রোল-১
বিজ্ঞান শাখা
পটিয়া আদর্শ স্কুল, পটিয়া।

৩. স্কুলের ভেতরে ক্যান্টিন স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রধান শিক্ষকের সমীপে দরখাস্ত।

তারিখ : ২০.৩.২০০৮
মাননীয়
প্রধান শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় : স্কুলের ভেতরে ক্যান্টিন স্থাপনের আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার স্কুলের অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী। প্রতিদিন আমরা অনেক দূরদূরান্ত থেকে স্কুলে আসি। নানা কারণে অনেকের পক্ষে প্রতিদিন টিফিন আনা সম্ভব হয় না। স্কুলের টিফিন পিরিয়ডের স্বল্পতম সময়ে ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে টিফিন কিনে আনা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় স্কুল ক্যাম্পাসের ভেতরে একটা ক্যান্টিন স্থাপন করা হলে ছাত্রছাত্রীদের এ সমস্যা নিরসন হতে পারে।
অতএব মহোদয়ের কাছে প্রার্থনা যে, ছাত্রছাত্রীদের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে স্কুল ক্যাম্পাসে একটি ক্যান্টিন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমরা বিশেষভাবে বাধিত হব।

বিনীত-

অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
আইডিয়াল স্কুল
মতিঝিল, ঢাকা।

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদের জন্য আবেদনপত্র।

তারিখ : ২৪.৭.২০০৮
মাননীয়
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর, ঢাকা।

বিষয় : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয়ে নিবেদন এই যে, গত ১৬ই জুন ২০০৮ তারিখে দৈনিক 'জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করছি। নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ করা হল :

১. নাম : ফাল্গুনী আহমেদ দীপিকা

২. পিতার নাম : কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ

৩. মাতার নাম : বেগম হাফিজা সুলতানা

৪. স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : ফজলুল হক মুন্সী বাড়ি, গ্রাম : ডুমুরখালি, পোস্ট: ঝিকরগাছা, জেলা : যশোর।

৫. জন্ম তারিখ : ২৮শে মে, ১৯৮৮

৬. জাতীয়তা : বাংলাদেশি

৭. ধর্ম : ইসলাম

৮. শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ :

পরীক্ষার নাম	পাসের বছর	গ্রুপ	জিপিএ/বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি.	২০০৪	বিজ্ঞান	A + জিপিএ-৫	যশোর বোর্ড
এইচ.এস.সি.	২০০৬	বিজ্ঞান	A + জিপিএ-৫	যশোর বোর্ড
বি.এ.	২০০৭	মানবিক	দ্বিতীয়	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অতএব, উপর্যুক্ত তথ্যাবলির আলোকে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করলে বাধিত হব।

বিনীত নিবেদক

ফাল্গুনী আহমেদ দীপিকা

সংযুক্তি :

১. সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি- ৩ কপি

২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ- ২ কপি

৩. সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি- ৩ কপি।

৫. শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে বিদ্যালয়ের প্রধানের কাছে আবেদনপত্র।

তারিখ : ২১.৩.২০০৮
প্রধান শিক্ষক
মানিকছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়
বইলছড়ি, রাঙ্গামাটি।

বিষয় : শিক্ষাসফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় অর্থ ও অনুমতির জন্য আবেদন।

মহাত্মন,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা শিক্ষাসফরে যেতে আগ্রহী। শ্রেণীকক্ষের সীমাবদ্ধ পাঠ্যসূচির বাইরে ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান অর্জনের জন্য এই শিক্ষাসফর সহায়ক হবে বলে মনে করি। আমরা ইতিহাসখ্যাত কুমিল্লার ময়নামতি যেতে চাই। ময়নামতি সম্পর্কে আমরা পাঠ্যবইতে অনেক পড়েছি, বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করে আমাদের জানার পরিধি আরো বাড়াতে চাই।
অতএব মহাত্মনের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আমাদের শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করলে বিশেষভাবে বাধিত হব।

বিনীত-

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে,
নিরু চাকমা
মনিকা মারমা ও
দীপংকর চাকমা,
মানিকছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়
বইলছড়ি, রাঙ্গামাটি।

৬. আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন।

তারিখ : ১১.০১.২০০৮
মাননীয়
পৌরসভা চেয়ারম্যান
ফুলবাড়িয়া পৌরসভা
ময়মনসিংহ।

বিষয় : আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের আবেদন।

জনাব,
সবিনয়ে নিবেদন এই যে, আমরা ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের অধিবাসী। এই এলাকা খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। কয়েকটি গার্মেন্টস, পৌর-বাণিজ্যবিতানসহ বেশ কয়েকটি কারখানা থাকায় এই এলাকা ফুলবাড়িয়া পৌরসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ জরিপ চালিয়ে এলাকার অধিকাংশ চাপাকলের পানিতে ভয়াবহ আর্সেনিকের দূষণ আছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন। আর্সেনিকযুক্ত চাপাকলগুলোতে লাল রং দিয়ে শনাক্ত করে এগুলোর পানি পান না করার জন্য এলাকার মানুষদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তবু অজ্ঞতাবশত অনেক মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহার করে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। এলাকায় বর্তমানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র অভাব বিরাজ করছে। তাই অতিসত্বর আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা দরকার।

অতএব মহোদয়ের সমীপে বিনীত আবেদন, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করবেন। এটি একটি জনগুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। তাই জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

বিনীত

ফুলবাড়িয়া পৌরবাসীর পক্ষে,
মো. সোহরাব পাশা
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

৭. মজাপুকুর সংস্কারের জন্য আবেদন জানিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত।

তারিখ : ১২ই মার্চ ২০০৮
চেয়ারম্যান
ধানগড়া ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজগঞ্জ।

বিষয় : ধানগড়া রামেন্দ্র পুকুর সংস্কারের জন্য আবেদন।

জনাব ,
সবিনয়ে নিবেদন এই যে, ধানগড়া গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সরকারি রামেন্দ্র পুকুরটি দীর্ঘদিন যাবৎ হাজামজা হয়ে পড়ে আছে। বহুদিন অব্যবহৃত থাকায় পুকুরটিতে ময়লা-আবর্জনা ও কচুরিপানার জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। ফলে এটি যেমন মশামাছি, সাপখোপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, তেমনি এলাকায় বাতাসে দুর্গন্ধও ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এ পুকুরটি সংস্কার করে সেখানে মৎস্য চাষ করা হলে সরকার যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে, তেমনি এলাকার পরিবেশও নির্মল হবে।
অতএব জনস্বার্থ বিবেচনা করে ধানগড়া রামেন্দ্র পুকুরটি আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত-

এলাকাবাসীর পক্ষে,
আপনার বিশ্বস্ত

মো. শাহাজাহান চৌধুরী
ধানগড়া, সিরাজগঞ্জ।

গ. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে চিঠি

জনগণের অভাব-অভিযোগ, স্থানীয় কোনো সমস্যা, জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনেক সময় সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হতে হয়। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও যথাযথ প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হন। তাই সমস্যার আশু সমাধানের জন্যে উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতে হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে সেইসব চিঠি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়ে থাকে। যেমন : ইত্তেফাকের 'চিঠিপত্র', প্রথম আলোর 'পাঠকের অভিমত', জনকণ্ঠের 'সম্পাদক সমীপে' ইত্যাদি। প্রকাশিত চিঠির বক্তব্য ও দায়দায়িত্ব লেখকের ওপর বর্তায়। সম্পাদক প্রকাশিত চিঠির কোনো দায়দায়িত্ব নেন না। এসব কলামের নিচে তাই লেখা থাকে- 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়'।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আসলে দুটো চিঠি লিখতে হয় : ১. সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করে পত্র, এবং
২. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র।

পত্রলেখক যে সংবাদপত্রে চিঠিটি প্রকাশ করতে চান, সেই পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে হয়। এই চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভালো। সম্পাদককে সম্বোধন করা ছাড়াও যথাস্থানে তারিখ এবং নিচে প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর দিতে হয়। অনুরোধপত্রের সঙ্গে প্রকাশিতব্য চিঠি যুক্ত করে পাঠাতে হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য চিঠিটাই মূলচিঠি। বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেটি তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিযুক্ত, বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। প্রাসঙ্গিক বিষয় এমনভাবে উল্লেখ করতে হবে, যাতে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হয়। সমস্যা ও বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে চিঠি বড় বা ছোট হয়। চিঠির বক্তব্য যথাযথ, বিষয়ানুগ, বাহুল্যবর্জিত ও সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের চিঠিতে সাধারণত ভাবাবেগ প্রকাশের সুযোগ নেই। বক্তব্যের পারম্পর্য এবং ভাষার শুদ্ধতার প্রতি তাই বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে চিঠির নমুনা :

১. বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আশু প্রতিকার চেয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ১২.৪.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক করতোয়া
বগুড়া।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্যে 'আক্কেলপুরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিকার চাই' শিরোনামে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি।
আশা করি, এলাকার জনগুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি প্রকাশে আমরা আপনার আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হব না।

বিনীত

মজিদ মাহমুদ
আক্কেলপুর,বগুড়া।

আক্কেলপুরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিকার চাই

বগুড়া জেলার সুতরাপুর উপজেলার প্রত্যন্ত এবং অবহেলিত অঞ্চল আক্কেলপুর। এ অঞ্চলের মানুষের মতো এত অবহেলিত সম্ভবত বাংলাদেশের আর কোনো অঞ্চলের মানুষ নেই। অনেক সরকার এসেছে, গেছে, কিন্তু আক্কেলপুরের মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই এলাকায় বিদ্যুৎ এসেছে ১৯৯৬ সালে। নিয়মিত বিদ্যুৎ পাওয়ার আশায় সবাই বাসা-বাড়িতে সংযোগ নিয়েছে, কেউ লেদ মেশিন, কেউ স্টুডিও, কেউ ফটোস্টেটের মেশিন কিনে দোকান খুলেছেন। এখন সবার মাথায় হাত। বিদ্যুৎ এই আছে তো এই নেই। বিদ্যুতের এই ভেলকিবাজির কারণে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে, স্কুল-কলেজের

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার দারুণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। তা ছাড়া বিদ্যুৎ না থাকার কারণে এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বেড়ে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। তাই এলাকাবাসীর মনে প্রশ্ন— 'আক্কেলপুরের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হবে কি?' কবে শেষ হবে এই গভীর অমানিশার কাল?

বিষয়টি নিয়ে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেও প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন- আক্কেলপুরের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিকার হোক। অবিলম্বে জনগণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

এলাকাবাসীর পক্ষে,

মজিদ মাহমুদ
সুত্রাপুর উপজেলা
আক্কেলপুর, বগুড়া।

২. বন্যার্তদের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ১৪.৮.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
১. আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় এইসঙ্গে প্রেরিত পত্রটি প্রকাশ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়তা করলে বাধিত হব।

বিনীত
মো. নুরুল ইসলাম
সোনাগাজী, ফেনী

ফেনী-সোনাগাজী অঞ্চলের বন্যার্তদের জন্য মানবিক সাহায্যের আবেদন।

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলা নদী-উপকূলীয় একটি নিম্নাঞ্চল। প্রতিবারের মতো এবারও সর্বনাশা বন্যার গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। এবারের বন্যা স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা। অবিরাম বৃষ্টির ফলে স্থানীয় মাতামুহুরী নদীর বেড়িবাঁধ ভেঙে গিয়ে পুরো উপজেলা আজ ভয়াবহ বন্যাকবলিত। পাহাড়ি ঢল আর আসাম-ত্রিপুরা থেকে নেমে আসা পানিতে ভেসে গেছে এই এলাকার সমস্ত অবকাঠামো। রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি, ফসলের জমি, গবাদিপশুসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পানিবন্দি হাজার হাজার মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে। চারিদিকে পানি অথচ বিশুদ্ধ পানীয় জলের খুবই অভাব। বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে এলাকায় দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ। অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগে দুর্গত এলাকায় খাদ্য, পানীয় জল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

বন্যাকবলিত সোনাগাজী অঞ্চলের জনজীবনের বিপর্যস্ত অবস্থা বিবেচনা করে অতিসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

নিবেদক-

সোনাগাজী উপজেলাবাসীর পক্ষে,
মো. নুরুল ইসলাম
কুটিরহাট, সোনাগাজী
ফেনী।

৩. পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ২৪.১২.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক জনকণ্ঠ
২৪/এ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশনার আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'জনকণ্ঠ' পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।

নিবেদক

মো. জাহাঙ্গীর হোসাইন
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল চাই

আমরা সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার অধিবাসী। এই এলাকার সবগুলো টিউবওয়েলের পানিতে ভয়াবহ রকম আর্সেনিকের দূষণ রয়েছে। সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ পরীক্ষা চালিয়ে আর্সেনিকযুক্ত অধিকাংশ টিউবওয়েলকে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করে এবং এগুলোর পানি ব্যবহার-অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। শুষ্ক মৌসুমে এই এলাকার পুকুর ও কুয়াতে পানি থাকে না। বাধ্য হয়ে মানুষকে নলকূপের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ আজ সেই নলকূপের পানি ক্ষতিকর আর্সেনিক-আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তেঁতুলিয়া এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। অজ্ঞতাবশত গ্রামের সাধারণ মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহার করে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত, এ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা করতে হলে দ্রুত বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা উচিত। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এলাকাবাসীর প্রত্যাশা, পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথাশীঘ্র সম্ভব আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। এটা জনগণের মানবিক আবেদন। আশা করি, কর্তৃপক্ষ মানবিক আবেদনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

নিবেদক-

তেঁতুলিয়া গ্রামবাসীর পক্ষে,
মো. জাহাঙ্গীর হোসাইন
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

৪. 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ৭.৮.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক আমার দেশ
বিসিআইসি ভবন
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকায় জনগুরুত্বপূর্ণ পত্রটি প্রকাশ করলে বিশেষভাবে বাধিত হব।

নিবেদক-

সুজিত কুমার দে
মড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, তা আমরা কখনো ভেবে দেখি না। ডাঙায় তোলা মাছের যেমন প্রাণহীন ছটফট অবস্থা হয়, সে তুলনায় বৃক্ষহীন পৃথিবীতে মানুষের অবস্থা হবে আরো ভয়াবহ। সবুজ বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। পৃথিবীর পরিবেশকে সুস্থ ও শীতল রাখে। শুধু তাই নয়, বৃক্ষ আমাদের ফুল দেয়, ফল দেয়, শীতল ছায়া দেয়। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, সবকিছুর জন্য আমরা প্রকৃতির অকৃপণ দান বৃক্ষের ওপরই নির্ভরশীল। তাই সবুজ বনভূমিকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস।
আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বৃক্ষ ও বনভূমির পরিমাণ খুবই কম। যে-কোনো দেশে মোট ভূখণ্ডের পঁচিশ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। অথচ আমাদের দেশে আছে মাত্র সতেরো শতাংশ। তারপরও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কেটে ফেলে আমরা সবুজ বনভূমি উজাড় করে চলেছি। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে যে-কোনো সময় আমরা ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারি। তাই শীঘ্রই সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আমাদের বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে প্রচুর বনায়ন করতে হবে।
'একটা গাছ কাটলে তিনটি গাছের চারা লাগাতে হবে' এই স্লোগানকে সামনে রেখে, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিনীত-

মড়েলগঞ্জ গ্রামবাসীর পক্ষে,
সুজিত কুমার দে
মড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট

৫. ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

২.১.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক আজাদী
৯ সিডিএ এভিনিউ
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার স্বনামধন্য বহুল প্রচারিত 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকায় নিম্নোক্ত জনগুরুত্বপূর্ণ পত্রটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।

নিবেদক—

মো. রফিকুল ইসলাম
মোহনপুর, কিশোরগঞ্জ।

ডাকঘর চাই

কিশোরগঞ্জ জেলার মোহনপুর একটি জনবহুল গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় বিশ হাজার লোকের বসবাস। এখানে রয়েছে রবিশস্য ও তরিতরকারির বিশাল পাইকারি বাজার, কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, একটি হাইস্কুল, দুটি প্রাইমারি স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ সরকারি-বেসরকারি নানা অফিস। গ্রামের অনেক লোক দেশ-বিদেশে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে কোনো ডাকঘর নেই। এখান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে থানা সদরে একটা ডাকঘর রয়েছে। সেখান থেকে একজন ডাকপিয়ন সপ্তাহে মাত্র একদিন চিঠি বিলি করতে আসে। তাই জরুরি চিঠিপত্র, মানিঅর্ডার সময়মতো পাওয়া যায় না। এতে জনগণের দুর্ভোগের শেষ নেই। একটা ডাকঘরের অভাবে মোহনপুর গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে।
ডাক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন, কিশোরগঞ্জ জেলার মোহনপুরে ডাকঘরের একটা শাখা স্থাপন করা হোক। এতে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। পাশাপাশি জনগণেরও দুর্ভোগ লাঘব হবে।

নিবেদক-

মোহনপুর গ্রামবাসীর পক্ষে,
মো. রফিকুল ইসলাম
মোহনপুর, কিশোরগঞ্জ।

৬. সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে অভিমত জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পত্র।

তারিখ : ১২.৬.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
১২/৭, উত্তর কমলাপুর
ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হব।

বিনীত-

মো. আবুল হোসেন
কলেজ রোড, দিনাজপুর

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিকার চাই

'একটা দুর্ঘটনা- সারা জীবনের কান্না' —এ স্লোগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর। আজকাল আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন টিভির পর্দায় আর পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার

মর্মান্তিক খবর। এতে কত মূল্যবান প্রাণ অকালে ঝরে পড়ছে, কত পরিবার পথে বসছে, সেই অশ্রুসজল করুণ মুখের হিসাব কেউ রাখে না। পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সামনে পিতার রক্তাক্ত নিথর দেহ এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনাগুলো কয়েকটি কারণে হয়ে থাকে : ক. ত্রুটিযুক্ত গাড়ি; খ. অনভিজ্ঞ বা নেশাখোর ড্রাইভার; গ. ধারণ ক্ষমতার অধিক মাল বা যাত্রী বহন; ঘ. ওভারটেকিং বা চালকদের দায়িত্বহীনতা; ঙ. ট্রাফিক আইন না মানার মানসিকতা ইত্যাদি। এই সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। যেমন : রাস্তা সংস্কার, ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়ন, পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যানবাহনবিধি ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং মিডিয়াগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আশা করি, উপর্যুক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক-
এলাকাবাসীর পক্ষে,
মো. আবুল হোসেন
কলেজ রোড, দিনাজপুর

৭. আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বে এলাকার রাস্তা সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ১৬.৩.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বিশেষভাবে বাধিত হব।

বিনীত-

শামসুল হক হায়দার
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

কোম্পানীগঞ্জ-দাগনভূঁইয়া সড়কটি সংস্কার করা হোক

কোম্পানীগঞ্জ-দাগনভূঁইয়া সড়কটি দীর্ঘদিন যাবত যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অথচ এটি ফেনী এবং নোয়াখালী দুটো জেলার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়ক। প্রায় পাঁচ লাখ লোকের যাতায়াতের একমাত্র সড়কটি গত বছর বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিদিন ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ দেশের দূরদূরান্ত থেকে যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এই ভাঙা সড়ক দিয়ে যাতায়াত করছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এ সড়কে। কয়েকদিন আগে দুধমুখা পুল ও মুন্সীবাড়ির দরজায় দুটি গাড়ি দুর্ঘটনায়-কবলিত হয়ে পাঁচজন লোক মারা গেছে এবং

আহত হয়েছে শতাধিক। আসন্ন বর্ষার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি যদি সংস্কার না করা হয়, তবে যানচলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কোম্পানীগঞ্জ-দাগনভূঁইয়া সড়কটি দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক-
এলাকাবাসীর পক্ষে,
শামসুল হক হায়দার
কোম্পানীগঞ্জ, বসুরহাট
নোয়াখালী।

৮. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধকল্পে জনমত তৈরি করার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ২৬.৩.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
১. রামকৃষ্ণ মিশন রোড
ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত ' দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় নিম্নোক্ত পত্রটি প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত

ইন্দ্রজিৎ মন্ডল
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনমনে নাভিশ্বাস

সম্প্রতি দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন পাগলা ঘোড়া জনমনে চরম নাভিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বল্প আয়ের। খেটে খাওয়া এসব সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংগতি রাখতে পারছে না। মানুষ এমনিতে নানারকম সমস্যায় জর্জরিত, তার ওপর দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়ে। শুধু স্বল্প আয়ের মানুষ নয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সবার জীবনেই নেমে এসেছে চরম হতাশা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য কারা দায়ী, তা খতিয়ে দেখা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। তা ছাড়া সর্বস্তরের মানুষের মাঝেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে জনমনে যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে, তা যে-কোনো সময় গণবিস্ফোরণে রূপ নিতে পারে।

আশা করি, সরকারের উর্ধ্বতন মহল ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন। তা না হলে সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া খুব কঠিন হবে।

নিবেদক-

এলাকাবাসীর পক্ষে,
ইন্দ্রজিৎ মন্ডল
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

৯. দাতব্য চিকিৎসালয়ের দুরবস্থার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ১১.২.২০০৮
সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব
২/এ আর. কে. মিশন রোড
ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় এইসঙ্গে প্রেরিত পত্রটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।

বিনীত

তৌহিদুর রহমান
মালাশিয়া, রাজবাড়ি।

বিরামপুর দাতব্য চিকিৎসালয়টির প্রতি নজর দিন

রাজবাড়ি জেলার বিরামপুর উপনগর দাতব্য চিকিৎসালয়টি ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাংশা, মালাশিয়াসহ আশেপাশের প্রায় দশটা গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন এ দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করে আসছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিল্ডিংগুলো পুরানো ও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ নেই। আউটডোর, ইনডোর মিলিয়ে পাঁচ জন ডাক্তারের পদ শূন্য হয়ে আছে। সামান্য ঔষধপত্র যা আসে তারও ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার কেউ নেই। একজন কম্পাউন্ডার গত তিন বছর ধরে চিকিৎসালয়টি চালাচ্ছেন।

এলাকাবাসীর দাবি, এ করুণ অবস্থা থেকে চিকিৎসালয়টিকে রক্ষা করা হোক। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার, যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বিরামপুর উপনগর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে জনগণের সে মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেবেন বলে আমরা আশা রাখি।

নিবেদক-

এলাকাবাসীর পক্ষে,
তৌহিদুর রহমান
মালাশিয়া, রাজবাড়ি।

১০. গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র।

তারিখ : ১.১২.২০০৮
সম্পাদক
ইত্তেফাক
১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড
ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি চিঠি এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। আশাকরি, এটি প্রকাশ করে এলাকাবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

নিবেদক-
খায়রুল আনাম চৌধুরী
হরিনাথপুর, পলাশবাড়ি
গাইবান্ধা।

মনন বিকাশের জন্য গ্রন্থাগার চাই

গাইবান্ধা জেলার হরিনাথপুর একটি জনবহুল ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় বিশ হাজার লোক বাস করে। এখানে একাধিক হাইস্কুল, বাজার, মাদ্রাসা, ব্যাংকসহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এখানে কোনো গ্রন্থাগার নেই। ফলে জ্ঞানপিপাসু ও শিক্ষার্থীদের বহুদূরে জেলা শহরে গিয়ে বই বা পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করতে হয়। অথচ গ্রামে একটা গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি থাকলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, চাকরিজীবী, সকলে অবসরে-অবকাশে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেত। উঠতি বয়সী তরুণরা বই, পত্রপত্রিকা পড়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পেত। এ ব্যাপারে নানা সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের সম্পৃক্ত করে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি উক্ত এলাকায় একটা গ্রন্থাগার স্থাপন করে আলোকিত সমাজ গঠনে ও বিদ্যানুরাগীদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে এগিয়ে আসবেন।

নিবেদক-

এলাকাবাসীর পক্ষে,

খায়রুল আনাম চৌধুরী
হরিনাথপুর, পলাশবাড়ি,
গাইবান্ধা।

ঘ. মানপত্র ও স্মারকলিপি

আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে বরণ বা বিদায় জানানোর জন্যে যে সম্মাননাপত্র রচনা করা হয়, তাকে মানপত্র বলে। মানপত্র সাধারণত সামাজিক, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে পাঠ করে সংবর্ধেয় ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মানপত্রের ভাষা পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ হতে হয়। এতে সংবর্ধেয় ব্যক্তির কর্মকৃতি, ব্যক্তিত্ব, ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য, পাণ্ডিত্য, শিক্ষা ও দক্ষতা ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। তাই বিভিন্ন উপশিরোনাম দিয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য, অবদান প্রভৃতিকে নানা বিশেষণে অভিষিক্ত করতে হয়। মানপত্র সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে বা ছাপিয়ে, অলংকৃত এবং বাঁধাই করে দেওয়াই নিয়ম।

'সংবর্ধনা' শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা, সসম্মানে অভ্যর্থনা। তাই সংবর্ধেয় ব্যক্তির সম্মান যাতে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য সুশোভন শব্দ ব্যবহার করা উচিত। গুণী ব্যক্তির আগমন বা তাঁর মহৎ ভূমিকা, অবদানের স্বীকৃতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোই মূলত এ ধরনের মানপত্র রচনার লক্ষ্য।

মানপত্রের বিভিন্ন অংশ

মানপত্র রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিয়ম বা রীতি অনুসরণ করতে হয়। মানপত্রের বিভিন্ন অংশ এরকম: ১. মূল শিরোনাম, ২. উপশিরোনাম, ৩. নাম-স্বাক্ষর ও তারিখ।

১. **মূল শিরোনাম** : যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাকে, যে উপলক্ষে সংবর্ধনা দেয়, তার উল্লেখ করতে হয় এ অংশে। তারপর উপলক্ষ ও মানপত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী 'উষ্ণ অভিনন্দন', 'প্রাণঢালা শুভেচ্ছা', 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' ইত্যাদি লিখতে হয়।

২. **উপশিরোনাম** : এটাই মানপত্রের মূল অংশ। এক-একটি উপশিরোনাম দিয়ে এক-একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হয়। ভাব ও বক্তব্য অনুযায়ী অনুচ্ছেদগুলো পরস্পর সংগতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শুরুতে সংবর্ধেয় ব্যক্তির গুণপ্রকাশক সম্বোধন বা সম্ভাষণ থাকতে হয়। যেমন : সংবর্ধেয় ব্যক্তি শিক্ষক হলে, সম্ভাষণ হবে 'হে বরেণ্য শিক্ষক', 'হে শিক্ষাগুরু', 'হে আলোর পথের দিশারী', 'হে মহান সাধক', 'হে জ্ঞানতাপস' ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীদের বরণ বা বিদায়ের ক্ষেত্রে হবে–'হে নবীন বন্ধুরা', 'আলোর পথের যাত্রীরা', 'সূর্যশিখা ভাইবোনেরা' ইত্যাদি।

৩. **নাম-স্বাক্ষর ও তারিখ** : যে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, মূল পত্রাংশের শেষে তাদের সমষ্টিগত প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় দিতে হয়। তারপর নাম-স্বাক্ষরের আগে 'বিনীত', 'গুণমুগ্ধ', 'বিনয়াবনত', 'শ্রদ্ধাবনত' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। নাম-স্বাক্ষর অংশ ডানদিকে থাকে। বামদিকে তারিখ দিতে হয়। তারিখের বেলায় কেউ কেউ বঙ্গাব্দ ও খ্রিস্টাব্দ দুটিই দিয়ে থাকেন।

মানপত্র ও স্মারকলিপির নমুনা:

১। এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনাপত্র।

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলের ২০০৮ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে
আন্তরিক সংবর্ধনা

হে বিদায়ী ভাই-বোনেরা,

যে পথ একদিন তোমাদের নিয়ে এসেছিল এই স্কুলের আঙিনায়, আজ সেই পথই আবার তোমাদের ডাক দিয়েছে- 'হাঁকিছে ভবিষ্যৎ, হও আগুয়ান।' হৃদয়-বীণায় তাই আজ বাজছে বিদায়ের করুণ সুর। সেই সুর যেন বলছে-'ভুবনের

ঘাটে ঘাটে, এক ঘাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য ঘাটে।' শুভ হোক তোমাদের ভবিষ্যৎ। তোমরা আমাদের প্রীতি গ্রহণ কর।

হে অগ্রজ বন্ধুরা,

এই স্কুলে তোমাদের কেটেছে স্মৃতিময়, প্রীতিময় অনেক দিন। তোমাদের প্রাণোচ্ছল পদভারে এই স্কুলের আঙিনা ছিল মুখরিত। তোমাদের সাথে আমাদের স্নেহসিক্ত প্রীতিময় বন্ধন যেন অটুট থাকে আজীবন। তোমরা যেন ভুলে না যাও এই স্কুলের স্মৃতিময় দিনগুলি। প্রিয় শিক্ষকদের আন্তরিক সাহচর্য ও অমূল্য অবদানের কথা তোমাদের মনে থাকুক অমলিন। বিষণ্ন নয়নে আজ শুধু বলি- 'যেতে নাহি দিব হায়,তবু চলে যেতে হয়, তবু চলে যায়।'

হে আলোর পথের যাত্রীরা,

নবজীবনের আহ্বানে, আলোকিত জীবনের সন্ধানে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ নবদিগন্তের দিকে। মনে রেখো, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। জাতি আজ প্রত্যাশা করে দুঃখ, দারিদ্র্য, অন্ধকার ঘুচিয়ে তোমরা গড়ে তুলবে একটি সুখী, সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ। তোমরাই আনবে সোনালি ঊষার আলোকিত দিন।

তোমাদের নতুন যাত্রাপথ নতুন নতুন সাফল্যে ভরে উঠুক।

তারিখ : ২৩/২/২০০৮
চট্টগ্রাম।

তোমাদের প্রীতিস্নিগ্ধ
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল, চট্টগ্রাম।

২. প্রধান শিক্ষকের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে বিদায় অভিনন্দনপত্র।

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের মাননীয় প্রধান শিক্ষক
শ্রদ্ধেয় জাকির হোসেন সাহেবের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মহান শিক্ষাব্রতী,

আমাদের সশ্রদ্ধ চিত্তের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজ আমাদের হৃদয় ব্যথিত। এক আলোকময় দিনে অফুরন্ত কর্মোদ্দীপনা নিয়ে আপনি এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর সুদীর্ঘকাল আপনি কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রীতিস্নিগ্ধ ভালোবাসা দিয়ে আমাদের অন্তর জয় করেছিলেন। অজস্র ছাত্র পরশপাথরের মতো আপনার হাতের ছোঁয়ায় পেয়েছে আলোকিত জীবন। ছাত্রদের সঙ্গে আপনার প্রীতিময় বন্ধন ছিন্ন হতে চলেছে। আপনি অবসরগ্রহণ করছেন। আজ আপনার বিদায়ের কথা ভেবে আমরা বেদনা-ভারাক্রান্ত। আজ বিদায়বেলায় আপনাকে জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

হে কর্মবীর,

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে আপনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের এক আদর্শ প্রতীক। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সমৃদ্ধিতে আপনি রেখেছেন অনন্য অবদান। স্কুলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষাসফর, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আপনাকে পেয়েছি সুদক্ষ দিক-নির্দেশক ও অভিভাবক হিসেবে। একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং আদর্শ কর্মবীর হিসেবে আপনার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

হে বিদায়ী শিক্ষাগুরু,

আজ আপনাকে বিদায় দিতে কী যেন হারানোর বেদনায় হৃদয় ভেঙে কান্না আসছে। অনেক সুখকর স্মৃতি উথলে উঠছে মনে। বিদায়মুহূর্তে আশা করব, আপনি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো ক্ষমা করবেন। সময়ের বাস্তবতায় আপনি

এই স্কুল থেকে বিদায় নিলেও আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় থাকবেন চিরদিন অম্লান।

প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘায়ু হোন। আপনার দিনগুলি সুস্থ, সুন্দরভাবে কাটুক, এ আমাদের আন্তরিক কামনা।

আপনার স্নেহধন্য
ছাত্রবৃন্দ
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী।

তারিখ : ৯.২.২০০৮
রাজশাহী।

৩. নতুন প্রধান শিক্ষকের আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা জানিয়ে মানপত্র।

সাটুরিয়া পাইলট গার্লস হাইস্কুলের নবাগত প্রধান শিক্ষক জনাব কামাল হোসেনের যোগদান উপলক্ষে

শ্রদ্ধা-অভিনন্দন

হে নবাগত শিক্ষাগুরু,

আপনার শুভাগমনে শতাব্দী প্রাচীন পাইলট গার্লস স্কুলটি আজ আনন্দে উদ্বেলিত। ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাঙ্গনে আপনার মতো একজন গুণী পন্ডিতের পদার্পণে আমরা ধন্য, গৌরবান্বিত। আপনি আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে মহান শিক্ষাবিদ,

আপনার আলোকশিখা সবার অন্তরে জ্বালাবে জ্ঞানের প্রদীপ। সেই আলোয় আলোকিত হব আমরা, হবে সমাজ ও দেশ। সাটুরিয়া পাইলট গার্লস হাইস্কুলের আজকের সুনামকে ধরে রাখতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি করতে আপনার মতো সৎ, একনিষ্ঠ ও যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। আলোকিত সমাজ নির্মাণে আপনার অবদান যেন চিরস্মরণীয় থাকে, এটা আমাদের একান্ত কামনা। আপনার প্রেরণা ও কর্মচাঞ্চল্য নতুন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে দেবে আমাদের আঙিনা।

হে মহান,

আমরা আশাবাদী, আপনার যোগ্য নেতৃত্বে নতুন মাত্রা পাবে আমাদের পথ চলা। স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ হবে আরো উন্নত। আপনার স্নেহচ্ছায়া জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হব আমরা। অবক্ষয়-জীর্ণ সমাজ হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল। বুকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমরা আজ আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনার চলার পথ হোক কুসুমকোমল।

তারিখ : ৩০.৮.২০০৮
মানিকগঞ্জ।

শ্রদ্ধাবনত
আলোকপ্রত্যাশী ছাত্রীবৃন্দ
সাটুরিয়া পাইলট গার্লস হাইস্কুল
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।

৪. খ্যাতিমান কবি বা সাহিত্যিকের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র।

রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নন্দিত কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবালের আগমনে

হৃদয়োষ্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে বরেণ্য অতিথি,

পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত রাজশাহী আজ আপনার পদধূলিতে ধন্য। রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার শুভাগমনে আমরা আনন্দিত, গৌরবান্বিত। আপনার সাহচর্য পেয়ে আমরা উৎসাহিত, উজ্জীবিত। আপনি আমাদের প্রাণঢালা উষ্ণ-হৃদয় শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

হে নন্দিত কথাশিল্পী,

বাংলাদেশের সমকালীন কথাসাহিত্যে আপনার অবদান অনন্য। সায়েন্স ফিকশন ও কিশোরজীবন রূপায়ণে আপনার শৈল্পিক দক্ষতা বিস্ময়কর ও চূড়াস্পর্শী। কথাশিল্পী হিসেবে আপনার উন্নত জীবনবোধ, শৈল্পিক চৈতন্য পাঠকদের মুগ্ধ করে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আপনার রয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা। আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা মুগ্ধ, অভিভূত।

হে বিজ্ঞানসাধক শিক্ষাবিদ,

এই স্কুলে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সৃজনশীল সাহিত্যসাধনার পাশাপাশি কম্পিউটার, গণিত ও বিজ্ঞানশিক্ষায় আপনার অবদান অসামান্য। নতুন প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আপনার লেখা আমৃত্যু সচল থাকুক। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। বাংলাদেশের সাহিত্যের আকাশে আপনার সাহিত্যকর্ম চির উজ্জ্বল দীপ্তি পাক, এই আমাদের একান্ত কামনা।

ইতি
আপনার গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
রাজশাহী।

তারিখ : ১২ই ডিসেম্বর ২০০৮
রাজশাহী

ঙ. বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িকপত্র

১. ভি পি পি করে বই পাঠানোর জন্য পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট পত্র।

তারিখ : ১৫.২.২০০৮
কর্মাধ্যক্ষ
সাহিত্য প্রকাশ
প্রিতম ভবন,
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

জনাব,
সালাম নেবেন। নিম্নলিখিত বইগুলো অনুগ্রহপূর্বক অতিসত্বর নিম্ন ঠিকানায় ভিপিপি যোগে পাঠালে বিশেষভাবে উপকৃত হব। বই প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য প্রেরণের নিশ্চয়তা রইল।
অনুগ্রহ করে অতিশীঘ্র বইগুলো পাঠানোর জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত

সাইফ উদ্দিন রুবেল
নবম শ্রেণী (বিজ্ঞান), রোল-৩
দিনাজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
দিনাজপুর।

বইয়ের তালিকা:
১. শিশু বিশ্বকোষ (৫ খণ্ড), শিশু একাডেমী, ঢাকা।
২. নজরুল রচনাবলি (৪ খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ডাক টিকিট

প্রেরক
....
....
....

প্রাপক
....
....
....

২. মালামাল রপ্তানির জন্য অন্য কোনো দেশের কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের পত্র।

তারিখ : ২৭.৫.২০০৮
কর্মাধ্যক্ষ
সিগনেট প্রেস
২৫/৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭৩, ভারত।

মহাত্মন,
শুভেচ্ছাসহ জানাচ্ছি যে, 'বই প্রকাশনী' ৩৮/এ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন গ্রন্থ আপনার কোম্পানির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গো ব্যবসাভিত্তিক প্রসারে আগ্রহী।

আপনার অনুমতি পেলে আমি গ্রন্থতালিকা ও নিয়মাবলি পাঠাব। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে দ্রুত পত্র লিখুন।

শুভেচ্ছাসহ

প্রধান ব্যবস্থাপক
বই প্রকাশনী
৩৮/এ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

ডাক টিকিট

প্রেরক
....
....
....

প্রাপক
....
....
....

চ. আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণপত্র

সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নানা প্রয়োজনে আমাদেরকে আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ বা সমাবেশের আয়োজন করতে হয়। বিয়ে, জন্মদিন, দিবস উদ্‌যাপন, সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া উপলক্ষে নির্ধারিত কর্মসূচির আলোকে যে পত্র লেখা হয় তাকে আমন্ত্রণপত্র বা নিমন্ত্রণপত্র বলে। সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই তা ছাপিয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠ লোকজনের মাঝে বিলি করতে হয়।

আমন্ত্রণপত্র বা নিমন্ত্রণপত্র বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমনঃ বিয়ে, জন্মদিন, কুলখানি, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, বার্ষিক ক্রীড়া, পহেলা বৈশাখ, বর্ষবরণ, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, শিক্ষাসপ্তাহ, বইমেলা, শোকসভা, নাগরিক সংবর্ধনা, সুবর্ণজয়ন্তী, নাট্য-উৎসব, লোক-উৎসব, সাংস্কৃতিক-উৎসব ইত্যাদি নানা উপলক্ষে।

নিমন্ত্রণপত্র রচনার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য নিমন্ত্রণ প্রযোজ্য বলে সাধারণত এ ধরনের পত্রের শীর্ষে ধর্মীয় বা মঙ্গলসূচক কথা ব্যবহৃত হয় না। তবে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের পত্রশীর্ষে কেউ কেউ মুসলমান রীতিতে 'পরম করুণাময়ের নামে' এবং হিন্দুরীতিতে 'শ্রী শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ' লিখে থাকেন। পত্রশীর্ষে অনুষ্ঠানের শিরোনামও থাকতে পারে। যেমন : 'স্বাধীনতা দিবস', 'লোকমেলা ২০০৮' ইত্যাদি।

নিমন্ত্রণপত্রের বিভিন্ন অংশঃ

১. **সম্ভাষণ** : নিমন্ত্রণপত্রে প্রাপককে সম্বোধন করার জন্য বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : সুধী, সৌম্য, জনাব, মহাশয়, মহোদয়, মান্যবর, সুহৃদ, সুজন ইত্যাদি।

২. **মূল পত্রাংশ** : এ ধরনের পত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিমন্ত্রণপত্রের মূল বিষয়বস্তু নির্ভর করে অনুষ্ঠানের প্রকৃতির ওপর। যে উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেই উপলক্ষ, স্থান, তারিখ, সময় ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হয়। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও আলোচকের নাম উল্লেখ থাকে। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে বর-কনের পরিচিতিও আজকাল উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের পত্রের ভাষা সহজ সরল সাবলীল ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। বক্তব্যের মধ্যে বিনম্রভাবও থাকা চাই।

৩. **ইতি বা সমাপ্ত** : এ ধরনের পত্রে একসময় 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের জন্য ত্রুটি মার্জনীয়', 'নিবেদন ইতি'—এসব লেখার প্রচলন ছিল। এখন 'বিনয় আরজ', 'নিবেদক' ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে।

৪. **নাম-স্বাক্ষরে সৌজন্য:** চিঠির বিষয় অনুসারে এ ধরনের পত্রে 'বিনীত' 'বিনয়াবনত', 'শ্রদ্ধাবনত', 'ভবদীয়' ইত্যাদি ডানদিকে লিখে তার নিচে আমন্ত্রণকারীর নাম লিখতে হয়। কেউ কেউ সৌজন্য শব্দ ও স্বাক্ষর বামদিকেও লিখে থাকেন।

৫. **ঠিকানা ও তারিখ** : নিমন্ত্রণপত্রের বামদিকে তারিখ এবং ডানদিকে আমন্ত্রণকারীর নামের নিচে ঠিকানা লেখাই প্রচলিত নিয়ম। অধুনা সৌজন্য শব্দ, আমন্ত্রণকারীর নাম, ঠিকানা ও তারিখ বামদিকে লেখার প্রবণতাও লক্ষ করা যাচ্ছে।

৬. **অনুষ্ঠানসূচি** : কোনো কোনো অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে আলাদাভাবে অনুষ্ঠানসূচি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এর ফলে আমন্ত্রিত ব্যক্তি অনুষ্ঠানের প্রকৃতি, ব্যাপ্তিকাল ইত্যাদি সম্পর্কে আগেভাগেই ধারণা করে নিতে পারেন।

৭. **পত্র-প্রাপকের ঠিকানা** : এ ধরনের পত্রের খামের ওপর আলাদাভাবে পত্র-প্রাপকের নাম-ঠিকানা লিখতে হয়। নাম-ঠিকানা ভুল থাকলে তা প্রাপকের হাতে নাও পৌঁছাতে পারে।

নিমন্ত্রণপত্রের বিভিন্ন অংশ :

পত্রশীর্ষ	**বিজয় উৎসব ও লোকমেলা ২০০৮**
সম্ভাষণ	সৌম্য,
মূল পত্রাংশ	এ বছর মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩৭তম বর্ষপূর্তি হচ্ছে। গৌরবের এই হিরন্ময় লগ্নে আমরা শেকড়ের সন্ধানে সম্মিলিত হতে চাই। মূল্যায়ন করতে চাই আমাদের অর্জন। নির্ধারণ করতে চাই উজ্জ্বলতর আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পথ। এ উপলক্ষে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর জাতীয় শহীদ মিনারে আয়োজন করা হয়েছে দিনব্যাপী বিজয় উৎসব ও লোকমেলা। এ অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য গুণীজনরা যোগ দেবেন। এ আয়োজনকে সার্থক করার জন্য আপনার সবান্ধব অংশগ্রহণ প্রার্থনা করি।
নাম- স্বাক্ষরে সৌজন্য	বিনীত-
নাম- স্বাক্ষর	**রাশেদুল হাসান** আহ্বায়ক
ঠিকানা	বিজয় উৎসব ও লোকমেলা উদ্‌যাপন পরিষদ ২০০৮ ঢাকা।
তারিখ :	৭- ১২- ২০০৮

অনুষ্ঠানসূচি

১৬ই ডিসেম্বর ২০০৮ মঙ্গলবার

বিকেল ৪টা : উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
উদ্বোধক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান
প্রধান অতিথি : মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি
সন্ধ্যা ৭টা : গণসংগীত ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পীদের গান
রাত ৮টা : দেশাত্মবোধক গান
রাত ৯টা : মুক্তিযুদ্ধের নাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। রচনা : সৈয়দ শামসুল হক। পরিচালনা : আবদুল্লাহ আল মামুন।

১. নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র।

সুধী,
আগামী ২৫শে মে ২০০৮, **১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫** রবিবার বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। এ উপলক্ষে ঐ দিন সকাল দশটায় ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল মিলনায়তনে এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

১২ই মে ২০০৮
বেলি রোড, ঢাকা।

বিনীত-
ভিকারুন্নেসা নূন স্কুলের
ছাত্রীদের পক্ষে,
শ্যামলী সুলতানা
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

অনুষ্ঠানসূচি

১. সকাল ১০টা : অতিথিদের আসনগ্রহণ
২. সকাল ১০.১৫ মি. : আলোচনা সভা
মুখ্য আলোচক: নজরুল গবেষক ড. করুণাময় গোস্বামী
৩. সকাল ১১টা : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৪. সকাল ১২.৩০মি. : সমাপ্তি।

২. স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র।

সৌম্য,
আসছে ২৬শে মার্চ ২০০৮ বুধবার মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমাদের স্কুলে এক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। এই মহতী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম বীরপ্রতীককে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান। এ ছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে আপনি আমন্ত্রিত

তারিখ : ১৬ই মার্চ ২০০৮
ঢাকা।

বিনীত-
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের
ছাত্রদের পক্ষে,
তারেক মাসুদ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

অনুষ্ঠানসূচি :

ভোর ৫ টা ০১ মিনিটে : স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ
সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটে : র‌্যালি
সকাল ১০ টায় : সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা
সকাল ১১ টায় : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সকাল ১২ টা ৩০ মিনিটে : সমাপ্তি।

৫. অনুবাদ

অনুবাদ বলতে বোঝায় ভাষান্তর। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর বা পুনর্বিবৃতি। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের প্রধান উপায় হচ্ছে অনুবাদ। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেসবের পরিচয় পেতে হলে সেসব ভাষা থেকে সেগুলি নিজের ভাষায় অনুবাদ করে নিতে হয়। বিশ্বের প্রায় সব তথ্য ও জ্ঞান ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে দুটো ভাষাতেই যথেষ্ট পারদর্শিতা থাকা দরকার। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য ও জ্ঞানের বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পড়ার অভ্যাস করলে এ ধরনের দক্ষতা গড়ে ওঠে।

অনুবাদের ধরন

অনুবাদ প্রধানত দু-ধরনের : ক. আক্ষরিক অনুবাদ, খ. ভাবানুবাদ।

ক. আক্ষরিক অনুবাদ

এক ভাষার শব্দের বদলে অন্য ভাষার শব্দ বসিয়ে অনুবাদ করাকে বলা হয় আক্ষরিক অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ মূলানুগ হয়ে থাকে। এ ধরনের অনুবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই কৃত্রিম হয়। আক্ষরিক অনুবাদে ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য থাকে না বললেই চলে। যেমন : 'There was no reply' -এর আক্ষরিক অনুবাদ: 'সেখানে কোনো উত্তর ছিল না।' এ জাতীয় অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হয় না। গ্রহণযোগ্য অনুবাদ হচ্ছে : 'কোনো উত্তর এল না।'

সাবলীল হয় না বলে সাধারণত আক্ষরিক অনুবাদ পরিহার করা হয়। তবে দলিল-দস্তাবেজ, বিজ্ঞান ও আইনের বিষয়ের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক হয়ে থাকে।

খ. ভাবানুবাদ

মূলের অর্থ ঠিক রেখে নিজের ভাষার রীতি অনুযায়ী স্বাধীন অনুবাদকে বলা হয় ভাবানুবাদ। এ ধরনের অনুবাদ মূলানুগ হয় না, কিন্তু প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। আক্ষরিক অনুবাদ রস উপলব্ধির পক্ষে বাধা হয় বলে সাহিত্যের অনুবাদ সাধারণত ভাবানুবাদ হয়ে থাকে।

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের কৌশল

অনুবাদ মানে এক ভাষার শব্দের বদলে অন্য ভাষার শব্দ সাজানো নয়। বরং মূল ভাব বা বক্তব্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করা। তাই ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের সময় নিচের কয়েকটি প্রধান দিকের প্রতি লক্ষ রাখা দরকার :

১. অনুবাদ করার সময় নির্ধারিত অংশটুকু মন দিয়ে বারবার পড়ে মূল কথা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
২. দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশের অর্থ জানা না থাকলে বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্ভাব্য কাছাকাছি বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অনুবাদ সম্ভব না হলে দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশটুকু হুবহু বাংলা বাক্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. ইংরেজি অনেক শব্দের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ করা ছাড়া উপায় থাকে না।
৪. মূলের বাচ্য ও ক্রিয়ার কাল অনুবাদে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
৫. মূল বাক্য জটিল বা যৌগিক বাক্য হলে বাংলা অনুবাদের সুবিধার জন্য তা একাধিক বাক্যে ভেঙে অনুবাদ করা ভালো। যেমন :

মূল বাক্য : I know the man who died yesterday is the father of my friend Shabuj.

আড়ষ্ট অনুবাদ : আমি ঐ লোকটাকে জানি যে গতকাল মারা গেছে সে আমার বন্ধু সবুজের পিতা।

সাবলীল অনুবাদ : গতকাল যিনি মারা গেছেন তাঁকে আমি চিনি। তিনি আমার বন্ধু সবুজের বাবা।

৬. মূলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি অনুবাদে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৭. ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য শব্দের অনুবাদ হয় না। এ ধরনের শব্দ বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ করতে হয়। অর্থাৎ উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলায় লিখতে হয়। যেমন : Shakespeare—শেকসপিয়র, Newton—নিউটন, London—লন্ডন।

৮. মূলে পরিভাষা থাকলে অনুবাদে সুপ্রচলিত বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত। বাংলা পরিভাষা অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য হলে মূল পরিভাষার বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ করতে হয়। যেমন :

পারিভাষিক শব্দের ভাষান্তর :	Physics—পদার্থবিদ্যা, Adjective—বিশেষণ, Court—আদালত।
পারিভাষিক শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ :	Television—টেলিভিশন, Computer—কম্পিউটার, Station—স্টেশন।

৯. মূল পাঠে ব্যবহৃত শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে অনুবাদে অধিকতর গ্রহণযোগ্য শব্দ বেছে নিতে হয়। যেমন :

Telephone line—টেলিফোনের লাইন/ তার
A fishing line—মাছ ধরার সুতো
Parallel lines—সমান্তরাল রেখা
A bus line—বাস চলাচল ব্যবস্থা
The family line—বংশপরম্পরা।

১০. বাংলা অনুবাদে যেন সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়।

১১. বাংলা অনুবাদের ভাষা যেন কৃত্রিম বা আড়ষ্ট না হয়। বাংলা ভাষার মাধুর্য, সরলতা, স্পষ্টতা, সাবলীলতা ইত্যাদি যেন বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত।

১২. বাংলা ছাঁদের বাক্যরীতি ও ইংরেজি ছাঁদের বাক্যরীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তাই অনুবাদ করার সময় ইংরেজি রীতির বাক্যকে বাংলা রীতিতে বদলে নেওয়া ভালো। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে:

ক. ইংরেজিতে কর্তার পর ক্রিয়া ও শেষে কর্ম বসে। পক্ষান্তরে বাংলায় কর্তার পরে কর্ম ও শেষে ক্রিয়া বসে। যেমন :

He played football yesterday.	[কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম (+অন্য পদ)]
সে গতকাল ফুটবল খেলেছিল।	[কর্তা (+অন্য পদ)+ কর্ম + ক্রিয়া]

খ. ইংরেজিতে verb ব্যবহার করতেই হয়। বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যেমন :
The door is open.—দরজাটা খোলা [ক্রিয়াপদ উহ্য]

গ. ইংরেজি বাক্যে a, an, the থাকলে অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় সেগুলির অনুবাদ হয় না। যেমন :
Honesty is a noble virtue.—সততা মহৎ গুণ।
He knows a lot about the earth, the sun and the moon.—
তিনি পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন।

ঘ. ইংরেজি বাক্যে অনেক ক্ষেত্রে it, there, may ইত্যাদি বিশেষ রীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এগুলো বাদ দিতে হয়। যেমন :
There is a school in our village.— আমাদের গ্রামে একটি স্কুল আছে।

ঙ. ইংরেজি বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন অনুবাদের সময় লাগসই বাংলা বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করা উচিত। যেমন :
As you sow so you reap.—যেমন কর্ম তেমন ফল।
He has gone to dogs.—সে গোল্লায় গেছে।

চ. ইংরেজি ও বাংলা প্রশ্নবাক্যের পদক্রম আলাদা। বাংলা অনুবাদে বাংলা রীতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন :
Are you ill ? [ক্রিয়া/সহায়ক ক্রিয়া + কর্তা + ...]
আপনি কি অসুস্থ? [কর্তা + প্রশ্নসূচক অব্যয় + ...]

নমুনা অনুবাদ

১

I continue my letter. It is night, everybody is asleep. I am sitting up late writing to you, before the window. The garden is full of fragrance. The air is warm.

বঙ্গানুবাদ : আমি চিঠি লিখছি। এখন রাত, সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। রাত জেগে জানালার পাশে বসে তোমার কাছে লিখছি। বাগান সুগন্ধে ভরপুর। বাতাসে উষ্ণতা।

২

I am fond of collecting foreign stamps. I have chosen it because it is both interesting and instructive. As one goes on collecting, he comes in direct touch with geographical, historical and social conditions of various countries. The pictures of various things of interest, rare animals, beautiful sights all these are thought provoking.

বঙ্গানুবাদ : আমার শখ বিদেশি ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। আমি এটা বেছে নিয়েছি কারণ এটা যেমন মজার তেমনি শিক্ষামূলক। এটা সংগ্রহের ভেতর দিয়েই বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। কৌতূহলজনক বিভিন্ন জিনিস, দুর্লভ প্রাণী, সুন্দর জায়গার ছবি— সবই চিন্তাকে উসকে দেয়।

৩

Here is my mother. There is none else like my mother. How affectionate she is to me! She always takes care of me. If I fall ill, mother grows very anxious.

বঙ্গানুবাদ : এই আমার মা। আমার মায়ের মতো আর কেউ নেই। আমার প্রতি তিনি কত না স্নেহশীল! তিনি সদাই আমার যত্ন নেন। আমি অসুস্থ হলে মা বড়ই উদ্বিগ্ন হন।

৪

Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. So, everyone should give up smoking.

বঙ্গানুবাদ : ধূমপান খুব ক্ষতিকর। সেইসঙ্গে ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যাঁরা ধূমপান করেন তারা বেশিদিন বাঁচতে পারেন না। তাই প্রত্যেকেরই উচিত ধূমপান ত্যাগ করা ।

৫

Cleanliness is a virtue. It is the habit of keeping the body and all other things free from dirts. Without a clean body one can not have a pure mind. Cleanliness keeps health sound. It is also a mark of politeness. Good health keeps mind sound.

বঙ্গানুবাদ : পরিচ্ছন্নতা একটি গুণ। শরীর ও অন্য সবকিছু ময়লামুক্ত রাখার একটি অভ্যাস এটি। বিশুদ্ধ মনের জন্য চাই পরিচ্ছন্ন দেহ। পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষা করে। এটা বিনয়েরও লক্ষণ। ভালো স্বাস্থ্য মনকে প্রফুল্ল রাখে।

৬

Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all

through our life. "Everything at right time" should be our motto.

বঙ্গানুবাদ : সময়ানুবর্তিতার চর্চা করে একে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এই গুণ অর্জন করতে হয়। শৈশব হচ্ছে বীজ বপনের সময়। এ সময়ে গড়ে ওঠা অভ্যাসই আমাদের মধ্যে সারা জীবনে বজায় থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'যথাসময়ে যথা কাজ।'

৭

Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlessness. An honest man passes his days in respect and happiness. Honesty is the best policy.

বঙ্গানুবাদ : সততা মহৎ গুণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের গোপন রহস্য হল সততা। সততার মূল্য খুবই বেশি। সততা দিয়ে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও নির্ভীকতা জয় করা যায়। সৎ ব্যক্তি সুখে ও মর্যাদায় দিন অতিবাহিত করে। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

৮

In this life there are no gains without pains. Life indeed, would be dull if there were no difficulties. Games lose their interest, if there is no struggle and if the result is a forgone conclusion. Both winner and loser enjoy a game most if it is closely contested to the last.

বঙ্গানুবাদ : কষ্ট ছাড়া এ জীবনে কিছুই অর্জিত হয় না। বস্তুত, বাধা-বিঘ্ন না থাকলে জীবন হয়ে পড়ত নিরানন্দ। খেলায় যদি প্রতিযোগিতা না থাকে আর তার ফলাফল পূর্বনির্ধারিত হয়, তবে সে খেলা তার মজা হারিয়ে ফেলে। খেলায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হলে বিজয়ী এবং বিজিত উভয়েই তা দারুণ উপভোগ করে।

৯

Students have youth and energy. They are filled with high ideals. They are free from the responsibility of maintaining families. So, it is easy for them to devote themselves to social service.

বঙ্গানুবাদ : ছাত্রদের আছে তারুণ্য ও শক্তি। তারা উচ্চ আদর্শে ভরপুর। পরিবার চালানোর দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। কাজেই, সমাজসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করা তাদের পক্ষে সহজ।

১০

Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but the collection of moments. So we must not spend a single moment in vein. To kill time is to shorten life. Time and tide wait for none.

অনুবাদ : আমাদের জীবন সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আমাদের অনেক কিছু করার থাকে। মানবজীবন কিছু মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র। তাই এক মুহূর্তও আমাদের অকারণে নষ্ট করা উচিত নয়। সময় নষ্ট করার অর্থ জীবনকে সংক্ষিপ্ত করা। সময় ও জোয়ার-ভাটা কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

১১

When Crusoe woke up next morning the sea was quiet and the sky was clear and blue. The ship lay less than half a mile from the shore. He wished he could reached the ship's side as he had no food and no clothing with him; so he swam out to it and got into the ship's cabin through a hole in the side.

অনুবাদ : পরদিন সকালে যখন ক্রুসোর ঘুম ভাঙল তখন সমুদ্র শান্ত, আকাশ নীল এবং মেঘমুক্ত। জাহাজ তটভূমির আধ মাইলেরও কম দূরে রয়েছে। সে জাহাজের কাছে যেতে চাইল। কারণ খাবার বা পোশাক কিছুই তার কাছে ছিল না। সে সাঁতার দিয়ে জাহাজের পাশের একটি গর্তের মধ্য দিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল।

১২

One of the most famous of the early travellers of the world was Marco Polo. He was born in Venice in 1254. A.D. When Marco was a boy of fifteen his father decided to go to China. Marco was not very strong and was too dedicate to go on such a long journey. But he was brave and persuaded his father to take him with him.

অনুবাদ : সেকালে পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্কো পোলো। তিনি ভেনিস শহরে ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মার্কোর বয়স যখন পনেরো, সেই সময় তাঁর পিতা চীন দেশে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। মার্কোর স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না। এই দীর্ঘ ভ্রমণের পক্ষে তা ছিল একেবারেই অনুপযোগী। কিন্তু তিনি ছিলেন সাহসী। তিনি পিতাকে তাঁর সহযাত্রী করে নেবার জন্য সম্মত করালেন।

১৩

Hercules was a great hero. He was once going on his way to an unknown place, when he saw a giant. The giant was even taller than a mountain and was holding the sky on his head. He asked Hercules, 'Who are you and what do you want?' The hero said, 'I am Hercules and am going to the garden of Golden Apples'.

অনুবাদ : হারকিউলিস ছিলেন একজন মস্ত বীর। একবার এক অচেনা জায়গায় যাওয়ার পথে তিনি এক দৈত্যকে দেখতে পেলেন। দৈত্যটি ছিল পাহাড়ের চেয়েও লম্বা, সে তার মাথায় করে আকাশ ধরে রেখেছিল। সে হারকিউলিসকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? কী চাও?' সেই বীর বলল, 'আমি হারকিউলিস। আমি সোনালি আপেলের বাগানে যেতে চাই।'

১৪

Books introduce us with the best society; they bring us into the presence of the greatest minds that have ever lived. We have what they said and did. We see them as if they were really alive. We became participators in their thoughts. We sympathies with them.

অনুবাদ : গ্রন্থের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম সমাজের পরিচয় পাই। গ্রন্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ মননশীল ব্যক্তিদের অস্তিত্বের কাছে নিয়ে আসে। আমরা তাদের কথা ও কাজের সম্বন্ধে জ্ঞাত হই। আমরা দেখি, যেন তারা সত্যিই জীবিত। আমরা তাদের চিন্তাধারার অংশগ্রহণকারী হয়ে পড়ি। তাদের সঙ্গে আমরা সমব্যথী হয়ে যাই।

১৫

Patriotism is love for one's country. It is powerful sentiment and wholly unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. It is idealism that gives courage and strength. But false patriotism makes a man narrow-minded and selfish.

অনুবাদ : নিজের দেশকে ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম। এটি এক প্রবল ভাবাবেগ, যা স্বার্থহীন ও মহৎ। স্বদেশের কল্যাণ কামনায় একজন দেশপ্রেমিক নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। এটি একটি আদর্শ, যা দেয় সাহস ও শক্তি। কিন্তু মেকি স্বদেশপ্রেম মানুষকে সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর করে তোলে।

১৬

Honesty is a great Virtue. If you do not deceive others, if you do not tell a lie, if you are strictly just and fair in your dealing with others, you are an honest man. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. No one can prosper in life if he is not honest.

অনুবাদ : সততা মহৎ গুণ। যদি অপরকে প্রতারণা না কর, মিথ্যা না বল, অন্যের সঙ্গে যথার্থ ও ন্যায়সংগত আচরণ কর, তবে তুমি সৎ ব্যক্তি। সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সৎ ব্যক্তিকে সকলেই সম্মান করে। সততা ব্যতীত কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

১৭

Wealth is no doubt necessary for happiness in life. But it has a tendency to be concentrated in the hands of few. The result is the rich becomes richer and the poor poorer. This is certainly a misuse of wealth. It should be fairly distributed among all so that it may bring happiness to the greatest number of people in the society.

অনুবাদ : জীবনে সুখের জন্য নিঃসন্দেহে ধনসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু এই ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। এর ফলে ধনী হয়ে ওঠে আরও ধনী, আর দরিদ্র হয়ে ওঠে আরও দরিদ্র। এটা অবশ্যই ধনের অপব্যবহার। সমাজের বৃহত্তম অংশের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য ধনসম্পদের ন্যায্য বণ্টন প্রয়োজন।

১৮

We are living in an age of science. Science has discovered and invented many things. We use them in our daily life for our comfort and convenience. Electricity is one of the greatest and most important gift of science to man. Electricity has almost changed the mode of our life.

অনুবাদ : আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক জিনিস আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে সেগুলি সুখ-সুবিধার জন্য ব্যবহার করছি। বিদ্যুৎ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ উপহার। বিদ্যুৎ আমাদের জীবনধারাকে অনেকখানি বদলে দিয়েছে।

১৯

Student life is the stage of preparation for future. This is the most important period of life. A student is young today. But he will be a man tomorrow. He has different duties. He should perform them all. As a student, his first duty is to study and learn. He should be careful to his lessons.

অনুবাদ : ছাত্রজীবন ভবিষ্যতের প্রস্তুতিপর্ব। এ সময়টি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আজ যে ছাত্র তরুণ, আগামী দিনে সেই হয়ে উঠবে পরিণত মানুষ। তার নানা কর্তব্য আছে। সেগুলি তাকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। ছাত্রজীবনে তার প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ। পড়াশুনায় তার যত্নশীল হওয়া উচিত।

২০

Computer is the new miracle of science. It can make thousand of calculations in a moment. It can store in its memory millions of facts and figures. It can also recall them at ease. In our country the use of computer is growing rapidly. Now a day computers are used in banks, shops, airlines, offices, libraries, everywhere. It seems that computer is going to dominate the future civilization of man.

অনুবাদ : কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক নতুন বিস্ময়। তা মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার হিসেব কষতে পারে, লক্ষ লক্ষ তথ্য ও সংখ্যা স্মৃতিপটে ধরে রাখতে পারে এবং অনায়াসেই তা স্মরণ করতে পারে। আমাদের দেশে কম্পিউটারের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ব্যাংক, দোকান, বিমান, অফিস, গ্রন্থাগার সর্বত্র কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে হয়, ভবিষ্যতের মানবসভ্যতায় কম্পিউটারের ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করতে চলেছে।

২১

Who wrote the song 'Happy birthday to you'? Two sisters, Mildred and Pattyhill, wrote a song called 'Good morning to you' in 1893. No one paid much attention to it until someone at a party changed the words to the one we know today. Now it's sung all over the world all through the years.

অনুবাদ : 'শুভ হোক তোমার জন্মদিন'—এ গানটি কে লিখেছিলেন? ১৮৯৩ সালে মিলড্রেড ও প্যাট্টিহিল নামে দুই বোন 'তোমাকে জানাই সুপ্রভাত' নামে একটি গান রচনা করেছিল। কেউ-একজন এক পার্টিতে গানের কথাগুলিকে বদলে অধুনা-পরিচিত কথার রূপ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের এ গানকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। বর্তমানে গোটা বিশ্ব জুড়ে সারাবছর গানটি গাওয়া হয়।

22

It is very easy to acquire bad habits, such as eating too many sweets or too much food or drinking too much liquid of any kind, or smoking. The more we do a thing, the more we tend to like doing it, and if we do not continue to do it, we feel unhappy. This is called the force of habit, and the force of habit should be fought against.

অনুবাদ : বদ অভ্যাস আয়ত্ত করা খুব সহজ, যেমন অনেক অনেক মিষ্টি খাওয়া বা অনেক বেশি পরিমাণ খাওয়া কিংবা কোনোরকম তরল দ্রব্য বেশি পান করা বা ধূমপান করা। আমরা যতই কিছু-একটা করি ততই সেটা আরও বেশি করা পছন্দ করি। যদি তা করে যেতে না পারি তাহলে অসুখী বোধ করি। একে বলা হয় অভ্যাসের জোর। এই অভ্যাসের জোরের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত।

২৩

No man can not live alone. When we are children the family protects us. When we grow up, we need the help of all the people around us. If we try to live alone, our lives are no other than those of animals. Our father and mother, our teachers, our government, all these train us to do our duty.

অনুবাদ : মানুষ একা বাঁচতে পারে না। আমরা যখন শিশু, পরিবার আমাদেরকে রক্ষা করে। আমরা যখন বেড়ে উঠি, চারপাশের লোকজনের সাহায্য আমাদের দরকার হয়। যদি আমরা একাকী জীবনযাপনের চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের জীবন পশুর জীবনের চেয়ে আলাদা কিছু হবে না। পিতা-মাতা, শিকমন্ডলী, সরকার—সবাই আমাদের কর্তব্য পালনের শিক্ষা দেয়।

২৪

The life of a student is a life of preparation, preparation for the struggle of life. To make him well fitted for the struggle, education is necessary. Students of today will lead the nation tomorrow. But if their education is not completed, would they be able to lead the country to peace and prosperity?

অনুবাদ : ছাত্রজীবন জীবন-সংগ্রামের প্রস্তুতির সময়। সেই সংগ্রামের জন্য তাকে যথাযোগ্য করে তুলতে শিক্ষা দরকার। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু তাদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ না হলে তারা কি দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারবে?

২৫

He who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death.

অনুবাদ : যিনি তাঁর দেশকে ভালোবাসেন, তিনিই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকেরা দেশকে তাঁদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। সবাই তাঁদের সম্মান করে। এমনকি তাঁরা মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন।

২৬

The newspaper is a very useful thing. At present we find many newspapers in Bangladesh. Newspaper helps the progress of a nation. People are eager to know what is going on in the world. They can know this and that by reading the newspaper. It gives us all sorts of news of our own land as well as foreign lands.

অনুবাদ : খবরের কাগজ খুবই উপকারী। বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা অনেক খবরের কাগজ দেখতে পাই। খবরের কাগজ জাতির উন্নয়নে সহায়তা করে। পৃথিবী জুড়ে কী ঘটছে, মানুষ তা জানতে আগ্রহী। খবরের কাগজ পড়ে নানা বিষয়ে তারা জানতে পারে। এটা দেশের এবং দেশের বাইরের সব ধরনের খবর আমাদের দিয়ে থাকে।

২৭

A boy may be very bad at subjects like history, geography and even English. But he may be very clever with his hands; he may be able to make excellent models of aeroplane or of trains. If so, he might become a useful teacher at wood work, rather than an unhappy clerk in an office.

অনুবাদ : কোনো বালক ইতিহাস, ভূগোল এমনকি ইংরেজির মতো বিষয়ে ভালো নাও হতে পারে। কিন্তু সে বিভিন্নরকম হাতের কাজে দক্ষ হতে পারে; সে হয়তো উড়োজাহাজ কিংবা ট্রেনের চমৎকার মডেল তৈরিতে সক্ষম। যদি তাই হয় তবে তার জন্যে হয়তো অফিসের অসুখী কেরানি হওয়ার চেয়ে কাঠের কাজের শিক্ষক হওয়া ভালো।

২৮

The necessity of learning English cannot be ever-stated. English is an international language. It is essential in our day-to-day activities. We must know English in order to go in for any job. There is hardly any situation where the employees can do without English.

অনুবাদ : ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যায় না। ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলোতে এটি দরকারি। যে-কোনো চাকরির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। এমন জায়গা কমই আছে যেখানে কর্মচারীরা ইংরেজি ছাড়া চলতে পারে।

২৯

Education is the backbone of a nation. No progress can be possible without education. Ignorance is like darkness. So the light of education is necessary for society. Everybody will have to appreciate this truth. Students both boys and girls must be conscious of their responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.

অনুবাদ : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়। অজ্ঞতা অন্ধকারের সমতুল্য। সমাজের জন্য তাই শিক্ষার আলো দরকার। প্রত্যেককে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী উভয়কেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তা না হলে জাতি আশার আলো দেখতে সক্ষম হবে না।

৩০

We should bear the courage to say the right thing. We need not fear men nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest, God will be on our side, and with His help, we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and search its goal.

অনুবাদ : ঠিক কথা বলার সাহস আমাদের থাকা উচিত। মানুষকে ভয় পাবার কিংবা অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবে তা নিয়ে মাথাব্যথার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সৎ হলে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পাশে থাকবেন এবং তাঁর সহায়তায় আমরা দুর্বলদের অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হব। এভাবে আমরা জীবনে এগিয়ে যেতে এবং জীবনের লক্ষ্য অনুসন্ধানে সক্ষম হব।

৩১

We have duties to God, to state and to the society. God has created us and placed us on this beautiful earth. We are indebted to our society for the services it renders to us. Our society is like a machine of which we are the parts. We have to play our own part, otherwise the society will not prosper.

অনুবাদ : সৃষ্টিকর্তা, রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ সুন্দর পৃথিবীতে স্থান করে দিয়েছেন। সমাজ আমাদের যে সেবা দেয় সেজন্য আমরা সমাজের কাছে ঋণী। আমাদের সমাজ একটা যন্ত্রের মতো এবং আমরা এর অংশ। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। তা না হলে সমাজের উন্নতি হবে না।

৩২

In our country poverty is a great problem. But we do not understand that this plight is our own creation. Most people do not try to improve their condition with hard labour. They only express regret for their distress and blame their lot for it.

অনুবাদ : আমাদের দেশে দারিদ্র্য একটি বড় সমস্যা। কিন্তু এই অবস্থা যে আমাদেরই সৃষ্ট তা আমরা উপলব্ধি করি না। অধিকাংশ মানুষ কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে না। তাদের অসহায়ত্বের জন্য তারা শুধু আপসোসই করে এবং এ জন্য নিজেদের ভাগ্যকে দায়ী করে।

৩৩

Bangladesh exports jute to foreign countries. It brings much money to the country. That is why jute is called the 'golden fibre' of Bangladesh. It is a very useful thing.

অনুবাদ : বাংলাদেশ বিদেশে পাট রপ্তানি করে। তা দেশে প্রচুর অর্থ বয়ে আনে। এ জন্য পাটকে বাংলাদেশের 'সোনালি আঁশ' বলা হয়। এটি খুবই উপকারী দ্রব্য।

৩৪

Bangladesh is not a very big country. But it is one of the most densely populated countries in the world. More than one hundred and four million people live in this small country. Its population is still on the increase. If the present rate of increase continues uncontrolled, her population will be doubled within next twenty years.

অনুবাদ : বাংলাদেশ খুব বড় দেশ নয়। তবে এটি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর একটি। এই ছোট দেশটিতে চৌদ্দ কোটিরও বেশি লোক বাস করে। এর জনসংখ্যা এখনও ক্রমবর্ধমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে অব্যাহত থাকে তবে পরবর্তী বিশ বছরে এর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

৩৫

A newspaper is a store-house of knowledge. We can know the condition, manners and customs of other countries of the world from newspaper. It is in fact the summary of all current history. It supplies information to all classes of people. The businessman finds the condition of the world market about his goods through newspaper.

অনুবাদ : সংবাদপত্র হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা, আচার ও প্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। বস্তুত এটি হল চলমান ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত সার। সর্বশ্রেণীর লোকের কাছে এটি তথ্য সরবরাহ করে থাকে। ব্যবসায়ী তার পণ্য সম্পর্কে বিশ্ববাজারের অবস্থা জেনে নেয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

৩৬

A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable in him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each student.

অনুবাদ : একজন ভালো শিক্ষক যে-কোনো দেশেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। ভালো শিক্ষক পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সজাগ রাখেন। তিনি তাদের আত্মবিশ্বাসী এবং চালাক-চতুর করে তোলেন। প্রত্যেকের মাঝেই মূল্যবান কিছু থাকে। ভালো শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে নিহিত সম্পদকে আবিষ্কার করেন।

৩৭

Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships among these elements. When their relationships are disturbed, life becomes difficult and impossible. By keeping the environment safe man can ensure a healthier and happier life.

অনুবাদ : আমাদের সমগ্র পরিবেশ আমাদের জীবন এবং জীবন-পদ্ধতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো হল মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এসব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যখন এদের মধ্যকার সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়, তখন জীবন কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিবেশকে নিরাপদ রাখার মাধ্যমে মানুষ স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবন নিশ্চিত করতে পারে।

৩৮

A merchant who had three daughters was setting out upon a journey, but before he went, he asked each daughter what gift he should bring for her. The eldest wished for pearls, the second for jewels, but the third said, 'Dear father, bring me a rose'. Now it was no easy task to find rose being the middle of winter. Yet as she was the fairest daughter and very fond of flowers, her father said he would try what he could do.

অনুবাদ : ভ্রমণে যাবার প্রাক্কালে একজন বণিক তার তিন কন্যার কাছে জানতে চাইলেন কার জন্য কী আনবেন। বড়মেয়ে মুক্তা, মেজোমেয়ে জহরত আনতে বলল। কিন্তু তৃতীয় জন বলল, 'বাবা আমার জন্য একটি গোলাপ এনো।' এখন মধ্যশীতে গোলাপ পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। তবু তৃতীয় জন সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা এবং গোলাপপ্রেমী বলে তার বাবা তাকে বললেন যে, তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন।

৩৯

A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people.

অনুবাদ : যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করতে ও জীবন দিতে ইচ্ছুক তিনিই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈন্য তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৈনিকেরা এর চেয়ে বেশি কিছু করে থাকেন। দেশকে ভালোবাসেন বলেই তারা জীবনের ঝুঁকি নেন। তারা জনগণের সর্বোত্তম বন্ধু।

৪০

It is impossible to describe the beauty of the Taj Mahal in words. It has been called a 'dream in marble' and 'a tear drop on the forehead of time' but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj Mahal is best seen by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river.

অনুবাদ : তাজমহলের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এটাকে বলা হয়ে থাকে 'মার্বেল পাথরের মধ্যে স্বপ্ন' এবং 'কালের কপোলে এক ফোঁটা অশ্রু'; কিন্তু এ চমৎকার শব্দগুচ্ছও এ অনন্য শিল্প সৃষ্টির যথাযথ মর্যাদা নিরূপণে ব্যর্থ। জ্যোৎস্নারাতে যখন মার্বেল পাথরের চোখ-ধাঁধানো শুভ্রতা স্বপ্নময় কোমলতায় আবিষ্ট হয় তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে তাজমহল অবলোকন করা যায়। সম্ভবত সবচেয়ে চমৎকার শোভা দেখতে পাওয়া যায় নদীর বিপরীত তীরের প্রাসাদ থেকে।

অনুশীলনী

নিচের অনুচ্ছেদগুলি বাংলায় অনুবাদ কর :

1. A garden is not a source (উৎস) of beauty only. It is also a source of income (আয়) to men. Men for their great love of flowers decorate their houses with them on occasion (অনুষ্ঠান). Men love flowers, for they are the symbols (প্রতীক) of beauty and purity. A village home without any garden looks bare and poor.

2. Self-reliance means depending on one's own self. It is a great virtue. Self help is the best help. God helps those who help themselves. So, everybody must rely on his own abilities to be self reliant. A self reliant man has confidence in his own abilities. He takes heart in the face of difficults.

3. A man's sight is the greatest treasure (সম্পদ). There is no greater misfortune (দুর্ভাগ্য) in life than blindness. A blind person cannot see the beauties of nature. He cannot discover the treasure of human thought lying in books. He cannot write to express his thought.

4. For your mental health you have to control your emotions. Without controlling your emotions you cannot enjoy good mental health. You have to have patience and respect for other people's feeling. Without having patience you can not work properly.

5. We must make the best use of our animals. Bangladesh is an agricultural country. There is almost no mechanized cultivation. All the works of cultivation depend on animal power. That is why, working animals are badly needed.

6. A truly active man always finds time for everything. He is never in a hurry and never behind hand. Such a man never spends a single moment for nothing. He never leaves a letter unanswered. He does not set his hand to many things at a time but when he once undertake to do a thing he does not rest till it is well finished.

7. The great advantage (সুবিধা) of early rising is the good start it gives in our day's work. The early riser has done huge quantity of hard work before other men have got out of bed. In early morning the mind is fresh (সতেজ) and there are fewer disturbances. So, the work done at that time is generally will be done. By begining so early, he knows that he has plenty of time to do all the work thoroughly. He is not, therefore, tempted (প্রবৃত্ত হওয়া) to hurry.

8. Kamal ordered that all superstitions (কুসংস্কার) about clothing and mode of life should be given up. He made the woman to give up their veils (ঘোমটা), walk about and breathe (শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া) freely in the same way as men. He made education free and compulsory (বাধ্যতামূলক) for all children. He brought sweeping (ব্যাপক) improvement (উন্নতি) in the country. He worked with the energy of a giant and wisdom of a sage.

9. The wind and the sun had a quarrel as to who was the stronger. Just then a man came walking along the road. The sun said, "Do you see the man? Let us see which of us can make him take off his coat. He who succeed is the stronger."

10. Home is the first school where the child learns his first lesson. He sees, hears and begins to learn at home. It is the home that builds his character. In a good home honest and healthy men are made. But indulgence at home spoils a child.

11. Education has no end. So you should keep up your reading. Many young men close their books when they have taken their degrees and learn no more. Therefore, they soon forget all they have ever learned. If you want to continue your education, you must find time for serious reading.

12. The English are noted for their love of games and sports. They are bred up to it from Childhood. Games, such as football, hockey, and cricket are played in all schools and the boys play them with great interest, the playing of such games has created in them the sporting spirit.

13. Good manners are also important when you are with your friends. When you speak to anyone, speak clearly and distinctly for person to hear. It is an insult to a person to ask his attention and then speak so that he does not understand you. And remember it is your responsibility to make yourself understood.

14. Suddenly the ship caught fire which spread over the deck. All others left the burning deck. 'Father! Father!' cried Casabianca, 'Where are you? May I leave the place now?' But there was no reply.

15. One cold day, a man was on his way home from his work. He found on the road a snake that was half-dead with cold. Out of pity he brought the snake home and nursed him back to life. But as soon as he was well, the snake tried to bite the man's only child. At this, he took up a heavy axe and gave such a blow on the snake's head that he died on the spot.

16. Honesty is the best policy. An honest man is respected (সম্মানিত) by all. Everybody trusts (বিশ্বাস) him. No one can prosper (উন্নতি করা) in life if he is not honest. An honest shop-keeper is liked very much by his customers (ক্রেতাগণ). All go to his shop and buy things from him. They begin to trust him. His credit (সুনাম) grows and his business flourishes (প্রসার লাভ).

খ. প্রবন্ধ রচনা

রচনা বলতে প্রবন্ধ রচনাকে বোঝায়।

'রচনা' শব্দের অর্থ কোনোকিছু নির্মাণ বা সৃষ্টি করা। কোনো বিশেষ ভাব বা তত্ত্বকে ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তোলার নামই রচনা। রচনাকে সাধারণত সৃষ্টিশীল কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে বিষয়ের উপস্থাপনা, চিন্তার ধারাবাহিকতা, সংযত বর্ণনা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও যুক্তির সুশৃঙ্খল প্রয়োগ থাকে। লেখকের চিন্তা, কল্পনা ও বুদ্ধির মিলিত প্রয়াসে রচনা উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

'প্রবন্ধ' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' বলতে বিষয়বস্তু ও চিন্তার ধারাবাহিক বন্ধনকে বোঝায়। নাতিদীর্ঘ, সুবিন্যস্ত গদ্য রচনাকেই প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ রচনায় বিষয়, ভাব, ভাষা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের বেলায় রচনা ও প্রবন্ধ কথাটি সমার্থক। শিক্ষার্থীদের রচনায় নতুন কোনো ভাব বা তত্ত্ব থাকে না। একটা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা মনের ভাব বা বক্তব্যকে প্রকাশ করে। রচনা বা প্রবন্ধ লেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করতে পারে। এতে তার বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার দক্ষতা জন্মে। কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রচনা লেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারেরও দক্ষতা জন্মে। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য যথার্থ শব্দ প্রয়োগ এবং উপমা, অলংকার ইত্যাদি ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয়ে ওঠে। প্রকাশের জড়তা কাটিয়ে ওঠা ও ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রবন্ধ-রচনার অনুশীলন প্রয়োজন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ-রচনা অনুশীলনের বিকল্প কিছু নেই।

রচনার বিভিন্ন অংশ

রচনার প্রধান অংশ তিনটি — ক. ভূমিকা, খ. বিষয়বস্তু, গ. উপসংহার।

ক. ভূমিকা : এটি রচনার প্রবেশপথ। একে সূচনা, প্রারম্ভিকা বা প্রাক-কথনও বলা চলে। এতে যে বিষয়ে রচনা লেখা হবে, তার আভাস এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হওয়াই উচিত।

খ. বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য : বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্যই হচ্ছে রচনার প্রধান অংশ। এ অংশে রচনার মূল বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পরিচয় স্পষ্ট করতে হয়। বিষয় বা ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজনে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, অনুচ্ছেদগুলোর ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য এ অংশে প্রয়োজনে উদাহরণ, উপমা, উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় ।

গ. উপসংহার : বিষয়বস্তু আলোচনার পর এ অংশে একটা সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন হয় বলে এটাকে 'উপসংহার' নামে অভিহিত করা হয়। এখানে বর্ণিত বিষয়ে লেখকের নিজস্ব মতামত বা অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

রচনার শ্রেণীবিভাগ

বিষয়বস্তু অনুসারে রচনাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ক. বর্ণনামূলক রচনা, খ. চিন্তামূলক রচনা।

বর্ণনামূলক রচনা সাধারণত স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তিগত স্মৃতি-অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে হয়ে থাকে। ধান,পাট, শরৎকাল, কাগজ, টেলিভিশন, বনভোজন, শৈশবস্মৃতি ইত্যাদি রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চিন্তামূলক রচনায় থাকে সাধারণত তত্ত্ব, তথ্য, ধ্যান-ধারণা, চেতনা ইত্যাদি। শ্রমের মর্যাদা, বাংলাদেশের বন্যা ও তার প্রতিকার, পরিবেশ-দূষণ, অধ্যবসায়, সত্যবাদিতা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে পড়ে।

প্রবন্ধ-রচনার কৌশল

১. বর্ণনার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি, রঙ, ধ্বনি, স্বাদ, গন্ধ, অনুভূতি ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে হয়।

২. বর্ণনামূলক রচনা লেখার সময় সময়সীমা এবং পরিসরের কথা মনে রেখে বিশেষ কিছু দিক বেছে নিতে হয়। সেগুলির সাহায্যে মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।

৩. রচনা লেখার সময় পরম্পরা বা ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। জানা বিষয় ছাড়াও অনেক সময় অজানা বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে হতে পারে। বিষয়ের ধারণাগুলো একটির পর একটি এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে ভাবের কোনো অসংগতি না থাকে।

৪. শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে রচনার আকার সাধারণত নির্দিষ্ট পরিসরের হয়ে থাকে। পরিমিত পরিসরে তাই রচনার সামগ্রিক বিষয়কে তুলে ধরতে হয়। অযথা বিষয়কে প্রলম্বিত করা ঠিক নয়। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বাক্য লেখা থেকে বিরত থাকতে হয়। এক কথায় রচনা খুব ছোট বা খুব বড় হওয়া উচিত নয়।

৫. প্রবন্ধের ভাষা সহজ এবং প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্ধি, সমাসবদ্ধ পদ, অপরিচিত বা অপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করা ভালো। বাগাড়ম্বর বা অলংকারবহুল শব্দ ব্যবহার করা হলে অনেক সময় বিষয়টি জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষারীতির মাধ্যমে রচনাকে যথাসম্ভব রসমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করতে হয়।

প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায়

প্রবন্ধ রচনায় রাতারাতি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য নিয়মিত অনুশীলন দরকার। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলো সহায়ক হতে পারে:

১. প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রবন্ধ বা রচনা পড়তে হবে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করলে নানা বিষয়ে ধারণা জন্মায় এবং শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এতে লেখা সহজ হয়ে ওঠে।

২. প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রবন্ধের মর্মবস্তু, যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ানুগ, প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার।

৩. ভাষারীতিতে সাধু ও চলিত যেন মিশে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অযথা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, উদ্ধৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়।

৪. প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়াও নিজের বক্তব্যকে আরো জোরালো করার জন্য প্রবাদ-প্রবচন, কবিতার পঙ্‌ক্তি, উদ্ধৃতি ইত্যাদি সন্নিবেশ করা চলে।

৫. নিজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চিন্তাশক্তি, পঠন-পাঠন, ভাষাগত দক্ষতা ও উপস্থাপনা কৌশল ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রবন্ধকে যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করা উচিত।

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য

ভূমিকা : ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এ ছয় ঋতুর আবর্তন বাংলাদেশকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। প্রত্যেকটি ঋতুরই রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এক এক ঋতু আমাদের জীবনে নিয়ে আসে এক এক রকম ফুল, ফল আর ফসলের সম্ভার নিয়ে। বাংলার প্রকৃতিতে ষড়ঋতুর পালাবদল আল্পনা আঁকে অফুরন্ত সৌন্দর্যের। তাতে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়, আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে হৃদয়। গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষার সজল মেঘের বৃষ্টি, শরতের আলো-ঝলমল স্নিগ্ধ আকাশ, হেমন্তের ফসলভরা মাঠ, শীতের শিশিরভেজা সকাল আর বসন্তের পুষ্প সৌরভ বাংলার প্রকৃতি ও জীবনে আনে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির এ সাজবদল বাংলাদেশকে রূপের রানীতে পরিণত করেছে।

ঋতুচক্রের আবর্তন : বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তনের মূলে রয়েছে জলবায়ুর প্রভাব ও ভৌগোলিক অবস্থান। এ দেশের উত্তরে সুবিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগর। সেখানে মিলিত হয়েছে হাজার নদীর স্রোতধারা। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে হয় বৃষ্টি। বৃষ্টির ধারা এ দেশের মাটিকে করে উর্বর, ফুল ও ফসলে করে সুশোভিত। নদীর স্রোত বয়ে আনে পলিমাটি। সে মাটির প্রাণরসে প্রাণ পায় সবুজ বন-বনানী, শ্যামল শস্যলতা। তার সৌন্দর্যে এ দেশের প্রকৃতি হয়ে ওঠে অপরূপ। নব নব সাজে সজ্জিত হয়ে এ দেশে পরপর আসে ছয়টি ঋতু। এমন বৈচিত্র্যময় ঋতুর দেশ হয়তো পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ঋতু পরিচয় : বর্ষপঞ্জির হিসেবে বছরের বারো মাসের প্রতি দুই মাসে এক এক ঋতু। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল, কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল, পৌষ-মাঘ শীতকাল এবং ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল। তবে ঋতুর পালাবদল সবসময় মাসের হিসেব মেনে চলে না। তা ছাড়া ঋতুর পরিবর্তন রাতারাতি বা দিনে দিনেও হয় না। অলক্ষে বিদায় নেয় একঋতু, আগমন ঘটে নিঃশব্দে নতুন কোনো ঋতুর। প্রকৃতির এক অদৃশ্য নিয়মে যেন বাঁধা ঋতুচক্রের এই আসা-যাওয়া।

গ্রীষ্ম : ঋতু-পরিক্রমায় প্রথম ঋতু গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মে বাংলাদেশের রূপ হয়ে ওঠে রুক্ষ ও শুষ্ক। প্রচণ্ড খরতাপ আর খাঁ খাঁ রোদ্দুরে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়। নদী-নালা, খাল-বিল শুকিয়ে যায়। কখনো তপ্ত বাতাসে যেন আগুনের হলকা ছুটতে থাকে। ক্লান্তি আর তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে আসে পথিকের। কখনো উত্তর-পশ্চিম আকাশের কোণে কালো হয়ে মেঘ জন্মে। হঠাৎ ধেয়ে আসে কালবৈশাখীর ঝড়। বছরের পুরোনো সব আবর্জনা ধুয়ে মুছে যায়। জ্যৈষ্ঠ আসে ফলের সম্ভার নিয়ে। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু ইত্যাদি নানারকম মৌসুমি ফলের সমারোহ গ্রীষ্মঋতুকে করে তোলে রসময়।

বর্ষা : গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহের পর আসে বর্ষা। আকাশে দেখা দেয় সজল-কাজল মেঘ। অঝোর ধারায় নামে বৃষ্টি। পৃথিবীতে প্রাণের সাড়া জাগে। আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষণে জেগে ওঠে বৃক্ষলতা। কখনো একটানা বৃষ্টিতে খাল-বিল, পুকুর-নদী সব কানায় কানায় ভরে ওঠে। বর্ষার পল্লীপ্রকৃতি তখন এক অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়। সে রূপ ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়:

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের খেত জলে ভরভর
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে।

বর্ষায় বাংলাদেশের নিচু এলাকাগুলো পানিতে ডুবে যায়। নদীতে দেখা দেয় ভাঙন। বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেয় বন্যা। এমনকি শহরাঞ্চলও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বর্ষায় গরিব মানুষের দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যায়। মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়।

শরৎ : শরৎ বাংলাদেশের এক ঝলমলে ঋতু। বর্ষার বৃষ্টি-ধোয়া আকাশ শরতে হয়ে ওঠে নির্মল। তাই শরতের আকাশ থাকে নীল। শিমুল তুলোর মতো সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় আকাশে। এ সময় শিউলি ফুল ফোটে, নদীর তীরে ফোটে সাদা কাশফুল। নির্মল আকাশে শরতের জ্যোৎস্না হয় অপরূপ ও মনোলোভা। ঘাসের বুকে শিশিরের মৃদু ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে শরতের সকাল।

হেমন্ত : হেমন্ত বাংলাদেশের ফসল-সমৃদ্ধ ঋতু। তখন সোনালি ফসলে সারা মাঠ ভরে থাকে। কৃষকের মুখে থাকে হাসি। কাস্তে হাতে পাকা ধান কাটতে ব্যস্ত থাকে কৃষক। নতুন ফসল ওঠায় ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্নের উৎসব। পাকা ধানের সোনালি দৃশ্য সত্যি মনমুগ্ধকর। সন্ধ্যা ও সকালে চারিদিকে ঘন হয়ে কুয়াশা নামে। এসময় থেকে শীতের আমেজ পাওয়া যায়।

শীত : শীত বাংলাদেশের এক হিমশীতল ঋতু। শীত আসে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে। শীতে বিবর্ণ হয়ে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। সকাল হলেও অনেক সময় সূর্যের মুখ দেখা যায় না। শীতে জড়সড় হয়ে যায় মানুষ ও প্রাণীকুল। শীতের প্রচণ্ডতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাই গরম কাপড় পরে। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে শীতের প্রকোপ থাকে বেশি। শীতে বেশি কষ্ট পায় আশ্রয়হীন, শীতবস্ত্রহীন দরিদ্র মানুষ। শীত কেবল হিমশীতল বিবর্ণ ঋতু নয়। শীতকালের প্রকৃতি নানারকম শাকসবজির সম্ভার নিয়ে আসে। গ্রামবাংলায় এ সময় খেজুর রস ও পিঠা-পায়েশ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

বসন্ত : বসন্তকে বল হয় ঋতুরাজ। শীতের রুক্ষ, বিবর্ণ দিন পেরিয়ে বসন্ত আসে বর্ণিল ফুলের সম্ভার নিয়ে। বাংলার নিসর্গলোক এ সময় এক নতুন সাজে সজ্জিত হয়। পুষ্প ও পল্লবে ছেয়ে যায় বৃক্ষশাখা, গাছে গাছে আমের মুকুল আর ফুলে ফুলে মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যায়। মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস আর কোকিলের কুহুতান বসন্তের এক অপরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করে।

উপসংহার : বাংলাদেশ বিচিত্র সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ঋতু পরিক্রমায় এখানে দেখা যায় বৈচিত্র্যময় রূপ। গ্রীষ্মের রুক্ষ প্রকৃতি, বর্ষার জলসিক্ত জীবন, শরতের কাশফুল, হেমন্তের নবান্নের উৎসব, শীতের কুয়াশামাখা সকাল আর বসন্তের পুষ্প-পল্লব ষড়ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাংলাদেশকে করেছে বিচিত্ররূপিণী। প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্যময় রূপ পৃথিবীর আর কোথাও কি আছে?

গ্রীষ্মের দুপুর

ভূমিকা : গ্রীষ্মের দুপুর মানেই সূর্যের প্রচণ্ড তাপদাহ। খাঁ খাঁ রোদ্দুর, তপ্ত বাতাসে আগুনের হলকা। সবুজ পাতা নেতিয়ে পড়ার দৃশ্য। বটের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া রাখাল ছেলে। চারিদিকে নিঝুম, নিস্তব্ধ, ঝিমধরা প্রকৃতি। ঘামে দরদর তৃষ্ণার্ত পথিক। কবির ভাষায় :

ঘাম ঝরে দরদর গ্রীষ্মের দুপুরে
খাল বিল চৌচির জল নেই পুকুরে।
মাঠে ঘাটে লোক নেই খাঁ খাঁ রোদ্দুর
পিপাসায় পথিকের ছাতি কাঁপে দুদ্দুর।

গ্রীষ্মের দুপুরের অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য এটি। রুক্ষ, শুষ্ক বৈচিত্র্যহীন, নিপাট দিনের স্থিরচিত্র। গ্রামের কোনো পুকুরঘাটে, কুয়োতলায়, নদীর তীরে, বিস্তীর্ণ চরাচরে রোদে প্রকৃতির দিকে তাকালে গ্রীষ্মের দুপুরের রূপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

গ্রীষ্মের দুপুরে প্রকৃতির অবস্থা : চৈত্রের কাঠফাটা রোদে গ্রীষ্মের পদধ্বনি শোনা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এলে সেই তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। সূর্যের প্রখর তাপে সমস্ত প্রকৃতি যেন নির্জীব হয়ে ওঠে। সবজির নধর পাতা খরতাপে নুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হাওয়ায় ধুলো ওড়ে, ঝরে পড়ে গাছের হলুদ পাতা। দূর আকাশে পাখনা মেলে চিল যেন বৃষ্টিকে আহ্বান জানায়। পাতার আড়ালে ঘুঘুপাখির উদাস-করা ডাক শোনা যায়। প্রকৃতি যেন পরিশ্রান্ত হয়ে নিঝুম মুহূর্তগুলো কাটাতে থাকে। পুকুরঘাটে তৃষ্ণার্ত কাক, গাছের ছায়ায় পশু-পাখির নিঃশব্দ অবস্থান গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরের পরিচিত দৃশ্য।

গ্রীষ্মের দুপুরে জনজীবন : গ্রীষ্মের দুপুর মানবজীবনেও নিয়ে আসে নিশ্চলতার আমেজ। কর্মব্যস্ত জীবনে আসে অবসাদ। মাঠে-ঘাটে জীবনের সাড়া যায় কমে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে যারা কাজ করে, তাদের মাথায় থাকে মাথাল। কর্মমুখর দিনে গ্রীষ্মের দুপুরে সময় কিছুটা যেন ধীরগতিতে অগ্রসর হয়। রাখাল ছেলে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। পথিকজন পথের ক্লান্তি ঘোচাতে বিশ্রামের প্রহর গোনে। নিঃশব্দ প্রকৃতি আর নীরব মানুষের কাছে গ্রীষ্মের দুপুর যেন স্থির। বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, কোথাও যেন স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। মাঠ-ঘাট চৌচির, নদী-জলাশয় জলশূন্য। মাঠে মাঠে ধুলোওড়া বাতাস। আগুনঢালা সূর্য, ঘর্মাক্ত দেহ, ক্লান্তি আর অবসাদে গ্রীষ্মের দুপুর যেন অসহনীয় হয়ে ওঠে। মুহূর্তের জন্যে প্রাণ সিক্ত হতে চায়, একটু ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেতে চায় মন।

গ্রীষ্মের দুপুর গ্রামজীবনে নিয়ে আসে বিশ্রামের সুযোগ। কেউ কেউ নির্জন দুপুরে দিবানিদ্রায় ঢলে পড়ে। গৃহিণীরা সংসারের কাজের একটু অবসরে বিশ্রামের সুযোগ খোঁজে। তালপাখার বাতাসে একটু প্রাণ জুড়ায়। শীতল পাটিতে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। আমবাগানে দুষ্টু ছেলেদের আনাগোনা হয়তো বেড়ে যায়।

গ্রীষ্মের দুপুরে শহরের দৃশ্য অবশ্য অন্যরকম। প্রচণ্ড রোদে রাস্তার পিচ গলতে থাকে। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল কমে আসে। গলির ঝাঁপখোলা দোকানপাটে ঝিমধরা ভাব। ঘরে বাইরে কর্মের জগৎ হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে আসে। অফিস পাড়ার কর্মব্যস্ততাও এ সময় একটু শিথিল হয়ে আসে। ক্লান্তি ও শ্রান্তি ঘিরে ধরে কর্মচঞ্চল জীবনপ্রবাহকে। গ্রীষ্মের শান্ত দুপুর মনে করিয়ে দেয় ধরিত্রীর সঙ্গে মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কের কথা। অন্য এক উপলব্ধির জগতে নিয়ে যায় মানুষকে।

উপসংহার : গ্রীষ্মের দুপুরের প্রখর তাপ প্রকৃতি ও জনজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব কেবল বাহ্যিক নয়, অভ্যন্তরীণও। রহস্যময় প্রকৃতির এ যেন এক গোপন আয়োজন। গ্রীষ্মের তপ্ত আকাশে এক সময় দেখা যায় সজল-কাজল মেঘ। নেমে আসে স্বস্তির বৃষ্টি। গ্রীষ্মের দুপুরের ঝিমধরা প্রকৃতি আর নিশ্চল স্থবির জনজীবন, শস্যহীন মাঠ, নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকা, রোদ ঝলসানো তপ্ত বাতাসের এই পরিচিত দৃশ্যের কথা এ সময় ভুলে যায় মানুষ।

বর্ষায় বাংলাদেশ

ভূমিকা : বর্ষা বাংলাদেশের আনন্দ-বেদনার এক ঋতু। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দহন শেষে বর্ষা আসে প্রকৃতির আশীর্বাদ হয়ে। একটানা বর্ষণের পর পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে। বাংলার নিসর্গলোক সজীব হয়ে ওঠে। বর্ষার আগমনে তাই বাংলার প্রকৃতির রূপও পালটে যায়। বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে গ্রীষ্মের বিবর্ণ প্রকৃতি হয়ে ওঠে কোমল আর সজীব। এ সময় আকাশে সারাক্ষণ চলে ঘনকালো মেঘের আনাগোনা। এমন দিনে কোনো কাজে মন বসে না। বর্ষাঋতুকে নিয়ে কবি লিখেছেন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন-গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম-গম্ভীর সরসা।

বাংলার প্রকৃতিতে বর্ষাকাল : ঋতুর গণনা হিসেবে আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। কিন্তু বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয় বৈশাখ থেকে, চলে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত। সেই হিসেবে বর্ষা বাংলাদেশের দীর্ঘতম ঋতু। অনেক সময় দেখা যায় শরৎকালকে স্পর্শ করেও বৃষ্টির কোনো বিরাম নেই। বর্ষার আগমনে তৃষিত পৃথিবী সিক্ত-শীতল হয়ে যায়। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখি সব যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। নদীনালা, খালবিল, মাঠঘাট পানিতে ভরপুর হয়ে যায়। ফোটে কেয়া, কদম ফুল। বর্ষা বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সুখ ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। গাছপালা নতুন পত্রপল্লবে ভরে যায়, উর্বর হয়ে ওঠে ফসলের খেত। সুখী গৃহবাসী মানুষের কাছে বর্ষার এই ভরভরন্ত দৃশ্য খুবই আনন্দের। ছোট ছেলেমেয়েরা কলার ভেলা বা কেয়াপাতার নৌকা ভাসিয়ে আনন্দ করে। বৃদ্ধরা ঘরে বসে পান-তামাক খায়। কেউবা খোশ গল্পে মেতে ওঠে।

বর্ষাঋতু সাধারণ দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য খুবই দুঃখের। কারণ, অনেক সময় টানা বর্ষণে খেটে খাওয়া মানুষ কাজে যেতে পারে না। তাদের আয়-রোজগার বন্ধ থাকে, ঘরবাড়ি বৃষ্টির পানিতে ভেসে যায়। ফলে তাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। অতিবৃষ্টির ফলে নদীভাঙনে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। কৃষকের ফসলের জমি ভেসে যায়, খেতের ফসল নষ্ট হয়। বানভাসি মানুষের এসব অবর্ণনীয় কষ্ট দেখলে মনে হয়, বর্ষা এসব মানুষের জীবনে দুর্যোগ ও দুর্ভোগের বার্তা নিয়ে এসেছে।

বর্ষার রূপ : বর্ষায় বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ অন্যরকম হয়ে যায়। আকাশে ঘনকালো মেঘের আনাগোনা চলতে থাকে। কখনো-বা আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। দু'তিন দিন হয়তো সূর্যের দেখাই মেলে না। কখনো কখনো শোনা যায় মেঘের গর্জন। একটানা বৃষ্টিতে কোথাও হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে কেঁপে ওঠে ছেলে-বুড়ো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।'

বর্ষায় পল্লীর রূপ : বর্ষায় পল্লীর মাঠ-ঘাট বৃষ্টির পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। নদীর দুকূল ছাপিয়ে বর্ষার পানি গ্রামে প্রবেশ করে। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়ে যায়। নৌকা ছাড়া অনেক জায়গায় চলাফেরা করা যায় না। তখন গ্রামগুলোকে মনে হয় নদীর বুকে জেগে ওঠা এক-একটা দ্বীপ। বর্ষায় পল্লীর দৃশ্য সত্যি অপূর্ব!

বর্ষার অবদান : বর্ষাকালে আমাদের দেশে কেয়া, কামিনী, কদম, জুঁই, টগর, বেলি, চাঁপা প্রভৃতি ফুলের সুগন্ধে চারপাশ সুরভিত হয়ে ওঠে। অর্থকরী ফসল পাট তখন কৃষকের ঘরে আসে। আউশ ধানের মৌসুম তখন। পেয়ারা, কলা, চালকুমড়া, ঝিঙা, করলা, ঢেঁড়স, বরবটি ইত্যাদি ফল ও তরকারি বর্ষারই অবদান। বর্ষাকালে আমরা প্রচুর মাছ পেয়ে থাকি। এ সময় নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত খুব সহজ হয়।

উপসংহার : বর্ষাঋতুর সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের একটা নিবিড় আত্মীয়তার যোগ আছে। সে যোগ কেবল ব্যবহারিক নয়, অন্তরেরও। বর্ষায় বাংলার মানুষের অন্তরও সিক্ত-স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য মানুষের মনেও গভীর প্রভাব ফেলে যায়।

বর্ষণমুখর একটি দিন

আজ সকালে ঘুম থেকে জেগেই দেখি সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ভরে গিয়েছে। চারিদিকে ঘোলাটে অন্ধকার। সারাটা দিন সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। যতদূর দৃষ্টি কেবল সজল-কাজল মেঘের আনোগোনা। দুপুর না গড়াতেই টাইপরাইটারের শব্দের মতো ঝাঁজালো বৃষ্টি নামল আমাদের টিনের চালে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ধারাও যেন বেড়েই চলছে, থামাথামি নেই। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখি, আজ শ্রাবণ মাসের দুই তারিখ। বর্ষার মাঝামাঝি, এ সময় তো বৃষ্টি হবেই।

বিকেলের দিকে বৃষ্টির ধারা একটু হালকা হলেও সন্ধ্যার আগমুহূর্তে ঝুম ঝুম বৃষ্টি শুরু হল। এই বর্ষণমুখর শ্রাবণসন্ধ্যায় অলস ভাবনায় কেটে যায় সময়। সামনে পরীক্ষা, টেবিলে বই, কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। টিনের চালে যেন বর্ষাকন্যা নৃত্য করে চলছে। সেই একটানা বৃষ্টির নূপুর-নিক্কণ আমাকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ যেন এমন বর্ষণমুখর সন্ধ্যার কথা স্মরণ করেই লিখেছেন—

'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে
বাঁধন হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে, কী ভাবি যে আপন মনে
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে।'

সব কাজ ফেলে আপন মনে প্রকৃতিকে দেখা আর কী এক আকুলতায় নিজেকে আচ্ছন্ন রাখা। হয়তো কবি না হলে

বর্ষার দিনের এমন মুহূর্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায় না। এ সন্ধ্যায় মনটা যেন উতলা হয়ে উঠেছে। আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলছে বৃষ্টির একটানা সুর। মনের ভেতর নানারকম ভাবনা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সে অনুভূতির কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, নির্দিষ্ট কোনো নাম নেই।

রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টির একটানা শব্দ আজ মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জানালার পাশে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনছি। মাঝে মাঝে মেঘের গুরুগুরু গর্জন, গাছের ডালে বাতাসের ঝাপটা কানে বাজে। হঠাৎ বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠি। আজ নিশ্চয় রাস্তায় জনমানব নেই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখতে পেলাম না। হ্যারিকেনের আলো একটু বাড়িয়ে দিলাম। তখনো ঝর ঝর করে অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। একবার ভেবেছি একাগ্রচিত্তে পরীক্ষার পড়া পড়ব কিন্তু বইয়ের পাতায় কিছুতেই মন বসছে না। মনের মধ্যে তত্ত্বকথা উঁকি দেয়। জীবনটাকে সফল করার দুর্বার সাধনায় নামতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তাও ভাবনায় আসে।

ও ঘর থেকে মা ডাকছেন-'আয়, খোকা, নাশতা খেয়ে যা। ঘরে মোমবাতি নেই, এই-ই সম্বল।' অগত্যা উঠতে হল। বাবা, আমি, টুম্পা, আর ছোটমামা মোমের আলোতে গরম গরম চা আর ঝালমুড়ি খেতে বসেছি। টুম্পা বলল, 'মামা এই অন্ধকারে বৃষ্টির দিনে ভূতের গল্প ভালো জমবে। ভাত খেয়ে চল ভূতের গল্প শুনি।' আমিও বললাম, 'হ্যাঁ মামা ভূতের গল্প বল।' ছোটমামা গল্প শুরু করলেন। কখনো ভূতের মতো নাকি সুরে, কখনো ফিসফিসে গলায়, কখনো জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে পরিবেশ বেশ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ভৌতিক ঘটনার বর্ণনা শুনে আমাদের গা ছমছম করে উঠল। টুম্পা ইতোমধ্যে কাঁথার আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। গল্পের এক রোমাঞ্চকর মুহূর্তে হঠাৎ ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে ওঠে। বাইরে তখনো তুমুল বৃষ্টি। নরম বিছানায় অলস ঘুমের মায়া কাটিয়ে আর কতক্ষণ দূরে থাকা যায়।

বর্ষণমুখর সন্ধ্যা কেটে যায়। শ্রাবণের বৃষ্টির ধারা তখনো থামে না। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আমি একসময় ঘুমের আয়োজন করি। বর্ষার জলতাণ্ডব তখনো কানে বাজে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি, জলপরীরা নৃত্য করছে সারা আকাশ জুড়ে।

শরৎকাল

শরৎ বাংলাদেশের কোমল, স্নিগ্ধ এক ঋতু। শরৎঋতুর রয়েছে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের ছয়টি ঋতু ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন রূপের পসরা নিয়ে হাজির হয়। এক-এক ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফুলে ও ফলে, ফসলে ও সৌন্দর্যে সেজে ওঠে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর আর কোনো দেশের প্রকৃতিতে ঋতুবৈচিত্র্যের এমন রূপ বোধ হয় নেই।

বর্ষাকন্যা অশ্রুসজল চোখে বিদায় নেয় শ্রাবণে। ভাদ্রের ভোরের সূর্য মিষ্টি আলোর স্পর্শ দিয়ে প্রকৃতির কানে কানে ঘোষণা করে শরতের আগমন বার্তা। থেমে যায় বর্ষামেয়ের বুকের ভেতর দুঃখ মেঘের গুরুগুরু। ঝক্‌ঝকে নীল আকাশে শুভ্র মেঘ, ফুলের শোভা আর শস্যের শ্যামলতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শরৎ। প্রকৃতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি তখন গেয়ে ওঠেন—

'আজি ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরির খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা ॥'

ভাদ্র-আশ্বিন এ দুই মাস বাংলাদেশে শরৎকাল। শরতের সৌন্দর্য বাংলার প্রকৃতিকে করে তোলে রূপময়। গাছপালার পত্রপল্লবে গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতেই পাখপাখালির দল মহাকলরবে ডানা মেলে উড়ে যায় নীল আকাশে। আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার প্রান্ত ছুঁয়ে মালার মতো উড়ে যায় পাখির ঝাঁক। শিমুল তুলোর মতো ভেসে চলে সাদা মেঘের খেয়া। চারিদিকে সজীব গাছপালার ওপর বয়ে যায় শেফালিফুলের মদির গন্ধভরা ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া।

শিউলি তলায় হালকা শিশিরে ভেজা দূর্বাঘাসের ওপর চাদরের মতো বিছিয়ে থাকে সাদা আর জাফরান রঙ মেশানো রাশি রাশি শিউলিফুল। শরতের ভোরের এই সুরভিত বাতাস মনে জাগায় আনন্দের বন্যা। তাই খুব ভোরে কিশোর-কিশোরীরা ছুটে যায় শিউলি তলায়।

সূর্য ওঠে সোনার বরন রূপ নিয়ে। নির্মল আলোয় ভরে যায় চারিদিক। আমন ধানের সবুজ চারার ওপর ঢেউ খেলে যায় উদাসী হাওয়া। আদিগন্ত সবুজের সমারোহ। ফসলের মাঠের একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর রুপালি ধারায় সূর্যের আলো ঝলমল করে। নদীর তীরে কাশবনের সাদা কাশফুল কখনো হাতছানি দিয়ে ডাকে। মনে পড়ে কবির লেখা চরণ—

'পুচ্ছ তোলা পাখির মতো
কাশবনে এক কন্যে,
তুলছে কাশের ময়ূর-চূড়া
কালো খোঁপার জন্যে।'

কাশফুলের মনোরম দৃশ্য থেকে সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না। ভরা নদীর বুকে পাল তুলে মালবোঝাই নৌকা চলে যায়। ডিঙি নাও বাইতে বাইতে কোনো মাঝি হয়তো-বা গেয়ে ওঠে ভাটিয়ালি গান। পুকুরপাড়ে আমগাছের ডালে মাছরাঙা ধ্যান করে। স্বচ্ছ জলে পুঁটি, চান্দা বা খলসে মাছের রুপালি শরীর ভেসে উঠলে সে ছোঁ মেরে তুলে নেবে তার লম্বা ঠোঁটে। নদীর চরে চখাচখি, পানকৌড়ি, বালিহাঁস বা খঞ্জনা পাখির ডাক। কলসি কাঁখে মেঠো পথে হেঁটে চলে গাঁয়ের বধূ। ফসলের খেতে অমিত সম্ভাবনা কৃষকের চোখে স্বপ্ন এনে দেয়। তৃপ্তির চোখে ভবিষ্যৎ আর স্বপ্নে ছাওয়া সবুজ ধানখেতটা একবার চেয়ে দেখে কৃষক।

বিলের জলে নক্ষত্রের মতো ফুটে থাকে সাদা ও লাল শাপলা। সকালের হালকা কুয়াশায় সেই শাপলা এক স্বপ্নিল দৃশ্যের আভাস আনে। আলো চিকচিক বিলের জলে ফুটে ওঠে প্রকৃতির অপার লীলা।

শরতের এই স্নিগ্ধ মনোরম প্রকৃতি মানবজীবনেও এক প্রশান্তির আমেজ বুলিয়ে দেয়। কৃষকদের হাতে এ সময় তেমন কোনো কাজ থাকে না। অফুরন্ত অবসর তাদের। মাঠভরা সোনার ধান দেখে কৃষকের মনে দানা বেঁধে ওঠে আসন্ন সুখের স্বপ্ন। শহরের মানুষও অবকাশ পেলে শরতের মনোরম প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য গ্রামের বাড়িতে ছুটে যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজার মহাধুম পড়ে যায় এ সময়ে। শরতে প্রকৃতি থাকে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত।

শরৎ, বর্ষার অব্যবহিত পরবর্তী ঋতু। তাই শরতের আগমনে বাংলার প্রকৃতি থাকে নির্মল, স্নিগ্ধ। শরতের মতো নীল আকাশ আর কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর নদীতীরে সাদা কাশফুল, ভোরে হালকা শিশিরভেজা শিউলিফুল সব মিলিয়ে শরৎ যেন শুভ্রতার ঋতু। শরৎকালে রাতের বেলার জ্যোৎস্নার রূপ অপরূপ। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে যেন জ্যোৎস্নার ফুল ঝরে। চাঁদের আলোর শুভ্রতায় যেন আকাশ থেকে কল্পকথার পরীরা ডানা মেলে নেমে আসে পৃথিবীতে। শরতের জ্যোৎস্নার মোহিত রূপ নিজ চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। বলা যায়, শরৎ বাংলার ঋতু-পরিক্রমায় সবচেয়ে মোহনীয় ঋতু।

শীতের একটি সকাল

আজ পৌষের ষোল তারিখ। জানুয়ারির এই সময়টায় খুব শীত পড়ে। পৌষমাসের শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপার কথা। কিন্তু আমার গায়ে পাতলা একটা জামা। তেমন শীত লাগছে না। কারণ, আমি শহরের একটি আবাসিক এলাকায় বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। গ্রামের মতো শীত এখানে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শহরের বড় বড় দালানকোঠা, পাকা সড়ক, গাড়িঘোড়া, বিদ্যুতের বাতি আর কলকারখানার ভিড়ে শীতের প্রকোপ তেমন বোঝা যায় না। 'পৌষের শীত তুষের গায়/মাঘের শীতে বাঘ পালায়'—এ প্রবাদের শীত এখানে নেই। স্যুয়েটার, জ্যাকেট, কোট-টাইয়ের ভিড়ে এখানে শীত যেন ম্রিয়মাণ। শীত-সকালের আমেজ এখানে নতুন শাকসবজি আর হালফ্যাশনের গরম কাপড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গত শীতে আমি নানার বাড়ি দেবরামপুরে গিয়েছিলাম। বাস, রিকশা তারপর হাঁটাপথে যেতে যেতে বিকেলে নানার বাড়ি পৌঁছলাম। পরদিন ভোরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে মামা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। লেপের ভেতর থেকে চোখ ডলতে ডলতে উঠে দেখি, চাদর গায়ে দেওয়া মামা আমার ঠক্ঠক্ করে কাঁপছেন। মামা বললেন, 'চল্ মন্টু, গাছ থেকে খেজুর-রস নামাব।' আমি মহানন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

উঠোনে নামতেই দেখি, নানিজান মাটির চুলায় ভাপা পিঠা বানাচ্ছেন। চারিদিকে খেজুর-রসের মৌ মৌ গন্ধ। আমার জিভে প্রায় পানি এসে গেল। মামার সাথে সাথে বাড়ির বাইরের দিকে গেলাম। কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে সব। পুকুরের হিমশীতল জলে মুখ ধুলাম। তারপর গেলাম মামার সাথে খেজুর-রস নামাতে।

বাড়ির সীমানা ঘেঁষে বেশ কয়েকটা খেজুর গাছ। তাতে এ সময় প্রচুর রস হয়। মামা খুব সাবধানে কোমরে বাঁধা টোকাতে ঝুলিয়ে রসভর্তি মাটির কলসিগুলো একে একে নামালেন। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে রসগুলো ঢাললেন একটা বড় গামলায়। গ্লাসে ভরে আমাকে দিলেন একগ্লাস কাঁচা রস। দাঁত অবশ হয়ে যাওয়ার মতো শীতল, কিন্তু অপূর্ব স্বাদ। খেজুর রস খেয়ে আমার শীত যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। মামা আমার অবস্থা দেখে হেসে উঠলেন। গ্রামের পথ-ঘাট কুয়াশার চাদরে ঢাকা। আলপথে কৃষক লাঙল কাঁধে গরু নিয়ে যাচ্ছে হাল চাষে। কুয়াশার মধ্যে তাঁদের আবছা ছায়ামূর্তি দেখা যায়। যেন কোনো শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক সুন্দর মনোরম ছবি।

পূর্বদিকে আবির ছড়িয়ে সূর্য উঠছে ডিমের কুসুমের মতো। সবুজ ঘাসে ছড়ানো শিশিরগুলোকে মুক্তোর মতো লাগছে। খালিপায়ে শিশিরসিক্ত সবুজ ঘাসে হাঁটতে গিয়ে আমার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে গেল। কিন্তু হিমশীতল শিশিরের স্পর্শ পেয়ে আমার মন আনন্দে নেচে উঠল।

বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম পুকুরের পানি থেকে ধোঁয়া উঠছে। উঠোনের একপাশে তখন রোদ এসেছে। সেখানে পাটি বিছিয়ে নানিজান ভাপা পিঠা আর কাঁচা রসের পায়েশ খেতে দিলেন। অপূর্ব তার স্বাদ। শীত-সকালের এমন সুখকর অনুভূতি আমি এর আগে আর কখনো পাইনি। আবহমান বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যে লালিত এই গ্রামীণ জীবনের শীতের সকাল উপভোগ করে আমি ধন্য।

শহরের বাসায় ডায়নিং টেবিলে বসে ডিম মামলেট, রুটির টোস্ট কিংবা পরোটা-ভাজির নাশতায় সেই স্বাদ কোথায়? আমাদের আবাসিক এলাকায় বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্যোদয় দেখতে দেখতে আমি আনমনা হয়ে যাই। বাইরে তখন প্রাণের সাড়া পড়েছে। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা স্কুলড্রেস পরে, পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। শহরের শীতের সকালের মধ্যে সেই প্রাণস্পন্দন কোথায়? আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে হল, আজকের এই শীতের সকালে যদি আমার নানিবাড়িতে থাকতে পারতাম!

বসন্তের প্রকৃতি
(সংকেত)

ভূমিকা : ফাল্গুন-চৈত্র এ দুই মাস বসন্তকাল। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে বাংলাদেশের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পালটে যায়। পাতাঝরা শীতের বৈরাগ্য আর থাকে না। গাছের ডালে কচি কিশলয় উঁকি দেয়। পত্রপল্লবে ভরে যায় বৃক্ষের শাখা। মুকুলিত বৃক্ষের শাখায় মৌমাছিদের গুঞ্জন, কোকিলের কুহু তানে ভরে যায় হৃদয়। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গান-

'আহা, আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফোটে
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়।'

বসন্তের রূপবৈচিত্র্য : বসন্তের প্রকৃতি খুবই মনোরম। পত্রপুষ্পে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন সবুজ বন-বনানী। নানা বর্ণের ফুলের সৌরভে বাতাস আমোদিত হয়। শিমুলের লাল থোকা থোকা ফুলের আড়ালে নেচে ওঠে শালিক পাখি, ময়না, টিয়ে। ঘন বনের আড়ালে লুকিয়ে কু-উ করে ডেকে ওঠে কোকিল। প্রকৃতির এই সাজবদল মানুষের মনেও নতুন এক বার্তা বয়ে আনে। 'বৌ কথা কও' পাখির গানে মানুষের মনও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মলীন হয়ে যায়। অজানা আনন্দে

হৃদয় ভরে যায়। ধান-কাউনের মাঠে মটরশুঁটির লতানো গাছ, সরষে ফুলের হলুদ বনে প্রজাপতির লুটোপুটি এসব মনোরম শোভা সত্যি আনন্দের। আমের শাখায় দেখা যায় নতুন মঞ্জরি। মৌমাছির গুঞ্জন, মৃদুমন্দ দখিনা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। আবহাওয়া থাকে নাতিশীতোষ্ণ।

উপসংহার : বসন্ত বাংলার সুরভিত এক ঋতু। এ ঋতুতে প্রকৃতি যেমন আপন সাজে নিজেকে সজ্জিত করে, তেমনি মানুষের মনেও এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি হয়। বসন্ত তাই সবার কাছে কাঙ্ক্ষিত ঋতু। কবি-সাহিত্যিকরা নানাভাবে বসন্তের বন্দনা করেছেন। 'ঋতুরাজ' বলে অভিহিত করে বসন্তের প্রশংসা করেছেন।

নদীতীরে সূর্যাস্ত

গোধূলির আবিরে রাঙা অস্তায়মান লাল সূর্য। দিনের শেষে থেমে আসে চারপাশের কর্মকোলাহল। প্রকৃতিতে নেমে আসে অন্যরকম এক প্রশান্তি। পশু-পাখি নীড়ে ফিরে যেতে থাকে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর শুরু হয় শ্রান্ত মানুষের ঘরে ফেরার পালা। চরাচরে সর্বত্রই বিরাজ করে এক নৈসর্গিক নীরবতা। সূর্যের রক্তিম আলোর ছটায় প্রকৃতি যেন অন্যরকম রঙে নিজেকে সাজায়।

নদীর তীরে দাঁড়ালে সূর্যাস্তের এক মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। বিস্তৃত নদীতীর, সামনে কল্লোলিত নদী, স্বর্গীয় আভায় রঞ্জিত আকাশ— এই শোভা, এই অপরূপ রূপের মাধুরী দেখে দু'চোখের তৃষ্ণা যেন মেটে না। বিশ্বস্রষ্টা যেন নিজেকে আড়ালে রেখে মোহময় সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষকে ডুবিয়ে রেখেছেন। রহস্যময় এক মায়ার জগৎ সৃষ্টি করে খেলছেন আড়ালে বসে। সূর্যাস্তের সময় নির্জন নদীতীরে দাঁড়ালে এমন অধ্যাত্ম্য-ভাবনা ভেসে আসে মনে। নদীতীরে সূর্যাস্ত দেখে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার কিছু চরণ :

'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।'

দিবসের অবসান আর রাত্রির আগমনের এই মাহেন্দ্রক্ষণটিতে পৃথিবী যেন মিলন-বিরহের খেলায় মেতে ওঠে। আকাশ আর মাটি যেন মুখোমুখি মৌনমুখর। সে অপার্থিব মৌনতা ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ চরাচরে নদীবক্ষে, পর্বতে, অরণ্যে। ছায়াঢাকা গ্রামের নিবিড় প্রেক্ষাপটে সূর্যাস্তের দৃশ্য ঘোমটা-টানা লাজুক বধূর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নদীতীরে সূর্যাস্ত দেখতে গেলে বহুমাত্রিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে। সামনে বিশাল জলরাশি, উপরে রক্তিম উদার আকাশ, গোধূলি লগ্নে উন্মুক্ত নদীতীরে দাঁড়ালে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। আকাশের রক্তিম রঙে নদীর পানি রঙিন হয়ে ওঠে। এ সময় দিগন্তে দ্রুত রঙ বদলাতে থাকে। অস্তগামী সূর্যের লাল টিপ কপালে পরে পৃথিবী যেন নববধূর মতো সাজে। ঝিলিমিলি ঢেউখেলানো সোনারঙের পানিতে পালতোলা নৌকা ভেসে চলার দৃশ্য অপূর্ব লাগে। নদীর তীর ঘেঁষে বাতাসের স্রোত সাঁতরে উড়ে চলে সাদা বক, গাঙচিল, বালিহাঁসের ঝাঁক। রক্তিম সূর্য তার উষ্ণতা বিলিয়ে লাল হতে হতে নিচে নামতে থাকে। এক সময় মনে হয় নদী আর আকাশ যেন মিশে গেছে দিগন্তরেখায়। সূর্য যেন কান পেতে শুনছে পৃথিবীর গোপন বিষাদের সুর।

তারপর সেই অগ্নিগোলক যেন নদীর বুকে টুপ করে ডুবে গেল। আঁধারে কালো চাঁদর আচ্ছন্ন করল চারিদিক। চরাচরে ঝিঁঝির শব্দ, জোনাকির টিপটিপ আলো, ঝিরিঝিরি বাতাসে সৃষ্টি হয় নতুন এক আবেশ। কখনো সন্ধ্যাকে মনে হয় যেন গ্রামের কিশোরী মেয়েটি, লাল-হলুদ ডুরে শাড়ি কোমরে পেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নদীতীরে। পর মুহূর্তেই মনে হয়, এতো নিছক কল্পনা মাত্র।

অস্তায়মান সন্ধ্যার আবছা আঁধারে নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর বিচূর্ণ আলোর কারুকাজ সত্যিই বিস্ময়-জাগানিয়া। ইচ্ছে হয়, সেই ঢেউয়ের কারুকাজে একটু হাত রাখি। ছুঁয়ে দেখি আলোছায়ার বিচিত্র লুকোচুরি। ঘনায়মান সন্ধ্যার

অপরূপ রূপের মাধুর্য ধরে রাখি হৃদয়ে। কিন্তু বাস্তবে তা যে হবার নয়। রক্তিম আকাশ আর বিশাল নদীর প্রেক্ষাপটে সূর্যাস্তের বিচিত্র শোভা শুধু মনের পর্দায় চিরকালের আঁকা ছবির মতো ভাস্বর হয়ে থাকে। এক শাশ্বত অনুভূতিতে হৃদয় মন ভরে ওঠে।

ঝড়ের রাত

আমি গা-শিউরে ওঠা এক ঝড়ের রাতের কথা বলব। সে এক বিভীষিকাময় ঝড়ের রাত। সে রাতে প্রায় মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছিল আমার শিয়রে।

আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। বৈশাখ মাস সবে শুরু হয়েছে। মা-বাবাসহ বেড়াতে গেছি গ্রামে, নানার বাড়িতে। প্রচণ্ড গরম পড়ছে। আমার নানি বলেন-'কাঁঠাল পাকানো গরম।' চারিদিকে রুক্ষ-শুষ্কতা। মাটি ফেটে চৌচির। একদিন বিকেলে হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম আকাশে কালো হয়ে মেঘ জমলো। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ধাক্কা। সন্ধ্যা হতে না-হতেই সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। অজানা আশঙ্কায় সবাই তখন উদ্বিগ্ন। বাতাসের ঝাপটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।

মামা আবহাওয়ার খবর শোনার জন্য রেডিও অন করলেন। রেডিওর আওয়াজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। মামা তবু রেডিওর সাথে কান লাগিয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করছেন। আমি মামার কাছেই বসেছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাপটা এল। আর বিকট শব্দে বাড়ির দরজার আমগাছের বড় ডালটি ভেঙে পড়ল। পাশে কোথাও যেন তীব্র শব্দে বাজ পড়ল। ভয়ে আর আতঙ্কে আমার বুক দুরুদুরু।

নানিবাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। হ্যারিকেনের আলোয় সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। সবার বিছানা তৈরি হল। কিন্তু কেউ আর ঘুমুতে পারল না। রাত প্রায় দশটা হবে। প্রচণ্ড ঝড় আর শিলাবৃষ্টি শুরু হল। বাতাসের ঝাপটায় এক-একবার মনে হতে লাগল এই বুঝি পুরো ঘরটি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পশ্চিম কোণের ঘরের চাল হঠাৎ খুঁটি থেকে আলগা হয়ে গেল। ঝড়ো বাতাসে সেটা দাপাদাপি করতে লাগল। নানা কোত্থেকে একটা মোটা রশি নিয়ে খুঁটিটা বাঁধতে লেগে গেলেন। মামা ও বাবা দৌড়ে গেলেন সেখানে। অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকানোর আলোয় দেখলাম মামা আর বাবা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ঘরের চালের সঙ্গে খুঁটিটাকে বাঁধার জন্য, কিন্তু পারছেন না। খাটের ওপর আমার মা, ছোটবোন ফারহানা, নানি সবাই 'আল্লাহ্, আল্লাহ্' করতে লাগলেন।

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে আমাদের মাথার ওপর থেকে ঘরের টিন উড়ে গেল। আমার নানি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। নানির কান্নার শব্দে আমার বোন ফারহানা এবং আমার মা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। গোয়ালঘরে গরুর হাম্বা ডাক, মানুষের আর্ত চিৎকার, বাতাসের ঝাপটা—সব মিলিয়ে মনে হল যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। নানা জোরে জোরে শব্দ করে আযান দিতে লাগলেন। মামা চিৎকার করে বললেন, 'সবাই খাটের তলে আশ্রয় নাও। না হয় ঝড়ের তাণ্ডবে কোনো কিছুতে শরীরে চোট লাগতে পারে।' আমরা সবাই খাটের তলে আশ্রয় নিলাম। এভাবে কতক্ষণ ঝড় চলেছে বুঝতে পারিনি। সকালে যখন আমার হুঁশ হল তখনও আমি খাটের নিচে। চারিদিকে কাদাজল। আমি যেন কাঁদতেও ভুলে গেছি। আম্মা কোথায়, নানি-বা কোথায় গেল, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

খাটের নিচ থেকে আমি উঠে দেখলাম, ঘর কোথায়? ঘর নেই। একটা নারকেল গাছ পড়ে আছে ঘরের ওপর। টিনের একটা চালা উড়ে গেছে কোথাও। বরই গাছে ঝুলছে একটা টিন। একটা ঘুঘুপাখি মরে পড়ে আছে উঠোনে। দৌড়ে গেলাম বাড়ির দরজার দিকে। দেখি কলাগাছ, সুপারিগাছ, কড়ই গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আছে পথের ওপর। বাবা-মা, নানা-নানি, মামা সবাই সেগুলো পরিষ্কার করছে।

কালবৈশাখী ঝড়ের কথা এর আগে শুনেছিলাম। কিন্তু আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু এবার সেই অভিজ্ঞতা হল। ভাবলাম, এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যেন কারও না হয়। এর মধ্যে চার বছর চলে গেছে। কিন্তু আমার স্মৃতিতে আজও গেঁথে আছে সেই রাতের ভয়াবহতা। সে রাতের কথা মনে হলে এখনও গা শিউরে ওঠে। ঝড়ের প্রলয় তাণ্ডব, ভয়ংকর রূপ সে রাতে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। সেদিন ঝড়ের রাতে আমি বুঝেছি প্রকৃতির কোলে মানুষ কত অসহায়, কত নিঃস্ব।

জ্যোৎস্না রাতে
(সংকেত)

ভূমিকা : চন্দ্রালোকিত রাতের অপরূপ শোভা দেখা ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। ঘটনাচক্রে এক রাতে জ্যোৎস্নার রূপ-মাধুরী অবলোকন করে আমি বিস্মিত। জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের এমন অপূর্ব রূপ আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে আর কখনো অনুভব করিনি।

জ্যোৎস্নারাতের অপরূপ সৌন্দর্য : ঝিরিঝিরি বাতাস, নির্জন সন্ধ্যা। গ্রামের পথঘাটে কোথাও প্রাণের আভাস মাত্র নেই। বৌদ্ধপূর্ণিমার রাত। চাঁদ যেন তার অপূর্ব শুভ্র আলো ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীর বুকে। সমস্ত নিসর্গ যেন জ্যোৎস্নার শুভ্রতায় আত্মলীন হয়ে গেছে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় প্রকৃতির এই শোভা দেখে আমি অভিভূত। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কলি—'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে/বসন্তেরই মাতাল সমীরণে।' বনের ভেতরে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার প্রকৃতি অনুভব করা ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা।

জ্যোৎস্না ও মানুষের মন : 'আয় আয় চাঁদ মামা' বলে ছোটবেলা থেকে আমাদের সঙ্গে চাঁদের নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। চাঁদ যেন জীবনে স্নিগ্ধতার আলো ছড়ায়। কবি-সাহিত্যিকরা চাঁদকে নিয়ে লিখেছেন স্মরণীয় কত কবিতার পঙ্‌ক্তি। এভাবে চাঁদ আর জ্যোৎস্না মানবজীবনে অমলিন হয়ে আছে।

উপসংহার : জ্যোৎস্না রাতে প্রকৃতিকে খুব মায়াবী দেখায়। চারিদিকে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা, নদীতীরে দিগন্তজোড়া প্রান্তরে দাঁড়ালে যে-কোনো মানুষের মনে স্নিগ্ধতার বোধ জন্মে। আনন্দে ভরে যায় সারা মন।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
(সংকেত)

ভূমিকা : অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ। প্রকৃতি যেন আপন হাতে এ দেশকে মনের মতো করে সাজিয়েছেন। বছরের ছয়টি ঋতু পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে নব নব সৌন্দর্যে বিভূষিত করে। নদীমাতৃক এ দেশের দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ, সবুজ গাছপালা, পাখপাখালি রূপের মাধুর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতিক সৌন্দর্যের রূপ : সাগর-মেখলা, বন-কুন্তলা, শস্য-শ্যামলা এদেশের উত্তরে ভাওয়াল, মধুপুরগড়, গেরুয়া রঙের মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গাছ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, বিস্তৃত সুন্দরবন। পূর্বদিকে শ্রেণীবন্ধ পাহাড়ের সারি যেন দেহরক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সাজানো চা-বাগান, বিশাল ছায়াবৃক্ষ। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পাহাড়ি নদী। খাল-বিল, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট সব মিলে এ দেশকে বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের অধিকারী করেছে।

ঋতুবৈচিত্র্য : ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। একেক ঋতু একেক রকম ফল-ফসলের বার্তা নিয়ে আসে আমাদের দ্বারে। প্রত্যেকটি ঋতুই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্ত—ঋতু-পরিক্রমার এই রূপ মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে।

মানুষ ও প্রকৃতি : বাংলাদেশের সবুজ নিসর্গ আর বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি এ দেশের মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ধর্ম-বর্ণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের মানুষ এক অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে পাশাপাশি বাস করে। সহজ সরল অথচ প্রকৃতির বিরূপ বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করার অসীম সাহস ও শক্তি আছে এ দেশের মানুষের মনে।

উপসংহার : প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি বাংলাদেশকে 'রূপসী বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করা হয়।

নৌকায় ভ্রমণের একটি অভিজ্ঞতা

ভূমিকা : আমি শহরেই জন্মেছি। বড় হয়েছি এই শহরেই। যদিও আমাদের গ্রামের বাড়ি আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে। ছোটবেলায় মা আমাকে নিয়ে একবার নানার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেটা আমার স্মৃতিতে থাকার কথা নয়। বাসে, ট্রেনে ভ্রমণের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, কিন্তু নৌকাভ্রমণের কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। সেই সুযোগও একদিন এসে গেল। আমার ছোটমামার বিয়ে উপলক্ষে নৌকাযোগে গ্রামের বাড়িতে গেলাম। সপরিবারে যাচ্ছি বলে বড়মামা একটা বালাম নৌকা ঠিক করে রেখেছিলেন আগের দিন।

যাত্রার বিবরণ : খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি মা সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছেন। ছোটবোন ফারহানাও তার লাল জামাটা পরে প্রস্তুত। বড়মামা কাপড়ের ব্যাগ, টিফিন কেরিয়ার ইত্যাদি গুছিয়ে ফেলেছেন। বাবা অফিস থেকে ছুটি পাননি বলে আমাদের সাথে যেতে পারছেন না।

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা নৌকায় গিয়ে উঠলাম। প্রথমদিকে মায়ের কড়া শাসনে আমি চুপচাপ ছইয়ের মধ্যে বসে থাকলাম। কারণ আমি তো সাঁতার জানি না। কিছুটা ভয়ও লাগছে। তবে শরতের নদী বলে বেশ শান্ত। ছোট ছোট ঢেউয়ে নৌকা দুলছিল। শুয়ে শুয়ে ছইয়ের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ দেখতে থাকলাম। শরতের আকাশ যে এত নীল হয়, তা আজই আমি প্রথম অনুভব করলাম। সাদা সাদা তুলোর মতো হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। দূরে উড়ে যাচ্ছে গাঙচিল, মাছরাঙা, বকের সারি। মাঝে মাঝে ভট ভট শব্দ করে ঢেউ তুলে ছুটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে লঞ্চ, স্পিডবোট। বড়মামা টু-ইন-ওয়ানে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান শুনছেন— 'মরমিয়া তুমি চলে গেলে, দরদিয়া আমার...।' বড়ই দরদ দিয়ে গাওয়া গানের সুর আমাকেও ক্ষণিকের জন্য তন্ময় করে ফেলেছে।

ফারহানা মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে হাত ডুবিয়ে দিচ্ছে নদীর পানিতে। আমারও ইচ্ছে হচ্ছে নদীর পানিতে হাত ডুবিয়ে খেলা করতে। কিন্তু মাকে বলতেই মা প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন। আমাকে ধমক দিতে দেখে মামা মহাকৌতুকে হেসে উঠলেন। আমি ভীষণ লজ্জা পেলাম। মা মনে করে আমি এখনো ছোট্টটি রয়ে গেছি।

নৌকার মাঝি চারজন। বেশ দক্ষ মাঝি বোঝা যায়। খালি গা, কোমরে গামছা বাঁধা। মাথায় একটা পুরনো কাপড় পেঁচানো। নৌকাখানাও বেশ দশাসই। দুইপাশে চ্যাপটা গলুই। মাঝখানে ছবির মতো ছই উঠানো। কাঠের পাটাতনের ওপর হোগলা বিছানো, তার ওপর একটা পাতলা কাঁথা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে একাধিক বালিশ পাতা আছে। একপাশে একটা মাটির চুলা। সম্ভবত মাঝিরা এখানে রান্না করে খায়। নৌকা তখন মাঝনদীতে। কুলুকুলু ঢেউ, ছলাৎ ছলাৎ শব্দে গলা মিলিয়ে গান ধরল মাঝি—

আমি গহিন গাঙের নাইয়া, আমি গহিন গাঙের নাইয়া
আমি এপার হতে ওপারে যাই বাইয়া রে আমি,...

আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন ছায়াছবির কোনো দৃশ্য দেখছি। ততক্ষণে পালে হাওয়া লেগেছে। দূরে ছোট ছোট, দোকানপাট, হাট-বাজার, দালান-ঘর, বাড়ি, গাছপালা দেখতে পেলাম। পেছনে আবছা ছায়ার মতো দিগন্ত। নদীর ঘাটে কেউ কাপড় ধুচ্ছে, মেয়েরা ঘোমটা মাথায় থালাবাসন মাজছে, কেউ-বা শিশুকে গোসল করাচ্ছে, ভরা কলসি কাঁখে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গ্রাম্য বধূ। কিশোর দামাল ছেলেরা নদীর ঘোলা জলে লাফালাফি করছে, কেউ-বা সাঁতার কাটছে। জেলেরা জাল বাইছে। কেউ গরু গোসল করাচ্ছে নদীর জলে। এক জায়গায় দেখলাম একসাথে অনেকগুলো সারিবাঁধা নৌকা। কোনো কোনো নৌকা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ছইয়ের ওপর রোদে দেওয়া শাড়ি। বড়মামা বললেন, ওগুলো বেদের নৌকার বহর।

বেলা তিনটার দিকে আমরা তালতলির ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। তালতলির বাজারটা ঘুরে দেখা আমার খুব শখ। তালতলির বাজারে একটা ভাঙাচোরা চায়ের স্টলে চা খেলাম। গরুর খাঁটি দুধের চা। আমার কাছে অমৃতের মতো লেগেছে।

এখান থেকে আমাদের নৌকা ধলেশ্বরী হয়ে একটা ছোট খালে প্রবেশ করল। দুপাশে শান্ত সুন্দর বাড়িঘর। মাঝে মাঝে বর্ষার পানিতে ভেসে থাকা সবুজ ধানখেত, কচুরিপানার রঙিন ফুল আর জলজ উদ্ভিদের মদির গন্ধ, পানকৌড়ি আর ডাহুকের ডাক, ভেসে বেড়ানো হাঁসের দল, কাশফুলের শুভ্র হাতছানি সব মিলে বাংলার অপরূপ রূপ দেখে আমি মুগ্ধ। মনে মনে বললাম 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' সার্থক আমার নৌকা ভ্রমণ।

রেলভ্রমণের একটি অভিজ্ঞতা

(সংকেত)

ভূমিকা : বাসভ্রমণের অনেক অভিজ্ঞতা থাকলেও রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ছোটবেলা থেকেই রেলে ভ্রমণের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতা জন্মেছে কবি শামসুর রাহমানের সেই ছড়াটি পড়ে-

'ঝক্ ঝক্ ঝক্ ট্রেন চলেছে রাত দুপুরে অই।
ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে, ট্রেনের বাড়ি কই?'

কল্পনার কান পাতলেই যেন শুনতে পেতাম তীব্র হুইসেল বাজিয়ে ঝিকঝিক্ শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে ট্রেন। একদিন সেই স্বপ্নের রেলভ্রমণের সুযোগও এসে গেল। বড়মামার বিয়ে। ঢাকায় বিয়ে হচ্ছে। বড়মামার বিয়ে উপলক্ষে আমরা সপরিবারে ঢাকায় যাব ট্রেনে।

যাত্রার বিবরণ : সকাল সাড়ে সাতটায় 'উর্মি অরুণা' করে আমরা চট্টগ্রাম থেকে রওনা হলাম। নির্দিষ্ট সময় হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন হেলেদুলে চলতে শুরু করল। বাবা বললেন, 'একটু ধৈর্য ধর,' পাহাড়তলি স্টেশন পেরুলেই গতি বাড়বে। সত্যি তাই, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, মাঠ-ঘাট, গাছপালা, গ্রাম, বাড়িঘর বন কেমন সাঁই সাঁই করে ছুটে যাচ্ছে। ইলেকট্রিকের থাম, টেলিফোন খাম্বা দ্রুত যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমার খুব মজা লাগছে।

রেলপথের নানা দৃশ্য : ট্রেনের যাত্রীরা কেউ ঝিমোচ্ছে, কেউ কথা বলছে, কেউ আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে। এর মধ্যে বাদামওয়ালা 'বা-দা-ম, বা-দা-ম' বলে হেঁকে গেল। একটা চা-ওয়ালা বিশেষ ভঙ্গিতে বলছে 'চা-গরম্, চা-গরম'। আর ট্রেন চলছে ছন্দ তুলে।

উপসংহার : বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে এসে ট্রেন থামলে আমার রেলভ্রমণ শেষ হয়। পথে ভিক্ষুক, ফেরিওয়ালার হাঁক-ডাক, যাত্রীদের নানা ক্রিয়াকাণ্ড দেখতে দেখতে আমার রেলভ্রমণের সময়টা বেশ আনন্দে কেটেছে।

আমার জীবনের লক্ষ্য

ভূমিকা : মহাকালের তুলনায় মানবজীবন খুবই ছোট। এই ছোট মানবজীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। লক্ষ্যহীন জীবন হালবিহীন নৌকার মতো। হালবিহীন জীবন সময়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়ে যায়। তাই জীবনের শুরুতে একটা লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া উচিত। লক্ষ্য ঠিক রেখে শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা নিয়ে অগ্রসর হলে জীবনের সে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজনীয়তা : আমি খুব ছোটবেলা থেকেই জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভেবেছি। তখন আমার বয়স ছিল কম। মন ছিল চঞ্চল। চারিদিকে তাকিয়ে যা দেখতাম, তাতেই রোমাঞ্চিত হতাম। আকাশে গর্জন করে বিমান উড়ে যেতে দেখে ভাবতাম, আমি পাইলট হব। স্কুলের বইতে বিজ্ঞানী নিউটন, আলভা এডিসন বা গ্যালিলিওর চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী পড়ে ভাবতাম, আমি একদিন বিজ্ঞানী হব। রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের কবিতা পড়ে ভেবেছি, আমি একদিন তাঁদের মতো জগৎবিখ্যাত লেখক হব। একটু বড় হওয়ার পর যখন জ্ঞান-বুদ্ধি একটু

বেড়েছে, তখন বুঝতে পেরেছি, ইচ্ছে করলেই যা-কিছু হওয়া যায় না। তাই আমি অনেক ভেবেচিন্তে আমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছি— বড় হয়ে আমি একজন ডাক্তার হব। আমার এ লক্ষ্য নির্ধারণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানবসেবা।

ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার কারণ : আমাদের দেশে চিকিৎসাসেবা এখন সীমিত ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। দেশের বিপুল জনসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। গ্রামের কৃষক ও সাধারণ মানুষ এখন ভালো চিকিৎসাসেবা পায় না। বড় বড় অনেক চিকিৎসকের মধ্যে এখন ব্যবসায়িক মানসিকতা ঢুকে পড়েছে। এ অবস্থা বদলানো দরকার। এ জন্য চাই নিবেদিত-প্রাণ চিকিৎসক। তাই আমি ভালো ডাক্তার হতে চাই।

জীবনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা : আমি আমার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য এখনই তৈরি হচ্ছি। অঙ্ক ও বিজ্ঞানের প্রতি আমার বরাবরই আকর্ষণ বেশি। স্কুলের নির্ধারিত পড়া ছাড়াও অবসর পেলে আমি বিজ্ঞানের বই পড়ি, অঙ্ক কষি। প্রকৃতির রহস্যে আমি বিস্মিত হই। নানা আবিষ্কারের কাহিনী পড়ে আমি খুব মজা পাই। তাই নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগই বেছে নিয়েছি। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে কলেজে গিয়েও আমি বিজ্ঞান পড়ব। তখন জীববিদ্যা আমার অন্যতম বিষয় থাকবে। আশা করি, নিয়মিত লেখাপড়া করতে পারলে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পাব। মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে-কোনো একটি শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার আশা পোষণ করি।

জনসেবা ও কর্মজীবন : একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে আমি কর্মজীবন শুরু করতে চাই। সরকারি চাকরি গ্রহণ না করে স্বাধীনভাবে রোগী দেখব। এ জন্য আমি গ্রামের অর্থাৎ উপজেলা পর্যায়ের স্থানকে বেছে নেব। অধিক অর্থোপার্জনের জন্য শহরই উপযুক্ত স্থান, কিন্তু আমার অর্থের প্রতি কোনো লোভ নেই। শহরের ভালো ডাক্তার গ্রামে থাকতে চায় না। ফলে জটিল রোগের জন্য গ্রামের মানুষদের শহরে আসতে হয়। অথচ গরিব গ্রামের লোকদের সেই আর্থিক সংগতি থাকে না। আর্থিক অসুবিধার কারণে কত লোক বিনা-চিকিৎসায় মারা যায়। আমি গ্রামের সেইসব হতদরিদ্র জনগণের সেবা করতে চাই। তাদের জন্য বিনা-ফীতে চিকিৎসা সেবার সুযোগ থাকবে। ধনিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফী আদায় করব। আমার ইচ্ছা, গ্রামের মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার একটি পদ্ধতিগত মডেল তৈরি করা। যাতে চিকিৎসাসেবাবঞ্চিত গ্রামের মানুষরা উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা পায়।

উপসংহার : ডাক্তারি শুধু একটি পেশা নয়, একই সঙ্গে মানবসেবার মহৎ সুযোগও আছে এ পেশায়। উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, ম্যাজিস্ট্রেট—এসব বর্ণাঢ্য পেশার চাইতে ডাক্তারি পেশা সম্পূর্ণ আলাদা। ডাক্তারি পেশায় অর্থোপার্জন হয় আবার মানবসেবার প্রত্যক্ষ সুযোগও এ পেশাতে রয়েছে। তাই আমি সবদিক বিবেচনা করে একজন ডাক্তারই হতে চাই। এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য।

আমার শৈশবস্মৃতি

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।'

জীবন যে এত মধুর, পৃথিবী যে এত সুন্দর তা একমাত্র শৈশবের চোখ দিয়ে না দেখলে বোঝা যায় না। জীবনে যা কিছু সুন্দর, সুখকর, তা আমি দেখেছি শৈশবের জানালায় উঁকি দিয়ে। মুগ্ধ হওয়ার এক সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে আমি জন্মেছি বলেই হয়তো যা-কিছু দেখতাম, তাতেই ছিল বিস্ময়। জোনাক-জ্বলা রাত্রি, বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ, নারকেলের চিরল পাতায় বাতাসের ঝিরিঝিরি, রূপকথার গল্পের সেই সুয়োরানী-দুয়োরানী, পাতালপুরীর রাজকন্যার দুঃখ সবই শৈশবের স্মৃতির পাতায় রঙিন হয়ে আছে। জীবন এগিয়ে চলছে, আমি বড় হচ্ছি, কিন্তু শৈশবের সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে হলে আমি থমকে দাঁড়াই। আমার হৃদয় ভেঙে কান্না আসে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না শৈশবের খেলার মাঠে ফেলে আসা রঙিন বেলুনের কথা। ঘুড়ি ওড়ানো বিকেলবেলার স্মৃতি।

আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে গ্রামে। বাবা চাকরিসূত্রে থাকতেন শহরে। বাড়িতে দাদি, চাচা, ফুফু ভাইবোন,

আত্মীয়স্বজনের কলকাকলিতে মুখর ছিল আমাদের বাড়ি। আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি গাছে ছায়াসুনিবিড় ছিল গ্রামের বাড়িটি। আমি ছিলাম পরিবারের সকলের আদরের। বিশেষত, আমার দাদি আমাকে খুবই আদর করতেন। প্রতি রাতে তিনি আমাকে রূপকথার গল্প বলে ঘুম পাড়াতেন। আর সেই গল্পকে বাস্তব মনে করে আমি কল্পনায় পাখা মেলে ঘুমের মধ্যে হয়ে যেতাম দিগ্বিজয়ী রাজপুত্তুর। পঙ্খিরাজের ঘোড়ায় চড়ে, কোমরে বাঁধা তলোয়ার নিয়ে স্বপ্নে আমি ছুটে চলছি সেই অপরূপ দেশে। আমার দাদি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, মিষ্টিভাষী এবং আমার খুব প্রিয়।

চার বছর বয়স পর্যন্ত আমার কিছুই মনে পড়ে না। পাঁচ বছর বয়সে আমাকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করানো হয়। মা আমাকে বর্ণমালা লেখা শেখাতেন। শহর থেকে আব্বা বাড়ি আসার সময় আমার জন্য আনতেন ছোট্ট উপহার। কলমের বাক্স, স্কুলের ব্যাগ, রঙিন পেন্সিল। সেইসব উপহার পেয়ে আমি যে কী খুশি হতাম! সেই আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বাড়ির কাছেই ছিল আমাদের স্কুল। পাড়ার সমবয়সী আমরা একসঙ্গে স্কুলে যেতাম। বাড়ি থেকে স্কুল খুব দূরে ছিল না। হেঁটেই স্কুলে যেতে হত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে স্কুলে যাওয়ার পথটি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠত। স্কুলের দীর্ঘ বারান্দায় ঝুলানো পেতলের ঘণ্টায় বুড়ো দপ্তরিকাকা যখন ঘণ্টা বাজাতো, সেই দৃশ্যটি ছিল দেখার মতো।

স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। দুপুরবেলা তীব্র হুইসেল বাজিয়ে চলে যেত দুরন্ত ট্রেন। ট্রেনের জানালায় দেখা যেত কত উৎসুক অপরিচিত মুখ। ঝিক্‌ঝাক্ ট্রেনের সেই শব্দ আজো আমার কানে বাজে। কখনো বিকেলে আমরা রেললাইনে বেড়াতে যেতাম। রেললাইনের দুপাশে প্রচুর বরই গাছ। আমরা পাকা পাকা বরই পেড়ে খেতাম। বিকেলে স্কুলের মাঠে পাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলত। কখনো মাঠের পাশে বসে ফুটবল খেলা উপভোগ করতাম। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের দুর্গা, অপুর মতো কাশবনে লুকোচুরি খেলতাম। খালের পানিতে ভেসে থাকা কচুরিপানার বেগুনি ফুলকে মনে হত পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুল। ঝাড়বাতির মতো এক-একটা ফুল আমাকে কী যে আকর্ষণ করত। কত তুচ্ছ, নগণ্য জিনিস আমার কাছে মহামূল্যবান মনে হত।

মায়ের কাছ থেকে আবদার করে একটা টিনের বাক্স নিয়েছিলাম। তাতে পরম যত্নে লুকিয়ে রাখা আছে আমার নানা সংগ্রহ। আমাদের পুরোনো রেডিও, বাবার পুরোনো ঘড়ি, একটা সুন্দর পাইলট কলম, একটা রেকর্ডপ্লেয়ার। এখন আর এসবের চল্ নেই। কিন্তু বাক্স খুলে ওগুলো বের করলেই পুরোনো দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে।

শৈশবকে আমি খেলার মাঠে গ্রামের বাড়িতে আর গ্রামের স্কুলঘরে ফেলে এসেছি। সেই স্বপ্নময়, সুখকর স্মৃতি, মধুর দিনগুলি মনের পাতায় বারবার অনুরণন তোলে। যতই বড় হচ্ছি ততই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছি। ততই মনে হচ্ছে, আহ্ শৈশবে কতো আনন্দেই না ছিলাম! কে আমায় ফিরিয়ে দেবে সেই দিনগুলি!

আমার প্রিয় কবি

ভূমিকা : যাঁর কবিতা আমাকে অভিভূত করে, যাঁর কবিতা পড়ে আমি আপ্লুত হই, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যে ধূমকেতুর মতো তাঁর আবির্ভাব। অন্যায়-অবিচার, জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে প্রচণ্ড বিদ্রোহ। তিনিই শুনিয়ে ছিলেন সংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা। জাতিকে দেখিয়ে ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন। এই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামই আমার প্রিয় কবি। এ কবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে কৈশোরে পড়া একটি কবিতার মাধ্যমে—

‘আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি।’

কেন প্রিয় কবি : ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর দেখলাম, আমাদের স্কুলে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে এক আবৃত্তিকারের উচ্চারণে তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতার আবৃত্তি শুনে আমি মুগ্ধ, অভিভূত। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার

সব কথা তখন বুঝিনি। কিন্তু যে কথাগুলো তখন বুঝেছিলাম তার সবগুলো কথাই যেন আমার মনের কথা। কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে এর প্রতিটি শব্দ এবং পঙ্‌ক্তির সাথে সেদিন আমি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।

গ্রীষ্মের ছুটিতে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, আমার ছোটমামার সংগ্রহে 'নজরুল রচনাবলি' রয়েছে। ছোটমামারও প্রিয় কবি নজরুল। ছোটমামা আমাকে নজরুলের জীবনের অনেক কথা শোনালেন। আবৃত্তি করে শোনালেন নজরুলের কবিতা। 'খুকু ও কাঠবিড়ালী', 'লিচু চোর', 'খোকার সাধ', 'কুলি ও মজুর', 'সাম্যবাদী' প্রভৃতি কবিতা। এভাবে আমার মনের মণিকোঠায় নজরুল হয়ে ওঠেন প্রিয় কবি। আরো একটু বড় হয়ে আমি নজরুলের আরো কবিতা ও গান শুনেছি। 'সংকল্প' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

'থাকব না ক বন্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।'

এ যেন আমার কিশোরমনের কথা। আমারো মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই সীমাবদ্ধ গণ্ডিটা থেকে বেরিয়ে জগৎটাকে ঘুরেফিরে একটু দেখি। তাই আমি নজরুলকেই প্রিয় কবির আসনে বসিয়ে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। নজরুল ঘুণেধরা সমাজটাকে ভেঙেচুরে নতুন সমাজ গড়ার কথা বলেছেন। নজরুল আমার কাছে তাই,

'বাবরি দোলানো মহান পুরুষ

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা,'

নজরুলের জীবনালেখ্য : কবি নজরুলের ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুবই বৈচিত্র্যময়। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জায়েদা খাতুন। গ্রামের মক্তবেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাল্যকাল থেকে নজরুল কিছুটা খেয়ালি, বেপরোয়া, দুরন্ত ছিলেন। লেখাপড়া বাদ দিয়ে একসময় যোগ দেন গ্রামের লেটোর দলে। মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে আসানসোলের এক রুটির দোকানে কাজ করেন। আসানসোলের তৎকালীন পুলিশের দারোগা রফিজউদ্দিন বালক নজরুলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ময়মনসিংহে এনে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তিন বছর পর নজরুল সেখান থেকে পালিয়ে যান। শিয়ারশোল স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। নজরুল পড়ালেখা অসমাপ্ত রেখে বাঙালি পল্টনে গিয়ে সৈনিকের খাতায় নাম লেখান। কর্মদক্ষতার গুণে অল্পদিনের মধ্যে তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হন।

সৈনিক থাকা অবস্থায় করাচি থেকে তিনি কলকাতার পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে পত্রিকা সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'। এই কবিতাই নজরুলকে রাতারাতি খ্যাতির চূড়ায় পৌছে দেয়। তিনি হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী কবি। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ, গীতিগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'সাম্যবাদী', 'দোলন চাঁপা', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'সর্বহারা'। তিনি ছোটদের জন্যও অনেক লিখেছেন। 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'পুতুলের বিয়ে' তাঁর শিশুতোষ রচনা।

নজরুল ছিলেন ঔপনিবেশিক আমলের কবি। তাই ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কবিতা লেখার অপরাধে তিনি জেলে গেছেন। তবু তিনি পিছপা হননি, সত্য-সুন্দর-ন্যায়ের কথা বলেছেন, জাতিকে শুনিয়েছেন মুক্তির গান—

'প্রার্থনা কর যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।'

নজরুল এভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। জাতিকে দেখান তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন। ১৯৪২ সালে নজরুল হঠাৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নির্বাক হয়ে পড়েন। তারপর দীর্ঘ তেত্রিশ বছর নজরুল নির্বাকই ছিলেন। ১৯৭৬ সালে ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

উপসংহার : নজরুল সাম্যের কবি, সুন্দরের কবি। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য'— এ কেবল নজরুলের পক্ষেই বলা সম্ভব। কারণ, তিনি নিপীড়িত-লাঞ্ছিত মানুষের কথা ভেবেছেন। পরাধীন জাতির মুক্তির কথা বলেছেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে একমাত্র নজরুলই কবিতা লেখার অপরাধে জেল খেটেছেন। নজরুল ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। তাই বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দিয়েছে আমাদের 'জাতীয় কবি'র মর্যাদা। মহান এই কবিই আমার প্রিয় কবি।

একটি কলমের আত্মকথা

আমি একটি ছোট্ট কলম। এতকাল আমি অন্যের কথা বলেছি। লিখেছি তাদের সুখের কথা, দুঃখের কাহিনী। উত্তর লিখেছি ছাত্রের পরীক্ষার খাতায়। ডাক্তার, উকিল, মাস্টার, কেরানি, জজ-ব্যারিস্টার আমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন কত বিচিত্র বিষয়ে। গল্প, কবিতা লিখিয়েছেন কেউ বা আমাকে দিয়ে। আমি সারাটা জীবন মানুষের মনের কথা লিখলাম কিন্তু কেউ আমার কথা লিখল না। আমি নিতান্তই ভাষাহীন। তবু আমারও তো জীবন বলে একটা কিছু আছে।

কলম হলেও আমার জন্মের একটি ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস খুব গৌরবের নয়। কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতা বিকাশে আমার বংশের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রবাদে আছে, 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো'। আমার কর্মের গুণেই আজ আমি মানুষের নিত্যসঙ্গী। আমাকে ছাড়া শিক্ষিত, সভ্য মানুষের একমুহূর্তও চলে না। আমার এই অনিবার্য ভূমিকার কথা বলছি বলে, কেউ মনে করবেন না যে, আমি নিজের মূল্য ও মর্যাদার কথা বাড়িয়ে বলছি। এতদিন মানুষ আমাকে দিয়ে নিজের মনের কথা লিখেছে। আমার কথা ভুলেও কেউ মনে করেনি। গান শেষে বীণা যেমন পড়ে থাকে মাটিতে অনাদরে, তেমনি অবস্থার শিকার আমিও। সবাই আমাকে কাজেই লাগিয়েছে কেউ আমাকে নিয়ে ভাবেনি। আমার কথা কারো মুখে আসেনি। তাই আজ আমি নিজেই আমার কথা বলব। মন খুলে বলব। হৃদয় উজাড় করে বলব আমার জীবনকথা।

আমি ছিলাম একটা দোকানের শো-কেসের ভেতরে। লাল একটা সুন্দর প্লাস্টিকের বাক্সে। অনেকদিন পড়েছিলাম এ অবস্থায়। একদিন সুবেশধারী এক ভদ্রলোক আমাকে তুলে নিলেন। পছন্দ হতেই কিনে নিলেন। আমাকে বাক্সসহ রেখে দিলেন ব্যাগে। বাড়িতে এসে তিনি বড়ছেলেকে উপহার হিসেবে দিলেন। ছেলেটি আমাকে পেয়ে খুব খুশি হল। পার্কার কলম, অনেক দামি। দেখতেও খুব সুন্দর। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'খোকা, সামনে তোমার পরীক্ষা। ভালো কলম দিয়ে লিখলে তোমার পরীক্ষা ভালো হবে।' এভাবে আমি ছেলেটির ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম।

পরদিন খোকা আমাকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে তার বন্ধুদের দেখালো। সবাই আমাকে নেড়েচেড়ে দেখল। বলল, 'বেশ দামি কলম, দেখতেও কী সুন্দর! খোকা আমাকে খুব যত্নে বুকপকেটে আটকে রেখে রোজ স্কুলে যায়। কতরকম লেখা লেখে। গদ্য-পদ্য প্রশ্নের উত্তর। ইংরেজি, বাংলা, কখনো অঙ্ক বা জ্যামিতি। এভাবে লিখতে লিখতে আমার প্রতি খোকার বেশ মায়া জন্মে গেল। একদিন ক্লাসের এক শিক্ষকও আমাকে ধরে নেড়েচেড়ে লিখে দেখে বেশ প্রশংসা করলেন। খোকাকে বললেন, 'সাবধানে রেখো, যেন হারিয়ে না যায়।'

ইতোমধ্যে আমার প্রতি অনেকের নজর পড়ল। একদিন টিফিন পিরিয়ডে খোকা আমাকে ভুলে টেবিলে রেখে পানি খেতে গেছে। এমন সময় একটি দুষ্ট ছেলে আমাকে নিয়ে গেল। লুকিয়ে ফেলল তার প্যান্টের পকেটে। আমাকে হারিয়ে খোকার মন খারাপ হয়ে গেল। অস্থির হয়ে সে ক্লাসের আনাচে কানাচে, বন্ধুদের কাছে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। তারপর তার কলম হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা স্যারকে জানালো। স্যার ক্লাসে কলম হারানোর ঘটনায় বেশ রেগে

গেলেন। এতে দুষ্ট ছেলেটি খুব ভয় পেয়ে গেল। সবার অজান্তে সে আমাকে নিচে ফেলে পা দিয়ে আস্তে ঠেলে দিল খোকার পায়ের দিকে। আমি খোকার পায়ের কাছে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে থাকলাম। মনে মনে বললাম, 'খোকা, এইতো আমি, আমাকে কুড়িয়ে তুলে নাও।' কিন্তু আমার কথা তো খোকার কানে যায় না। একসময় খোকার পায়ের সাথে লাগতেই সে নিচু হয়ে আমাকে তুলে নিল। আনন্দে সে বলে উঠল, 'স্যার, এইতো আমার কলম।' দুষ্ট ছেলেটি সাথে সাথে বলে উঠল, 'স্যার, খোকা নিজেই কলম লুকিয়ে শুধু শুধু আমাদের বকা শুনিয়েছে। খোকা তখন থতমত খেয়ে, আমতা আমতা করতে লাগল। খোকার অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হল।

খোকার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খোকার মা বাজারের লিস্ট লেখেন আমাকে দিয়ে। বড়বোন রুমানা কখনো আমাকে দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখে। এভাবে বছর গড়িয়ে খোকার এস.এস.সি পরীক্ষা এলো। খোকা আমাকে দিয়ে একে একে তার সমস্ত পরীক্ষার উত্তর লিখল। তারপর আমি বেশ কিছুদিন খোকার টেবিলে অলস পড়ে থাকলাম। খোকার পড়ালেখা নেই, আমার ব্যবহারও তাই বন্ধ।

এস.এস.সি. পরীক্ষায় খোকা খুব ভালো ফল করল। পুরো স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়েছে খোকা। সবাই আনন্দে আত্মহারা। রুমানা বলল 'খোকা, এটা তোর লাকি পেন। তোর সাফল্যের কিছু কৃতিত্ব এই কলমটাকে দেওয়া উচিত।' শুনে আমার কী যে আনন্দ হল।

একদিন বিকেলে খোকার মা চিঠি লেখার জন্য আমাকে চেয়ে নিয়ে গেলেন। চিঠি লেখার পর তিনি আমাকে রেখে দিলেন টেবিলের উপর। খোকার তিন বছরের ছোটবোন আমাকে হাতড়ে নিয়ে প্রথমে মুখে দিল। ঢাকনাটা খুলে ফেলে দিল একদিকে। তারপর ঘরের পাকা মেঝেতে ইচ্ছেমতো ঘষল। আমার লেখার নিব ভোঁতা হয়ে দুমড়ে মুচড়ে গেল। শুধু তাই নয়, একসময় সে মুখে পুরে শক্ত দাঁতে কামড় দিয়ে ভেঙে ফেলল আমার দেহখানি। আমি খুব ব্যথা পেয়েছি। আমাকে এভাবে ভেঙে ফেলতে খোকার বুক যেন চুরমার হয়ে গেল। আমার এরকম পরিণতিতে খোকা কেঁদে ফেলল।

এখন আমি খোকাদের ময়লা ফেলার ঝুড়িতে পড়ে আছি। আমার শরীরের বিভিন্ন অংশ টুকরো টুকরো অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঢাকনাটা অবশ্য এখনো খাটের পায়ার কাছে। কিছুক্ষণ পর হয়তো কাজের মেয়েটা অন্য ময়লার সাথে আমাকেও ফেলে আসবে রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে। এভাবে আমার মূল্যবান জীবনের অবসান হবে। তবু, বলতে পারি আমার জীবন ব্যর্থ হয়নি। তিন বছরের বেশি সময় ধরে আমি মানুষের ভালোবাসা, মায়া-মমতা পেয়েছি। পেয়েছি 'লাকি পেন' হওয়ার সম্মান। আমি খোকার বুকপকেটে নিত্যসঙ্গী হয়ে ছিলাম। আমার দুঃখে একটি মানুষ যে চোখের জল ফেলেছে এতেই আমি ধন্য।

একজন ফেরিওয়ালার আত্মকথা

আমি একজন ফেরিওয়ালা। মা-বাবার দেওয়া একটা নাম অবশ্য আছে। কিন্তু সে নামে আমাকে এখন কেউ ডাকে না। ডাকে 'ও ফেরিওয়ালা।' বাড়ি-ঘর, জোত-জমি একদিন সবই আমার ছিল। কিন্তু আজ সবই গ্রাস করেছে সর্বনাশা পদ্মানদী। ঘরবাড়ি পদ্মায় তলিয়ে যাওয়ার পর পেটের দায়ে ঢাকা শহরে এসে হয়ে গেছি ফেরিওয়ালা। ঢাকা শহরের অলিগলি, বস্তি, আবাসিক এলাকা, পাকাসড়ক, ফুটপাতে আমাকে দেখতে পাবেন। আমি আজমত আলী, হয়ে গেছি ঢাকা শহরের এক অপরিহার্য চরিত্র—ফেরিওয়ালা।

প্রথমদিকে আমি তরিতরকারি বেচতাম। শেষরাতে কাওরানবাজার পাইকারি সবজি আড়তে গিয়ে দুই খাঁচি নানা পদের সবজি নিতাম। দুইপাশে দুই খাঁচি ঝুলিয়ে কাঁধে করে হাঁটতে হাঁটতে ডাকতাম- 'হেই লালশাক, কলমিশাক, মিষ্টি কুমড়া, আলু, পটল লাগব...নি-বে-ন।' আমার ডাক শুনে গৃহিণীরা ছুটে এসে ভিড় করত আমার খাঁচির পাশে। নেড়েচেড়ে দেখত, দরদাম করত। পছন্দ হলে আড়াইশ' গ্রাম, আধাকেজি, এককেজি সবজি অথবা একমুঠি পাটশাক কিংবা দুই টাকার কাঁচামরিচ কিনত। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া, এক বস্তি থেকে অন্য বস্তি, আবাসিক এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে দুপুর নাগাদ আমার খাঁচির সব সবজি বেচা শেষ হয়ে যেত। বেচা-কেনা খারাপ ছিল না কিন্তু লাভ হত

কম। মালের পড়তা সবদিন ঠিক পড়ত না। তা ছাড়া কাঁচামালে বাগড়া যেত বেশি। তাই দুই বছর সবজির কারবার করার পর ছেড়ে দিলাম।

আমাদের বস্তির মনির বাপ বলল, কাপড়ের ব্যবসায় পড়তা ভালো। বুঝে-শুনে একসময় কাপড়ের ব্যবসায় নেমে পড়লাম। বেডশিট, বালিশের কাভার, ব্লাউজের কাপড়, ওড়না, সেলোয়ার-কামিজের পিস ইত্যাদি নানারকম কাপড়ের বিরাট একটা গাঁটরি কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাজখাঁই গলায় ডাকতাম— 'লাগব... বেডশিট, বালিশের কভার, থ্রি পিস, ব্লাউজের কাপড় আছে...।' আমার ডাকশুনে বৌ-ঝি, কিশোরী-তরুণী ঘিরে ফেলত। তারপর হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে কাপড়ের রং, প্রিন্ট, কাপড়ের গুণাগুণ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করত। হাসি হাসি মুখে আমি তাদের প্রশ্নের জবাব দিতাম। বিরক্ত হলে এ ব্যবসা করা যায় না। ফেরি করে কাপড় বিক্রির ব্যবসা খারাপ ছিল না। কিন্তু কাঁধে করে এত বড় বোঝা নিয়ে বয়ে বেড়ানো বেশিদিন সহ্য করতে পারিনি।

এখন আমি ঠেলাগাড়ি করে হরেকরকম জিনিসের ফেরি করি। থাকি মিরপুর বস্তিতে। আমার বৌ বাসায় বাসায় ছুটা কাজ করে। দুই বছরের একটা ছেলে আছে। মা'র সঙ্গেই থাকে। আমি সারাদিন গলি থেকে গলি, রাস্তা থেকে রাজপথ পেরিয়ে নানা পদের জিনিস বিক্রি করি।

আমার স্বল্প পুঁজির স্বাধীন ব্যবসা। আমাকে খেয়াল রাখতে হয় মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রতি। মানুষের প্রয়োজন নিয়েই আমার ব্যবসা। আমার কাছে পাওয়া যায় হাঁড়িপাতিল, বাসনকোসন, তৈজসপত্র, প্রসাধনী, মাথার তেল, হরেক রকম খেলনা, চুলের ফিতা, ক্লিপ, নেলপালিশ, জুতার কালি, টুথব্রাশ, ছাইদানি সংসারের টুকিটাকি সবকিছু।

গলির মুখে, বাসার পাশে গিয়ে হাঁক দিলেই বেরিয়ে আসে ঘরের বৌ, শিশু, কিশোরী, তরুণী। নিজের চোখে দেখে তারা জিনিস নির্বাচন করে। তারপর দরদাম করে। আমি কাস্টমারের মন বুঝে দাম বলি। পছন্দ হলে মানুষ দুই টাকা বেশি দিয়ে হলেও জিনিস কেনে। সংসারের দরকারি জিনিসপত্র পুরুষদের চেয়ে গৃহিণীরাই ভালো চেনে। আমার কাছ থেকে সহজে পছন্দের জিনিসটি কিনে নেয়। সারাদিন কাটে রাস্তায়। মিরপুর, কল্যাণপুর, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, মহাখালী, নাখালপাড়া, ফার্মগেট—কত রাস্তায় রোদেপুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আমি হাঁটি।

ঢাকা শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটার কি উপায় আছে? মানুষে গিজগিজ করছে। তা ছাড়া পুলিশ, চাঁদাবাজ, টাউট, বাটপাড়দের বখরা দিয়ে আমাদের মতো ফেরিওয়ালাদের ব্যবসা করা দিন দিন খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। সারাদিন দশ দুয়ারে ঘুরে এক জায়গায় জিনিস বিক্রি করতে পারি। এ ছাড়া লাভও খুব সামান্য। বাজারের মতো চড়াদামে আমি জিনিস বিক্রি করতে পারি না। আমাদের লাভ দিনকে-দিন কমছে। অথচ-চাল-ডাল-তেল নুনের দাম দিনকে দিন বাড়ছে। তাই এখন আমাদের বাঁচাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

ঢাকা শহরে আমার মতো ফেরিওয়ালার জীবন এখন হয়ে পড়েছে খুবই কষ্টের। অবহেলা আর দারিদ্র্যের মধ্যেই আমার বসবাস। ফেরিওয়ালা বলে কেউ আমাকে ঘৃণার চোখে দেখে, কেউ রাস্তার মানুষ বলে দূরে ঠেলে দেয়। পথই আমার জীবন, ঝুড়িভর্তি মালই আমার জীবিকা। ফেরি করতে করতে একদিন পথেই আমার জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে। পুরানো ভাঙা শিশি-বোতলের মতো একসময় হয়তো পড়ে থাকব পথের ধুলায়।

একটি নদীর আত্মকথা
(সংকেত)

ভূমিকা : আমি শ্যামল বাংলার মায়াবী আঁচলে বয়ে চলা এক নদী। হিমালয়ের হিমবাহুর বিশাল বরফের স্তর গলে সরল-তরল হয়ে সমতল সুন্দরী বঙ্গভূমিতে আমি নেমে এসেছি।

নদীর আপন বৈশিষ্ট্য : নিরন্তর বয়ে চলাই আমার বৈশিষ্ট্য। আমি দুই তীরকে জল ও পলি দিয়ে সজীব ও উর্বর করে তুলি। আমার ওপর দিয়ে কত মালবাহী নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, পালতোলা নৌকায় যাতায়াত করে মানুষ। আমার তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে কত হাট-বাজার, গঞ্জ-গ্রাম, শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। সাদা বক, মাছরাঙা, গাঙচিল আমার ওপর দিয়ে

উড়ে যায়। জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কখনো রুদ্ররূপ ধারণ করে আমি গ্রাস করি গ্রাম-জনপদ, ঘরবাড়ি, ফসলের জমি। বর্ষায় আমার রূপ দেখে কেউ রাক্ষসী বলে। আবার গ্রীষ্মে আমার বুকে হাঁটু জল দেখে কেউ-বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এভাবে কখনো সোহাগী, কখনো রাক্ষসী হয়ে বয়ে যাই আমি অবিরাম। আমার নেই কোনো অবসর। আমাকে নিয়ে কত গল্প-উপন্যাস, কবিতা, গান রচিত হয়েছে। কেউ আমাকে দেখে সর্বনাশা হিসেবে, কেউ দেখে সজীব, সুন্দর রসদের উৎস হিসেবে। আমি লাজ-নম্র পল্লীবধূর মতো ছন্দ তুলে এঁকেবেঁকে চলি।

উপসংহার : নদীমাতৃক বাংলাদেশের আমি এক শ্যামল-কাজল নদী। পাহাড়-পর্বত, জনপদ, গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাই আমি। আমার রূপ দেখে মাঝি-মাল্লা, জেলে কবি হয়ে যায়। গান গেয়ে দাঁড় টানে মাঝি। আমার এক পারে সুখ, অন্য পারে দুঃখ, মাঝখানে একবুক তৃষ্ণা নিয়ে আমি বয়ে যাই সাগরে।

বাংলাদেশের কৃষক

ভূমিকা : নদীমাতৃক ও নদীবিধৌত বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের মানুষের জীবিকার প্রধান উপায়ও কৃষি। এই প্রেক্ষাপটেই কৃষককে বলা হয় 'জাতির মেরুদণ্ড'। অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষক ফলায় সোনার ফসল, দেশবাসী পায় ক্ষুধার অন্ন। কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় দেশের অর্থনীতি, দেশ এগিয়ে যায় শিল্পায়নের পথে। তাই দেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষকের ভূমিকা : জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষকের ভূমিকা অপরিসীম। জনসংখ্যাবহুল আমাদের দেশে খাদ্য-সমস্যা মোকাবেলা কৃষি-উৎপাদনের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পেলে দ্রব্যমূল্য নাগালের বাইরে চলে যায়। কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদনে সংকট দেখা দেয়। পক্ষান্তরে কৃষি-উৎপাদন ভালো হলে অর্থনীতি হয়ে ওঠে চাঙা।

জাতীয় আয় সৃষ্টিতে কৃষকের ভূমিকা : জাতীয় আয় সৃষ্টিতে কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা ইতিবাচক। আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্য, নিত্য-প্রয়োজনীয় কৃষিদ্রব্য ও শিল্পের কাঁচামাল জোগায় কৃষি। তা সম্ভব হয় কৃষকের ঘাম-নিংড়ানো শ্রমে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এভাবে কৃষক জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের ভূমিকা : খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের রয়েছে মুখ্য ভূমিকা। আমাদের দৈনন্দিন অপরিহার্য খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, আলু, তরকারি, শাকসবজি সবই উৎপাদন করে কৃষক। কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যই আমাদের জীবন বাঁচায়। চাষযোগ্য জমির স্বল্পতা, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি কারণে খাদ্য-উৎপাদনে এ দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবুও বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ খাদ্যশস্য কৃষকই জোগান দিয়ে থাকে।

শিল্পায়নে কৃষকের অবদান : শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও কৃষকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এ দেশের অনেক শিল্প কৃষি-নির্ভর ও কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাংলাদেশের কৃষকরা এসব শিল্পের প্রধান কিংবা একমাত্র জোগানদার। পাট ও বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপকরণ আসে কৃষি থেকে। চিনিশিল্পের অন্যতম উপকরণ আখ কৃষকেরই উৎপাদিত পণ্য। দেশে এরকম অনেক শিল্প রয়েছে যেগুলোর কাঁচামালের জোগানদাতা এ দেশের কৃষক। কৃষকরাই জোগান দেয় শিল্প-শ্রমিকের খাদ্য।

রপ্তানি আয়ে কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা : বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্যে একসময় পাটকে বাংলাদেশের 'সোনালি আঁশ' বলা হত। এই পাট কৃষকের উৎপাদিত পণ্য। এখনও পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশ যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। পাটের পরে আছে চা। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে চা-এর গুরুত্বও কম নয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা : কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষকের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষক যখন কৃষিকাজ করে তখন বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। পাশাপাশি কৃষি থেকে উৎপন্ন কাঁচামাল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানায়ও নতুন নতুন কর্মের সংস্থান হচ্ছে। বাংলাদেশে কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ প্রায় ৭০ শতাংশ।

কৃষকের সমস্যা : ফসল ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কৃষক প্রতিনিয়ত বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন। যেমন :

(ক) **প্রশিক্ষণের অভাব :** কৃষিফলন বাড়ানোর জন্যে চাই লাগসই উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার। এ ক্ষেত্রে কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে চাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। কিন্তু কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

(খ) **মূলধনের অভাব :** মূলধনের অভাব এ দেশের কৃষকদের চিরায়ত সংকট। সহজ শর্তে সময়মতো প্রয়োজনীয় ঋণ পেলে কৃষকরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

(গ) **সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা :** শুকনো মৌসুমে ইরি চাষের জন্যে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকে না। গভীর নলকূপ ক্রয়ের সামর্থ্য অধিকাংশ কৃষকের নেই।

(ঘ) **কৃষি উপকরণের অভাব :** উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশকসহ কৃষির বিভিন্ন উপকরণের অভাবেও কৃষকদের চাষাবাদ ব্যাহত হয়।

(ঙ) **ত্রুটিপূর্ণ বাজার :** মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাধান্যমূলক ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক শস্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

কৃষকের বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন। অন্যের জমিতে তারা বর্গাচাষ করে। আবার অনেকের নিজস্ব হালের বলদসহ পুঁজির সমস্যা রয়েছে। বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থার ও বৈদেশিক চাপে পড়ে সরকার দিন দিন কৃষির ওপর ভর্তুকি কমিয়ে আনছে। মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষিবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে অনেক সময়ে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও কৃষকের ভূমিকা অপরিহার্য। কৃষকের শ্রম ও কার্যকর ভূমিকার ওপরেই বহুলাংশে নির্ভর করে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অথচ বাংলাদেশের কৃষকের অথনৈতিক অবস্থা এখনও নাজুক। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি থেকে এখনও কৃষক মুক্ত হতে পারেনি। কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপক চোরাচালানও কৃষকের সামনে ক্রমশ হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিকে যুগোপযোগী আধুনিকায়ন এবং কৃষকের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। তাহলেই বাংলাদেশের অবহেলিত দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্য ফিরবে। আর কৃষকদের ভাগ্য ফিরলে বাংলাদেশও অর্থনৈতিক দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে।

বাংলাদেশের শ্রমিক

(সংকেত)

ভূমিকা : কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তারাই শ্রমিক। দেশের অর্থনীতিতে এদের বিরাট অবদান।

নানা ধরনের শ্রমিক : শহরের কলকারখানার শ্রমিক। গ্রামের কৃষক, খেতমজুর ও মৌসুমি কৃষিশ্রমিক। এ ছাড়া রয়েছে কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতি, ছুতার, মুচি, কুলি, পরিবহণ শ্রমিক ইত্যাদি।

কৃষিশ্রমিক : এ দেশের শ্রমিকদের বিপুল অংশ কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে। এরা দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার।

শিল্পশ্রমিক : এ দেশের শ্রমিকরা নানা শিল্পে নিয়োজিত। এর মধ্যে বিপুলসংখ্যক নারীশ্রমিক পোশাকশিল্পে কর্মরত। এরাও দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার।

অন্যান্য শ্রমিক : মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প এবং বিভিন্ন কুটিরশিল্পের শ্রমিকরাও আজ নানা সমস্যার মুখোমুখি।

উপসংহার : দেশের অগ্রগতির স্বার্থে শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার দিতে হবে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা : বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসে এক মাইলফলক ১৯৭১। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই ১৯৭১ সালে। রক্ত, অশ্রু আর অপরিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক আশ্চর্য অহংকার, গৌরবের এক মহান বিজয়গাথা।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় পূর্ববাংলাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কৃত্রিম ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশেরই বাস ছিল পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু তবু শাসনক্ষমতার চাবিকাঠি কুক্ষিগত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ক্রমেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের স্বরূপ পূর্ববাংলার জনগণের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানি শাসকরা শতকরা ৭ ভাগ লোকের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে পূর্ববাংলার মাটিতে। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রতিবাদী জনতা দেশের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রমূলক সামরিক শাসন জারি করে। তারা শিক্ষা-সংকোচন ও দমন-নীতি চালাতে থাকে। ফলে পূর্ববাংলায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পাকিস্তানি সরকার আবারও কঠোর দমননীতির আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৯ সালে প্রবল গণ-আন্দোলন ফুঁসে উঠলে সরকার আগরতলা মামলা তুলে নিতে ও রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে নারাজ হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ফলে পূর্ববাংলায় গণ-অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকায় এক ঐতিহাসিক সমাবেশে এক উদ্দীপ্ত ভাষণে তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা দেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে পাকিস্তান সরকার নির্মম হয়ে ওঠে। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। সেই রাতেই তদানীন্তন সামরিক একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয় নিরীহ বাঙালি জনগণের ওপর। রাতের আঁধারে নির্মম ও বর্বর গণহত্যার ঘটনা ঘটে।

সেই রাতে গ্রেফতারের আগে, অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। পরের দিন ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের মধ্যে হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব কায়েম করে। বাঙালি পুলিশ ও সেনারা স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নেয়। রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও প্রায় ১ কোটি শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ১৯৭১-এর ১০ই এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ভারতে গঠিত হয় অস্থায়ী প্রবাসী সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হয়। 'তাঁর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাজউদ্দীন আহমেদ পালন করেন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি হন কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানি।' বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুক্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করে তোলে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। তারা যুদ্ধকৌশল, অস্ত্রচালনা ও বিস্ফোরক ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। এভাবে দেশের সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। এ দেশের মুষ্টিমেয় রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্ বাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে।

পাকিস্তানি বাহিনী ক্রমেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবসহ কিছু দেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষে অবস্থান নিলেও ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায়। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। মুক্তিবাহিনী ক্রমে শক্তি অর্জন করে। তাদের চোরা-গোপ্তা গেরিলা তৎপরতা ও দুঃসাহসিক লড়াইয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ভারত মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় বরণ করে। তারা **১৯৭১** সালের **১৬ই** ডিসেম্বর ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যান) আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে অস্ত্র ও আত্মসমর্পণ করে। সারাদেশে জনতার দৃপ্ত উল্লাসের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপসংহার : বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। সে স্বাধীনতা এমনি আসেনি। এর জন্য শহীদ হয়েছে ৩০ লক্ষ লোক। উদ্বাস্তু হয়েছে এক কোটি মানুষ। যে স্বপ্নসাধ বুকে নিয়ে অজস্র ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সে স্বপ্ন আজও পূরণ হয়নি। সেই লক্ষ্যে আমরা আজও এগিয়ে চলেছি। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ বাস্তবায়ন করেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হবে।

হযরত মুহম্মদ (স)

ভূমিকা : যেসব মহাপুরুষ মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত মুহম্মদ (স)। সত্য, ন্যায় ও আদর্শে মহান করে স্রষ্টা তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অন্ধকার যুগে তিনি আলোকবর্তিকা হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আদর্শ পথভ্রষ্ট মানুষকে মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল। হযরত মুহম্মদ (স)-এর উদারতা, মানবিকতা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল আস্থা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মতৎপরতা দেশ-কাল-সম্প্রদায় ও জাতি-ধর্মকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবিকতার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি যেমন আরব জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশিত পথে, তেমনি সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য নির্বিরোধ শান্তির এক জ্যোতির্ময় পথ প্রদর্শন করে গেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসুল। তিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আরবের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে, পবিত্র নগরী মক্কায় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের **১২ই** রবিউল আউয়াল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম বিবি আমেনা। আমাদের প্রিয় নবী জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারান এবং ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। এরপর শিশু মুহম্মদ (স)-কে তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিব পরম স্নেহে লালন পালন করেন। কিন্তু আট বছর বয়সে দাদা আব্দুল মোত্তালিবও মারা যান। পিতৃব্য আবু তালিব এরপর তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই মহানবী ছিলেন সহজ সরল ও কোমল স্বভাবের অধিকারী। সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মবোধ প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। সত্যবাদিতার জন্য শৈশবেই তিনি 'আল আমিন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধিতে ভূষিত হন।

বিবাহ ও নবুয়ত প্রাপ্তি : হযরত মুহম্মদ (স)-এর সততা, ন্যায়পরায়ণতার কথা সৌরভের মতো মক্কা নগরীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ সেই যুগে এ ধরনের অকৃত্রিম চরিত্রের অধিকারী কেউ ছিলেন না। মক্কার ধনবতী বিধবা মহিলা বিবি খাদিজা তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার দেন। বিশ্বস্ততার সঙ্গে হযরত ব্যবসা পরিচালনা করে বিবি খাদিজার ব্যবসায় সমৃদ্ধি আনয়ন করেন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর দক্ষতা, সততা ও অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে বিবি খাদিজা তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন হযরত মুহম্মদ (স)-এর বয়স পঁচিশ বছর আর বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ। উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সে যুগে আরবের অবস্থা ছিল দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ। গোত্রে গোত্রে হানাহানি, মারামারি, পারস্পরিক যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ফলে নিয়ত রক্তাক্ত ছিল আরবভূমি। একদিকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অন্যদিকে ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল নানা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি ও অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান। কন্যাশিশুকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার মতো জঘন্য অপরাধ ছিল সেই সময়ের নিত্য ঘটনা।

মক্কার কাবা ঘরেই ছিল অসংখ্য মূর্তি। মূর্তিপূজার নানা স্বতন্ত্র রীতি ছিল। গোত্রে গোত্রে বিরোধ ছিল। জাতির জীবনে অনাচার, অবিচার ও অন্ধকার অমানিশা হযরত মুহম্মদ (স) কে বিচলিত করত। তিনি সবসময় এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য চিন্তাভাবনা করতেন। মক্কার অদূরে 'হেরা' পর্বতে গিয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধ্যান করার পর আল্লাহর দূত জিব্রাইল (আ) ফেরেশ্তা ঐশী বাণী নিয়ে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে আল্লাহর বাণী পাঠ করে শোনান। এভাবে ওহি নাজেল হয় এবং তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন।

ইসলাম প্রচার : নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর আদেশে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। প্রথমে স্ত্রী বিবি খাদিজা ঈমান এনে মুসলমান হলেন। তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত আলী (রা), যায়েদ বিন হারেস প্রমুখ। ক্রমেই মক্কায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে কুরাইশগণ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

মদিনায় হিজরত : কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর আদেশে মক্কা থেকে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। যেসব মক্কাবাসী হযরতের সঙ্গে মদিনায় গিয়েছিলেন তাদের মুহাজির (শরণার্থী) এবং যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের আনসার (সাহায্যকারী) বলা হয়।

মক্কা বিজয় ও মদিনা সনদ : মদিনায় ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠা ও হযরত মুহম্মদ (স)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে মক্কার কুরাইশগণ শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। মহানবী শুধু একজন ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, দূরদর্শী রাজনীতিবিদও ছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতার কারণে মক্কার ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর একটি চুক্তি হয়। তা 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। অবশেষে তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় করেন এবং সাহাবিদের নিয়ে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। হযরত মুহম্মদ (স) মুসলমান, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্য সমঝোতার জন্য কতিপয় শর্তযুক্ত সনদে স্বাক্ষর করেন। তা 'মদিনা সনদ' নামে অভিহিত। এই সনদকেই প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত মুহম্মদ (স)-এর ওফাত : ৬২ বছর বয়সে, হিজরি একাদশ বৎসরে, ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জুন) সোমবার দ্বিপ্রহরে নামাজরত অবস্থায় হযরত মুহম্মদ (স)-এর ওফাত হয়।

উপসংহার : হযরত মুহম্মদ (স) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ জগতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি ছিলেন ফুলের মতো সৌরভময় মহাপুরুষ। শিশুর মতো সরল। সত্য ন্যায়ের প্রতি ছিল তাঁর অনড় বিশ্বাস। তাঁর জীবনাদর্শ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে অনুসরণীয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা : বাঙালি মনীষার এক আশ্চর্য প্রকাশ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিচিত্র ও বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভার জন্য শুধু নয়, তাঁর ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তুর গভীরতার জন্যও তিনি অনন্য। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ এই তিন বিশ্বজনীন বোধের ওপরই তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্ম প্রতিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তাঁর জাদুকরি প্রতিভার স্পর্শ লাগেনি। সুদীর্ঘ জীবনে সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি তিনি সমাজকর্ম ও জমিদারি কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কবি হয়েও তিনি মানুষকে কর্মে অনুপ্রাণিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র নোবেল বিজয়ী কবি।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও পরিবারিক ঐতিহ্য : রবীন্দ্রনাথের জন্ম ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বাংলা,৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী চার-পাঁচ বছর বয়সে গৃহশিক্ষকের

কাছেই তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি শৈশবে পাঠ গ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হন। বছরখানেক পর নর্মাল স্কুলে, তারপর বেঙ্গল একাডেমিতে তিনি পড়ালেখা করেন। কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলেও রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পড়াশুনা করেন। কিন্তু স্কুলের বাঁধা-ধরা পড়ালেখা তাঁর ভালো লাগত না। অভিভাবকরা তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়ানোর জন্যে লন্ডনে পাঠানো হয়। প্রথমে ব্রাইটনে ও পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড়বছর পড়াশুনার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে সর্বদা সাহিত্যের অনুকূল হাওয়া বইত। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৭৭ সালে মাসিক 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দাদার অনুপ্রেরণায় চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি 'বনফুল' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এরপর 'কবিকাহিনী'; 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রভৃতি কাব্য একের পর এক প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য সাধনা ও কর্মময় জীবন : ১৮৮২ সালে কলকাতা ১০ নং সদর স্ট্রিটে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি রচনা করেন। এটি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মের ইঙ্গিতবাহী কবিতা। ১৮৮৩ সালের দিকে তিনি পিতার আদেশে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এবং পাবনার শাহজাদপুরে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। কলকাতার বাইরে পল্লীপ্রকৃতি ও তৃণমূল সংলগ্ন মানুষের মাঝে এসে তাঁর সৃষ্টিকর্ম নতুন সমৃদ্ধি লাভ করে। 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যগুলো তিনি এসময়েই রচনা করেন। তাঁর লেখা চলতে থাকে বিরামহীন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের মধ্যে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের জীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অজস্র কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য, অনুবাদ, ভাষা ও সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, চিত্রকর্মসহ বহুমাত্রিক রচনাসম্ভার দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের সাহিত্যকে।

১৯১১ সালের ৭ই মে রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫০ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক কবিকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নিজের অনুবাদ করা এবং ইংরেজ কবি ডব্লিউ.বি.ইয়েটস-এর ভূমিকা লেখা 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হলে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কারণে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনার পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তার ও সমাজকল্যাণমূলক অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী' ও ১৯২২ সালে 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করে গতানুগতিক শিক্ষার জায়গায় ব্যতিক্রমী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সমবায় আন্দোলন, কৃষির উন্নয়ন, রাজনীতি, সংস্কৃতি নানা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আজীবন অবদান রেখে গেছেন। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বাংলা, ৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিচিত্র ও বহুমুখী হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। সত্য, সুন্দর, কল্যাণই তাঁর আদর্শ। তিনি মানবতার কবি, প্রকৃতির কবি। পৃথিবীর রূপ-মাধুর্যকে তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান করেছেন। অরূপ আলোয় আলোকিত এক জীবনের দিকেই ধাবিত তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্ম। তাঁর অজস্র সৃষ্টি আমাদের শিল্প-সাহিত্যের অপরিমেয় সম্পদ হয়ে আছে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা : বিদ্রোহ ও তারুণ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলাকাব্যে ধূমকেতুর মতোই তাঁর আবির্ভাব। পচনধরা প্রথাগত সমাজকে ভেঙেচুরে স্বাস্থ্যকর নতুন এক সমাজ নির্মাণ করাই তাঁর স্বপ্ন ছিল। তাই তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন সকল অন্যায়, অসত্য, শোষণ-নির্যাতন আর দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ এবং পরাধীনতার

গ্লানি থেকে জাতিকে মুক্ত করতে তিনি কলম ধরেছিলেন। কবিতা লেখার অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন। বন্দি করেও থামানো যায়নি তাঁর লেখা। দুঃখ, দারিদ্র্য এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন।

জন্ম ও শৈশব-কৈশোর : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে, ২৪শে মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। শৈশবে, মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। চরম আর্থিক অনটন আর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর বাল্যকাল কাটে। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি কিছুদিন স্থানীয় মাজারে খাদেম, মসজিদে ইমামতি ও মোল্লাগিরি করেন।

নজরুলের জন্মের পূর্বে তাঁর একাধিক ভাইবোন অকালে মারা যায়। এজন্য ছোটবেলায় নজরুলকে তাঁর পিতামাতা 'দুখু মিয়া' বলে ডাকতেন। খুব অল্প বয়সে তাঁর কবিত্বশক্তির প্রকাশ পায়। তিনি মুখে মুখে ছন্দ মিলিয়ে পদ্য রচনা করতে পারতেন। গ্রামের লেটোর দলে যোগ দিয়ে নজরুল গান গেয়েছেন, অনেক পালাগান রচনা করেছেন। ছোটবেলা থেকেই নজরুল ছিলেন মুক্তমনা। স্কুলের বাঁধাধরা জীবন তাঁর ভালো লাগত না। বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি মহকুমা শহর আসানসোলে গিয়ে রুটির দোকানে চাকরি নেন। রুটির দোকানের কাজের ফাঁকে নজরুল সুর করে গান গাইতেন, পুঁথি পড়তেন। প্রতিভাবান বালক হিসেবে তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে আসানসোলের দারোগা কাজী রফিজউল্লাহ্ নিজ বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুরে এনে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এখানে কিছুদিন পড়ালেখার পর নজরুল আবার গ্রামে ফিরে যান। ভর্তি হন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে।

১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে সমগ্র ইউরোপে। নজরুল তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। যুদ্ধের আহ্বান শুনে স্কুল থেকে পালিয়ে তিনি ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়ে চলে যান করাচি। নিজ দক্ষতার গুণে অল্পদিনের মধ্যে নজরুল হাবিলদার পদে উন্নীত হন। সেনাশিবিরে ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যান। করাচি থেকেই তিনি কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠান। তাঁর প্রথম লেখা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নামে একটি গল্প এবং প্রথম কবিতা 'মুক্তি'।

নজরুলের সাহিত্যিক জীবন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর কলকাতায় ফিরে এসে নজরুল পুরোপুরি সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। এসময় ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলছিল। করাচি থেকে পাঠানো কয়েকটি লেখা পূর্বেই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের কারণে নজরুল কলকাতার কবি-সাহিত্যিক মহলে সমাদৃত হন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হলে নজরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, গানসহ প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া নজরুল 'নবযুগ' 'ধূমকেতু' 'লাঙল' 'গণবাণী' ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নজরুলের লেখায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা ধ্বনিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন :

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

নজরুলের শেষ জীবন : ১৯৪২ সালে এক দুরারোগ্য মস্তিষ্কের রোগে নজরুল সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অনেক চিকিৎসার পরও তিনি আর সুস্থ হননি। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে কবিকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ সরকার এ দেশে নিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। ১৯৭৬ সালের ২৭শে আগস্টে ঢাকা পিজি হাসপাতালে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) নজরুলের মৃত্যু হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। গণমানুষের এই কবি চিরকাল আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা : হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠতম অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে যার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুকাল পরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৈষম্য আর পরাধীনতার গ্লানি। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে এ দেশের জনগণের দ্বন্দ্ব আরো সুস্পষ্ট হয়। নিপীড়িত জাতির ভাগ্যাকাশে যখন দুর্যোগের কালোমেঘ, তখনই শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় আবির্ভাব। অসাধারণ দেশপ্রেম ও দূরদর্শী নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি তাই ভালোবেসে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। স্বাধীনতার পর তাঁকে 'জাতির পিতা'র মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়।

জীবনকথা : স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়রা খাতুন। দুই ভাই, চার বোনের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন সবার বড়। পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশে টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো কাটে। গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং এই স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। এই সময় তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে এক সংবর্ধনা সভা শেষে ফিরে যাচ্ছিলেন, পথরোধ করে দাঁড়ালেন শেখ মুজিব। স্কুলের ছাত্রাবাস জরাজীর্ণ। ছাত্রাবাস মেরামতের জন্য অর্থ চাই। শেরে বাংলা প্রথমে কিশোর মুজিবের সাহস ও স্পষ্ট বক্তব্য আর জনহিতৈষী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে অবাক হন। তারপর সহাস্যে জিজ্ঞেস করেন, ছাত্রাবাস মেরামত করতে কত টাকা দরকার? স্পষ্ট কণ্ঠে কিশোর বললেন— বারো'শ টাকা। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাথে সাথে টাকার ব্যবস্থা করলেন। বাল্যকাল থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান একটু অন্যরকম ছিলেন। একবার নিজের বাড়ির গোলার ধান গ্রামের গরিব চাষিদের মাঝে বিলিয়ে দেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এবার চাষিদের জমির ধান সব বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। আকালে পড়েছে কৃষক। আমাদের মতো ওদের পেটেও ক্ষুধা আছে। ওরাও আমাদের মতো বাঁচতে চায়।' বাবা ছেলের এই সৎ সাহস ও মহানুভবতা দেখে বেশ খুশি হলেন। এভাবে শেখ মুজিবুর রহমান গরিবের বন্ধু আর নিপীড়িত মানুষের হৃদয় জয় করেন।

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে আই.এ. এবং ১৯৪৭ সালে বি.এ. পাস করেন তিনি। ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ক্রমেই নেতা মুজিবে বিকশিত হতে থাকেন। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর তিনি আইন পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিন যুগ্ম সম্পাদকের পদ লাভ করেন এবং ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব লাভ করনে। এ দেশের মানুষের অধিকার আদায় এবং শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বহুবার গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন।

১৯৬৬ সালে তিনি পেশ করেন বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক মুক্তির সনদ ছয়-দফা। এ সময় নিরাপত্তা আইনে আবার গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ জীবনযাপন করতে থাকেন। তাঁকে প্রধান আসামী করে দায়ের করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত রেসকোর্স ময়দানের এক নাগরিক সংবর্ধনায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করনে। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান ৩রা মার্চ অসহযোগ

আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বঙ্গাবন্ধু ঘোষণা করেন-

**'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'**

২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। সেই রাতে বঙ্গাবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। গ্রেপ্তারের পূর্বে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গাবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১০ই এপ্রিল বঙ্গাবন্ধুর অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় সূচিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১২ই জানুয়ারি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পরাজিত হায়েনার দল তাঁর সাফল্য ও বাঙালির উত্থানকে মেনে নিতে পারেনি। তাই আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র। দেশ যখন সকল বাধা দূর করে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী ও আন্তর্জাতিক চক্রের শিকারে পরিণত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর তৎকালীন কিছু উচ্চাভিলাষী ও বিপথগামী সৈনিকদের হাতে বঙ্গাবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। শারীরিকভাবে শেখ মুজিবের মৃত্যু হলেও তিনি অমর, অক্ষয়। দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালি হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে রয়েছে একটি নাম- শেখ মুজিবুর রহমান।
কবি অন্নদাশংকরের ভাষায় বলতে হয়-

**'যতকাল রবে পদ্মা-যমুনা-গৌরী-মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান॥'**

অবদান : দ্বিধাবিভক্ত পরাধীন জাতিকে সুসংগঠিত করে স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া সহজ কাজ নয়। অথচ এই কঠিন কাজটি বঙ্গাবন্ধু খুব সহজেই করতে পেরেছিলেন। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম সবই পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান অসীম দক্ষতা ও যোগ্যতায়। তাঁর ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অসাধারণ বজ্রকণ্ঠ। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর ছিল বিপুল খ্যাতি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে। অকৃত্রিম দেশ প্রেম, সাধারণ জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা, অমায়িক ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি তাঁকে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছে। স্বাধীনতার পর তিনি খুব বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পাননি। যতটুকু সময় ক্ষমতায় ছিলেন, তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি ক্ষমতা লাভের পর কিছুদিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর দেশত্যাগ করা এবং মুক্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ করার ঘোষণা দেন। বিশ্বের ১০৪টি দেশ স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামি সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বঙ্গাবন্ধুর আমলে। ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। ব্যাংক, বীমাসহ শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। তাঁর নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছিল বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বাঙালি জাতির জীবনে সূচনা করেছে এক নবদিগন্ত। আত্মপরিচয়হীন জাতি খুঁজে পেয়েছে তার অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা।

উপসংহার : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যার নাম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দীপ্যমান তিনি বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দূরদর্শী, বিচক্ষণ এবং সঠিক নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক। তিনি নিজের স্বার্থকে কখনোই প্রাধান্য দেননি, জাতির কল্যাণের কথাই তিনি সবসময় ভেবেছেন। জেল জুলুম ও নির্যাতনের কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি। সমস্ত জাতিকে তিনি মুক্তি ও স্বাধীনতার চেতনায় ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ জাতিকে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। বঙ্গাবন্ধুকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার সামিল। 'বঙ্গাবন্ধু' ও 'বাংলাদেশ' আজ সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে এক ও অভিন্ন নাম।

দেশগঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল
চল্ রে চল্ রে চল্।

সূচনা: জ্ঞানশক্তি ও তারুণ্যশক্তি এই দুই শক্তির সমন্বয় করে ছাত্রসমাজ দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আজকের ছাত্ররাই জাতির সম্ভাবনাময় প্রজন্ম। জাতির স্বপ্নময় ভবিষ্যতের কাণ্ডারী। সততা, নিষ্ঠা, সাহস ও ত্যাগী মনোভাব এসব গুণাবলির সঙ্গে জ্ঞানের আলো থাকলে দেশের উন্নতি এবং জাতির নতুন অভ্যুদয় ঘটাতে পারে ছাত্রসমাজ। কিন্তু এই সৎ গুণাবলি অর্জন করা খুব সহজ নয়। এর জন্য দরকার নিয়মিত অনুশীলন ও মানসিক পরিচর্যা।

ছাত্রসমাজ তারুণ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি : ছাত্রসমাজ চিরকালই নবশক্তির উদ্বোধক হিসেবে কাজ করেছে। তাদের চোখে থাকে জ্ঞানের আলো, বুকে থাকে স্বপ্নময় ভবিষ্যতের অগ্নিমন্ত্র। অর্জিত জ্ঞানের আলো নিয়ে তারা দেশ ও সমাজের দিকে তাকায়। তাদের দেশগঠনমূলক ভূমিকা ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। ছাত্রসমাজ রচনা করেছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে এ দেশের ছাত্রসমাজের রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনে ছাত্রসমাজই পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সিঁড়ি বেয়ে এ দেশের ছাত্রসমাজ জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে। বুকের রক্ত দিয়ে রফিক, শফিক, সালাম, বরকত যে বাংলাভাষার নাম লিখেছিল, তা আজ স্বমহিমায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত।

দেশ ও জাতির সমস্যা ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা : ছাত্ররা সাধারণত অর্থনৈতিক বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকে না। বন্ধনহীন মুক্তজীবন আর খোলা চোখ নিয়ে তাকায় বলে, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রুটিগুলো সহজে দেখতে পায়। চিহ্নিত করতে পারে সমস্যার কারণ এবং সমাধানের উপায়ও তারা খুঁজে বের করতে পারে। লোভ বা স্বার্থপরতার কাছে পরাজিত না হয়ে দেশের বৃহত্তর কল্যাণে তারা কাজ করতে পারে।

ছাত্রসমাজ মানেই সংঘবদ্ধ একটা শক্তি। এই সংঘবদ্ধশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশগঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। প্রচলিত ধারার নষ্ট রাজনীতি কখনো কখনো ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। কলুষিত করছে ছাত্রসমাজকে। ছাত্রসমাজের গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করার স্বার্থেই ওই নষ্ট রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ছাত্রসমাজকে কাজ করতে হবে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে, অপরিসীম দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে। মনে রাখতে হবে, এ দেশের প্রত্যেকটি ছাত্র এক-একজন সূর্যসন্তান। দেশমাতৃকার সেবা-শক্তির প্রতীক।

দেশ গড়ার বিভিন্ন দিক : অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। এর পাশাপাশি আদর্শহীনতা, দুর্নীতি ইত্যাদি বাংলাদেশের এখন মৌলিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব সমস্যার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতার এত বছর পরেও রাষ্ট্রীয়ভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। এখনো এদেশের ষাট শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকারগুলো অধিকাংশ মানুষের জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

ছাত্রসমাজকে এ সমস্ত দিকগুলোর প্রতি নজর দিতে হবে। সততা ও নৈতিকতার অনুশীলন এবং আদর্শ চরিত্রের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। সততাই মানবজীবনের মৌলিক শক্তি। দার্শনিকেরা বলেছেন, 'স্বর্ণ বা তেলের খনি নয়, আদর্শ মানুষই একটি দেশের প্রকৃত সম্পদ।' ছাত্রসমাজ সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে যুক্ত হলে দেশ এগিয়ে যাবে।

উপসংহার: ছাত্রসমাজ হচ্ছে সংঘবদ্ধশক্তিতে বলীয়ান। সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম থাকলে তারা দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। দেশের অগ্রগতি ও জাতির প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা পূরণে ছাত্রসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সাক্ষরতা প্রসারে ছাত্রসমাজ
(সংকেত)

ভূমিকা : শিক্ষা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। শিক্ষা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে। মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ, কর্মঠ ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। অথচ আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর।

নিরক্ষরতার অভিশাপ : নিরক্ষরতা জাতিকে রুগ্‌ণ, নিরুদ্যম ও গতিহীন করে তোলে। নিরক্ষর মানুষ জীবনে দুর্দশা ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পায় না। তারা সমাজের অপশক্তির হাতে শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়। দুর্বিষহ, বিপন্ন ও মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় তাদের।

সাক্ষরতা-আন্দোলন : নিরক্ষরতা নামক সামাজিক ব্যাধি ও পশ্চাৎপদতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে দেশে সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু হয়েছে। সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সবার জন্য শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রসমাজের ভূমিকা : ছাত্রছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যৎ। তারা ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। তাদের আশেপাশেই অবস্থান করছে নিরক্ষরতা। তাদের কাজ নিরক্ষরদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা। অশিক্ষার কুফল সম্পর্কে তাদের জানানো। পাশাপাশি বয়স্ক ও নিরক্ষরদের হাতে-কলমে শেখার ব্যাপারেও তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

উপসংহার : দেশের আগামী দিনের কর্ণধার হিসেবে ছাত্রদের এখন থেকে দেশগড়ার দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে সাক্ষরতা আন্দোলনে।

চরিত্র

ভূমিকা : চরিত্র মানবজীবনের মহিমা। মানুষের সমস্ত মানবিক গুণাবলির প্রতিফলন ঘটে চরিত্রে। তা তাকে পাশবিক আচরণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক করে। চরিত্র অনুযায়ী গড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিজীবন। তার প্রভাব পড়ে তার চিন্তা ও কর্মে। ফলত তা প্রভাবিত করে তার চারপাশের পরিবেশ ও সমাজজীবনকে।

চরিত্র কী : ব্যক্তির আচরণ ও আদর্শগত বৈশিষ্ট্যের নাম চরিত্র। সূক্ষ্মভাবে দেখলে মানুষের চরিত্রের রয়েছে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য—কেউ সচ্চরিত্র, কেউ দুশ্চরিত্র। যে মানুষের চরিত্র নানা মহৎ ও সৎগুণের আধার, তিনি সচ্চরিত্র। আর কারও চরিত্র লুকানো পশুত্বের আধার হলে সেই চরিত্রই দুশ্চরিত্র। যিনি সৎ চরিত্রের অধিকারী তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ অলংকার। চরিত্রকে জীবনের মুকুট বলা হয়। মুকুট যেমন সম্রাটের শোভা বর্ধন করে, তেমনি চরিত্রও মানবজীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সততা, নীতিনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতা, ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য, কর্তব্যপরায়ণতা, গুরুজনে ভক্তি, মানবিকতা ও আত্মসংযম ইত্যাদি সচ্চরিত্রের লক্ষণ। যিনি চরিত্রবান তিনি কখনও ন্যায়, নীতি, আদর্শ ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হন না, দুর্নীতি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। তিনি সযত্নে ক্রোধ, অহংকার, রূঢ়তা ইত্যাদিকে পরিহার করেন। তিনি হন সত্যবাদী, সংযমী ও ন্যায়পরায়ণ। যাবতীয় মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে বলে চরিত্রবান মানুষ জাতির সম্পদ।

চরিত্র গঠনের গুরুত্ব : মানুষের জীবনে চরিত্রের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। কেবল চরিত্রের শক্তিতে মানুষ হয়ে উঠতে পারেন বিশ্ববরেণ্য ও চিরস্মরণীয়। কেবল চরিত্রের গুণে মানুষ অমর হতে পারে। মানবজীবনে চরিত্রের মহিমা সম্পর্কে ধারণা করা যায় একটি ইংরেজি সুভাষিত থেকে :

When money is lost nothing is lost,
When health is lost something is lost,
When character is lost everything is lost.

তাই চরিত্রের বিকাশ সাধনই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

চরিত্র-গঠনমূলক শিক্ষার লক্ষ্য : শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য চরিত্র গঠন। তাই ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত দিকগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন :

১। ন্যায়-নীতি, ধৈর্য, সাহস, সততা, সৌজন্য, কৃতজ্ঞতাবোধ ইত্যাদি সৎ ও মহৎ গুণাবলির বিকাশ ও লালন;
২। শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি আচার-আচরণ-অভ্যাস গঠন;
৩। দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, মানবপ্রেম ইত্যাদি সংগঠিত ভাবাবেশের পরিচর্যা;
৪। হিংসা, বিদ্বেষ, কুটিলতা ইত্যাদি মন্দ প্রবৃত্তি দমন;
৫। ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি-চেতনা, মানবকল্যাণ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলিকে জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ।

চরিত্র গঠনে বাবা-মা, পাড়া-প্রতিবেশীর ভূমিকা ছাড়াও বয় স্কাউট, গার্লস্ গাইড, রেডক্রস ইত্যাদি সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ। স্বেচ্ছা সংগঠনের মাধ্যমে মানুষ যৌথ কাজের গুরুত্ব ও আনন্দ অনুভব করতে পারে।

চরিত্র গঠনের সাধনা : চরিত্র গঠনের জন্যে প্রত্যেকের নিজস্ব প্রচেষ্টা ও সাধনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রবান হতে হলে লোভ-লালসা ও অসৎ প্রবৃত্তির নানা কুপ্রলোভন পরিহার করার শক্তি অর্জন করতে হয়। চরিত্রবান মানুষের জীবনাদর্শের আলোয় সুচরিত্র গঠনে এগিয়ে যেতে হয়।

মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত- : পৃথিবীতে যাঁরা স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁরা ছিলেন সুন্দর, নির্মল ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের শক্তিতে বলীয়ান। কোনো প্রলোভনই তাদের ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এমনই চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহানবী হযরত মুহম্মদ (স)। তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন অন্যায়, অসত্য ও পাপের বিরুদ্ধে। যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় যীশুখ্রিষ্ট, বুদ্ধ, নানক, কবিরের মতো আরও যেসব মহৎ ব্যক্তিত্ব আপন মহিমায় ভাস্বর তাঁরা সকলেই ছিলেন মানবব্রতী, ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শেরে বাংলা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মানবব্রতী, সমাজব্রতী, দেশব্রতী মহাপ্রাণ মানুষ তাঁদের উন্নত ও মহৎ চরিত্রশক্তির গুণেই অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে পেরেছিলেন।

উপসংহার : পরিভোগপ্রবণ বিশ্বে আজ চারপাশে বাড়ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। সততা, ন্যায়নীতি হচ্ছে বিপর্যস্ত। চরিত্রের মহিমাকে উপেক্ষা করতে বসেছে মানুষ। লোভ-লালসা, ঈর্ষা-হিংসা, অন্যায়-দুর্নীতি ক্রমেই আচ্ছন্ন করছে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে। হীনস্বার্থ হাসিলের অনৈতিক পন্থায় চালিত হচ্ছে একশ্রেণীর লোক। এ অবস্থায় জাতীয় জীবনে চাই চরিত্রশক্তির নবজাগরণ। চরিত্র হারানো প্রজন্মকে শোধরানো কঠিন। তাই নতুন প্রজন্মকে বেড়ে উঠতে হবে চরিত্রের মহান শক্তি অর্জন করে। তাহলেই আমাদের ভবিষ্যৎ হবে মানবিক মহিমায় ভাস্বর।

অধ্যবসায়

ভূমিকা : যে-কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার নাম অধ্যবসায়। অবিচল সংকল্প নিয়ে, সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, অপরিসীম ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্য লাভ করা চরিত্রের এই গুণটিই অধ্যবসায়। সেইসঙ্গে উদ্যম, উদ্যোগ, নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা আর আন্তরিক কঠোর পরিশ্রম অধ্যবসায়কে দেয় পূর্ণতা।

অধ্যবসায়ের গুরুত্ব : মানবসভ্যতার বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি অধ্যবসায়। আদিম মানুষ মাটিতে, পানিতে, আকাশে বৈরীশক্তিকে মোকাবেলা করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সফল হয়েছে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে। অনাবাদি জমি আবাদ করে ফসল ফলানো, জলাভূমি ভরাট করে নগর পত্তন, মরুভূমিকে মরূদ্যানে রূপান্তর— সবই অধ্যবসায়ের দান। আদিম গুহাচারী মানুষ আজ মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, চিকিৎসা-শিল্পকলা ইত্যাদি প্রতিটি শাখায় মানুষের যে অভাবনীয় অগ্রগতি তার মূলে রয়েছে নিরন্তর সাধনা, উদ্যম, উদ্যোগ আর নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও অধ্যবসায়কে একটি চারিত্রিক গুণের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায় : জীবনের পথ পরিক্রমায় নানা সমস্যা মোকাবেলার উপায় অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ী ব্যক্তির পক্ষেই জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব। যে অধ্যবসায়ী নয়, তার দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সম্ভব নয়। মানবজীবনে

অধ্যবসায়ের এ গুণটি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নলিখিত কাব্যপঙ্ক্তিতে :

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

এ উদ্যম অধ্যবসায়েরই নামান্তর মাত্র।

প্রতিভা ও অধ্যবসায় : কেউ কেউ মনে করেন, প্রতিভাই সফলতার মূল নিয়ামক। এ ধারণা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। অধ্যবসায় ছাড়া সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় না। প্রতিভাবানদের জীবনেও আত্মপ্রতিষ্ঠা আসে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায় : ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎ জীবন রচনার অনুশীলনক্ষেত্র। তাই অধ্যবসায় ছাত্রজীবনের সবক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায়ের মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। বারবার পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিলে রচিত হয় জীবনের সাফল্যের বুনিয়াদ। অধ্যবসায় না থাকলে কেবল মেধা কাজে লাগে না। অনেক মেধাবী বিদ্যার্থী যথেষ্ট প্রয়াসের অভাবে জীবনে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

মনীষীদের জীবনে অধ্যবসায় : জগতে যাঁরা মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার আদর্শ হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। মহাকবি ফেরদৌসীর অমর মহাকাব্য 'শাহানামা' দীর্ঘ তিরিশ বছরের কাব্যপ্রয়াস। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ বিশ বছরের সাধনায় রচনা করেন 'বাংলা ভাষার অভিধান'। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়াই একক প্রচেষ্টায় প্রায় দু'হাজার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন খ্যাতনামা সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস পরপর ছয়বার ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েও হাল ছাড়েননি। শেষপর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী নিউটনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি : বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের মূলে আছে বহু বছরের একনিষ্ঠ সাধনা ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম।

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায় : সামগ্রিকভাবে জাতির সগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যেক নাগরিকেরই অধ্যবসায়ী হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিজীবনে তার অনুশীলন প্রয়োজন। এদিক থেকে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে অধ্যবসায়ী ব্যক্তির গুরুত্ব অনেকখানি।

উপসংহার : জীবনে সাফল্য লাভ করে জাতিকে গৌরবান্বিত করার ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্যমী নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকলে কোনো প্রতিকূলতাই জাতিকে নিরস্ত করতে পারে না। অধ্যবসায়ী মানুষ ধৈর্য ও অবিচলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একসময়-না-একসময় সাফল্য ছিনিয়ে আনে। প্রতিটি সফল জীবন এক অর্থে অধ্যবসায়েরই চালচিত্র। তাই ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকের উচিত এই বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া।

শৃঙ্খলাবোধ

ভূমিকা : মানবজীবনে এক ধরনের কল্যাণমুখী বন্ধনের নাম শৃঙ্খলা। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শৃঙ্খলার নানা বন্ধন তৈরি করেই মানুষ অর্জন করেছে শ্রেষ্ঠত্ব, নির্মাণ করেছে সভ্যতা। এভাবেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মজীবনে শৃঙ্খলার পাঠ নিয়েছে মানুষ। সে অভিজ্ঞতায় দেখেছে, তার প্রতিটি কর্মের জন্যে প্রয়োজন হয় সুষম সমন্বয়ের। তার জন্য দরকার শৃঙ্খলা । সুশৃঙ্খল জাতিই নিশ্চিত করতে পারে জাতীয় জীবনে ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি।

প্রকৃতির রাজত্বে শৃঙ্খলা : বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র রয়েছে নিয়মের রাজত্ব। সেখানে কোথাও শৃঙ্খলার অভাব নেই। তার সবকিছুই সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির সুশৃঙ্খল নিয়মে সকালে সূর্য ওঠে, সন্ধ্যায় অস্ত যায়। রাতের আকাশে উঁকি দেয় চাঁদ ও তারা। দিবারাত্রির এই পরিক্রমার পথ বেয়ে প্রকৃতিতে চলে ষড়ঋতুর আবর্তন। প্রকৃতির এই নিয়মের বন্ধনে বাঁধা মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব। তাই প্রকৃতির মতোই মানুষের জীবনে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে শৃঙ্খলার দায়।

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা : মানুষের ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ও পরিচালনার সঙ্গে রয়েছে শৃঙ্খলার যোগ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিজীবন নানা নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনে বাঁধা। এই শৃঙ্খলা যেন মানুষের জীবনে চলার ছন্দ। সে ছন্দ ব্যক্তিজীবনকে শান্ত, সুস্থির, ফলপ্রসূ করার অবলম্বন। তা যেন সমাজ ও জাতীয় জীবনে অগ্রগতি নিশ্চিত করার চালিকাশক্তি। তাই মানুষের উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থেই অনেক নিয়ম গড়ে তুলেছে সমাজ। সেসব নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা : শিক্ষিত মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনের ভিত্তি রচিত হয় ছাত্রজীবনে। যতটুকু মেধা নিয়েই মানুষ জন্মাক না কেন, সুশৃঙ্খল জীবনছন্দের অভাবে প্রায় ক্ষেত্রেই সেসব মেধা ও শক্তির অপচয় হয়। সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার মেলবন্ধনে ছাত্রজীবনে অর্জিত হয় শৃঙ্খলার ছন্দ। এ ক্ষেত্রে ছন্দপতন ঘটলে জীবনে বিপর্যয় ঘটতে পারে। বস্তুত, জীবনের গঠন-পর্বে শৃঙ্খলাবোধের বীজ আবাদ করলেই মানবজীবনে একসময় সোনা ফলে।

শৃঙ্খলাবোধ অর্জনের উপায় : শৃঙ্খলাবোধ আত্মস্থ করার জন্যে অবশ্যই কতিপয় রীতিনীতি অনুসরণ করা জরুরি। প্রথমত প্রয়োজন সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলা। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। মর্যাদা অনুসারে মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক অনুসরণ করতে শেখা সামাজিক শৃঙ্খলার প্রাথমিক পদক্ষেপ। শৃঙ্খলাবোধ অর্জনের ক্ষেত্রে উত্তম নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের অনুশীলন দরকার। জ্ঞান ও চিন্তার প্রসারতাও শৃঙ্খলাবোধ অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : আমাদের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে বিশৃঙ্খলা । আর তাই স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া ও মাদকমুক্ত জীবনযাপন অবশ্যই শৃঙ্খলাবোধের পর্যায়ভুক্ত। কায়িক পরিশ্রম কখনো মানুষকে ছোট করে না বরং স্বাস্থ্যের জন্যে তা জরুরি। এভাবে শারীরিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সম্ভব। বিশৃঙ্খলা পরিহার করে জীবনকে সুন্দর করার জন্যে শৃঙ্খলাবোধের বিকল্প নেই। সুশৃঙ্খল জীবনে প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার হয়। মহান ব্যক্তিদের জীবনে তা দেখা যায়। চিন্তা ও কর্মে শৃঙ্খলা অনুসরণ করলে মানুষ মহৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। দায়িত্বের প্রতি সৎ ও একাগ্র থাকাটাও শৃঙ্খলার এক মৌলিক অংশ। নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্যে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন অপরিহার্য।

শৃঙ্খলাবোধ ও যান্ত্রিকতা : শৃঙ্খলা কাম্য হলেও কখনো কখনো শৃঙ্খলার বাড়াবাড়ি জীবনের স্বাভাবিক গতিচ্ছন্দের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের আতিশয্য যদি শৃঙ্খলা না হয়ে শৃঙ্খল হয়ে পড়ে তবে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। মানুষের জীবন তখন যন্ত্রের জীবনে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে, জীবন-অনুগামী শৃঙ্খলার স্বাভাবিক ধারাতেই জীবন স্বচ্ছন্দে বিকশিত হয়।

উপসংহার : শৃঙ্খলাই হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতির জীবনের সুষমাময় সৌন্দর্য। অশিষ্ট আচরণ, অন্যায় জবরদস্তি, অবৈধ পেশিশক্তি মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে তছনছ করে দেয়। এসব জাতীয় অগ্রগতির পথেও মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, জাতির উন্নতি আর সার্বিক অগ্রগতির ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির শৃঙ্খলাবোধ। প্রতিটি ব্যক্তির সুশৃঙ্খল চিন্তা, কর্ম ও আচরণের শক্তিতেই জাতি বিশ্বসভায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

শিষ্টাচার

ভূমিকা : আচরণে বিনয় ও পরিশীলিত রুচিবোধের সমন্বিত অভিব্যক্তির নাম শিষ্টাচার। শিষ্টাচার সুন্দর মনের মাধুর্যময় আচরণিক প্রকাশ। মানুষের মাঝে লালিত সুন্দরের প্রকাশ তাঁর চরিত্র। শিষ্টতা সেই সুন্দরের প্রতিমূর্ত রূপ। শিষ্টতা মানুষের চরিত্রকে করে আকর্ষণীয়। যে মানুষ যত বেশি শিষ্ট, অন্যের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও তত বেশি।

শিষ্টাচার কী : সাধারণভাবে আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় বিনয়, নম্রতা আর সৌজন্যের পরিচয়ের নাম শিষ্টাচার। আচরণে মার্জিত না হলে, ব্যবহারে উগ্রতা পরিহার না করলে মানুষ শিষ্টাচারী হতে পারে না। স্বভাবে দাম্ভিকতা ও কর্কশতা পরিহার করতে না পারলে মন মাধুর্যময় হয় না। মানবিক সত্তা যতই চরিত্রের মাধুর্য অর্জন করে ততই সে হয়ে ওঠে স্বভাবে শিষ্ট। শিষ্টতা ব্যক্তির আচরণকে করে মার্জিত, বাচনকে করে সৎ ও সুললিত। শিষ্টাচারহীন মানুষ

সবসময় উদ্ধত থাকে। তার আচরণে প্রাধান্য পায় অবজ্ঞা, ঔদ্ধত্য, দুর্ব্যবহার ও দুর্মুখতা। অহংকার অন্যকে ছোট ভাবতে প্ররোচিত করে। কিন্তু শিষ্টতা মানুষকে সম্মান করতে প্রণোদনা দেয়।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব : শিষ্টাচার ব্যক্তিস্বভাবে দেয় আলোর দীপ্তি। সে আলো ব্যক্তির পরিমণ্ডল থেকে ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজে, রাষ্ট্রে। এর আলোতে উজ্জ্বল ব্যক্তির আত্মিক মুক্তির সাথে যোগ হয় মানবিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। শিষ্টজন তাঁর সৌজন্য আর বিনয়ের মাধ্যমে সকলের প্রিয়তা অর্জন করেন, অর্জন করেন অন্যের আস্থা। অন্যের সহানুভূতি, প্রীতি ও সম্মান লাভ করার জন্যে শিষ্টজনই উত্তম। তাই সামাজিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্যে শিষ্টাচারের বিকল্প নেই। এতে করে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সকলের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজ হয় শান্তি ও সম্প্রীতির আকর।

ছাত্রজীবনে শিষ্টাচার : জ্ঞানার্জনে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ আর শৃঙ্খলাবোধের পাশাপাশি ছাত্রজীবনে শিষ্টাচার অনুশীলন খুবই জরুরি। সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ছোঁয়াতেই ছাত্র হয় বিনীত ও ভদ্র। কোনো ছাত্রের কাছে অমার্জিত, রূঢ় ও দুর্বিনীত আচরণ কখনো কাম্য নয়। শিষ্টাচার ও সৌজন্য ছাত্রজীবনে মনুষ্যত্ব অর্জনের সোপান। সৌজন্য ও শিষ্টাচারের অভাব ঘটলে ছাত্রের জীবন থেকে ভালোবাসা, মমতা, সহানুভূতি, বিনয় ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তি হারিয়ে যায়। সে হয়ে ওঠে দাম্ভিক, স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর। নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষের জন্যে তাই ছাত্রজীবনেই ব্যবহারে ভব্যতা আর শিষ্টতার সম্মিলন ঘটানোর কোনো বিকল্প নেই।

শিষ্টাচার ও সমাজজীবন : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তা না হলে সমাজে দেখা দেয় অসহিষ্ণুতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিষ্ঠুরতা। শিষ্টাচারের অভাব ঘটলে সমাজ হয়ে ওঠে প্রীতিহীন। সমাজ আচ্ছন্ন হয় বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানি আর অশান্তিতে। তা সমাজজীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। শিষ্টাচারহীন সমাজ হয়ে ওঠে অন্তঃসারশূন্য, বিবেকহীন। সমাজে সৌন্দর্য আর সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো হারিয়ে যেতে বসে। প্রেম, প্রীতি ও মমতার অভাবে মানুষ হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, হয়ে পড়ে স্বার্থান্বেষী ও আত্মকেন্দ্রিক।

শিষ্টাচার অর্জনের উপায় : শিষ্টাচার আপনা-আপনি মানবহৃদয়ে জন্ম নেয় না। একে অর্জন করে নিতে হয়। এ জন্য শিষ্টাচরের চর্চা শুরু করতে হয় শিশুকাল থেকেই। শৈশবে সৌজন্যবোধের পাঠ নিলে ভবিষ্যতে শিশু মার্জিত স্বভাবের অধিকারী হয়। তাই শিশু কোন পরিবেশে, কার সাহচর্যে, কীভাবে বেড়ে উঠছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথি কিংবা প্রতিবেশী যাদের সাহচর্যে থাকে তাদের কাছ থেকেই আচরণ শেখে। তাই সৎসঙ্গ শিষ্টাচারী হতে সাহায্য করে। স্কুল-কলেজেও শিক্ষার্থীরা শিষ্টাচারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। সংস্কৃতি চর্চা ও রুচিবান মানুষের সংসর্গও শিষ্টাচার শিক্ষার অনুকূল। ভালো বইও একজন সৎ অভিভাবকের মতোই শিষ্টাচার শেখাতে পারে।

উপসংহার : শিষ্টাচার হচ্ছে সৎ চরিত্র গড়ার অন্যতম বুনিয়াদ। মার্জিত, রুচিশীল ও সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ ও জাতীয় জীবনে রাখতে পারেন বিশেষ অবদান। পক্ষান্তরে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অপসংস্কৃতি শিষ্টাচারের অন্তরায়। তা প্রতিনিয়ত মানবিক মূল্যবোধগুলো ধ্বংস করে ব্যক্তির চরিত্রকে কলুষিত করতে পারে। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ে জাতি হয়ে পড়তে পারে দুর্বল ও ক্ষীণপ্রাণ। সাম্প্রতিককালে তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে যে অশোভনতা, ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ ঘটছে তা পরিভোগপ্রবণ পণ্যসংস্কৃতি বিস্তারের ফল। এটা জাতির লাবণ্যহীন হওয়ারই লক্ষণ। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সুস্থতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে তাই আমাদের শিষ্টাচারের চর্চা করা উচিত।

শ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা : শ্রম প্রতিটি মানুষের মধ্যেকার আশ্চর্য নিহিত শক্তি। এই শ্রমের শক্তিতেই মানুষ রচনা করেছে মানবসভ্যতার বুনিয়াদ। আদিম যুগে একদা পাথরের নুড়ি দিয়ে শ্রমের সাহায্যে মানুষ তৈরি করেছিল প্রথম হাতিয়ার। তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ তিল তিল শ্রমে গড়ে তুলেছে সভ্যতার বিরাট সৌধ। শ্রমের কল্যাণেই মানুষ পশুজগৎ থেকে নিজেকে করেছে পৃথক। মানুষ যে আধুনিক যন্ত্র চালায়, সূক্ষ্ম ছবি আঁকে, কিংবা অপরূপ সুরের ঝংকার তোলে—তার মূলে রয়েছে শ্রমের অবদান।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : মানবসভ্যতা শ্রমেরই অবদান। কিন্তু শ্রমের প্রতি মনোভাব সবসময় একরকম ছিল না। আদিম সমজে যৌথশ্রমের মূল্য ছিল। কিন্তু সমাজে শ্রেণীবিভেদ দেখা দিলে শ্রম মর্যাদা হারাতে থাকে। প্রাচীন রোম ও মিশরে শ্রমজীবীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তাদের গণ্য করা হত ক্রীতদাস হিসেবে। সামন্তযুগে কৃষকরাই শ্রমজীবীর ভূমিকা পালন করেছে। তারাও ছিল মর্যাদাহীন, শোষিত ও বঞ্চিত। শিল্পবিপ্লবের পর পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রমিকরা শোষিত হলেও তারা গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করে। রুশবিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলে শ্রমিকরা মর্যাদা পায় সবচেয়ে বেশি।

শ্রমের মহিমা : শ্রম কেবল সমৃদ্ধির উৎস নয়। তা মানুষকে দেয় সৃজন ও নির্মাণের আনন্দ। মানুষ যে প্রতিভা নিয়ে জন্মায় তার বিকাশের জন্যও দরকার শ্রম। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ গড়ে তোলে নিজের ভাগ্যকে। পৃথিবীতে যা-কিছু মহান সৃষ্টি তা মূলত শ্রমেরই অবদান।

দৈহিক ও মানসিক শ্রম : মানব-ইতিহাসে দেখা যায়, পরজীবী শ্রেণীর সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সামাজিক অসাম্য। মজুর-চাষি-মুটে-কুলি, যারা কায়িক শ্রম করে তাদের অবস্থান হয় সমাজের নিচের তলায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন মানবেতর জীবন হয় তাদের নিত্যসঙ্গী। অন্যদিকে পরজীবী শ্রেণী ডুবে থাকে বিলাসিতায়। সমাজে শ্রমজীবী মানুষের নিদারুণ দুরবস্থাই মানুষের মনে শ্রমবিমুখতার জন্ম দিয়েছে। কায়িক শ্রমের প্রতি সৃষ্টি হয়েছে একধরনের অবজ্ঞা ও ঘৃণার মনোভাব। এর ফল কল্যাণকর হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে সমাজের সেবা করছে। কোনোটা দৈহিক শ্রম, কোনোটা মানসিক শ্রম। তাই কোনোটিকেই অবহেলা করা বা ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

শ্রমের গুরুত্ব : দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্যে, সমাজ ও জাতির অগ্রগতির জন্যে শ্রম এক অপরিহার্য উপাদান। অজস্র মানুষের দেখা-অদেখা শ্রমের সমাহারের ওপর নির্ভরশীল আমাদের সবার জীবন ও কর্ম। তা দৈহিক ও মানসিক দু' ধরনের শ্রমের অদৃশ্য যোগসূত্রে বাঁধা। এ কথা স্বীকার না করে আমাদের উপায় নেই যে, মজুর এবং ম্যানেজার, কৃষক এবং কৃষি অফিসার, কুলি এবং কেরানি, শিক্ষক এবং শিল্পী—কারো কাজই সমাজে উপেক্ষার নয়। প্রত্যেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। একথা মনে রেখে সবাইকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে।

উপসংহার : শত শত শতাব্দীর পর বিশ শতকের পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের সামনে এক নবযুগ আসে। মেহনতি মানুষের মর্যাদা দিতে বাধ্য হয় সমাজের উপরতলার মানুষ। সোভিয়েত ইউনিয়নে, চীনে, ভিয়েতনামে এবং আরো অনেক দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় মেহনতি মানুষ পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিজ্ঞানের কল্যাণে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সমাজে শ্রমের গুরুত্ব এখন অনেক স্বীকৃত। শ্রমশক্তিই যে সমাজ-সভ্যতার নির্মাণ ও সাফল্যের চাবিকাঠি, বিশ্ব আজ তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের বহু অধিকার ও মর্যাদা ক্রমেই স্বীকৃতি লাভ করছে। আমরাও যদি সবার শ্রমকেই সমান মর্যাদা দিই তবে দেশ ও জাতি দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে, যথার্থ কল্যাণ সাধিত হবে।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

ভূমিকা : জন্মের জন্যে আমরা মাতাপিতার কাছে ঋণী। এই ঋণ অপরিশোধ্য। এ জন্য প্রত্যেক ধর্মেই পিতামাতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'। 'জননী স্বর্গ অপেক্ষা গরিয়সী'। 'পিতা ধর্ম, পিতা কর্ম, পিতাই পরম তপস্যার ব্যক্তি'। পিতামাতা যেমন আমাদের স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ছোট থেকে বড় করেছেন, তেমনি পিতামাতার প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে।

সন্তানের জীবনে মা-বাবার অবদান : প্রত্যেক মা-বাবাই সীমাহীন আত্মত্যাগ করে পরম স্নেহে সন্তানকে বড় করে তোলেন। সন্তানকে লালন-পালন করা, তার লেখাপড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মা-বাবা সারাজীবনই উদ্বিগ্ন থাকেন। মা-বাবা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না পরে ভালো পোশাকটি সন্তানের গায়ে তুলে দেন। সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠায় মা-বাবা বিনিদ্র রজনী কাটান। সন্তানের যে-কোনো অমঙ্গল মা-বাবার জন্য বেদনার কারণ হয়। কঠোর পরিশ্রম আর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মা-বাবা যা আয়-রোজগার করেন, তা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের জন্যই ব্যয়

করেন। বটবৃক্ষের মতো মা-বাবার আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সন্তান বড় হয়, বিকশিত হয়। সন্তানের প্রতি মা-বাবার এই যে মায়া-মমতা, তা স্বর্গীয়। সন্তানের জীবনে মা-বাবা আশীর্বাদস্বরূপ। তাই কোনো অবস্থাতেই মাতাপিতাকে অবহেলা করা সন্তানের জন্য গর্হিত কাজ। মাতাপিতার মনে কষ্ট জাগে, এমন আচরণ ও কথা কখনো বলা উচিত নয়।

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য : সন্তানের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা। তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁদের প্রতি সবসময় বিনম্র আচরণ করা। মনে রাখতে হবে, মাতাপিতার শাসনের আড়ালে থাকে ভালোবাসা, মঙ্গল কামনা। তাঁদের মতো অকৃত্রিম স্বজন পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

মাতাপিতা যেমনই হোক না কেন, সন্তানের কাছে তারা সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাই তাঁদের অবাধ্য হওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়। অবাধ্য সন্তান মাতাপিতার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃতী সন্তান পিতামাতার কাছে মাথার মুকুটস্বরূপ। যে সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, তারা জীবনে সাফল্য লাভ করে। হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রা) ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছেন মিথ্যাকথা না বলে। এতে ডাকাত সর্দার অভিভূত হয়ে সৎপথ অবলম্বন করেছিল। হযরত বায়েজিদ বোস্তামির (রা) অসুস্থ মাতার শিয়রে সারারাত পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের ডাকে দুর্যোগপূর্ণ রাতে সাঁতার দিয়ে দামোদর নদী পার হওয়ার কাহিনী কে না জানে। এঁরা সকলেই জীবনে সফল হয়েছেন এবং মহান ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। কাজেই মাতাপিতার কথা মেনে চলা এবং তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালন করা আমাদের জীবনে সফলতার সোপানও বটে।

অনেক মাতাপিতা আছেন, তাঁরা নিজে অশিক্ষিত হয়েও সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দান করেন। সেই সন্তান পড়ালেখা করে উচ্চপদে আসীন হয়ে অনেক সময় তাদের মাতাপিতার প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দূরে থাক, ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালন করেন না। এটা সবচেয়ে দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। কোনো সুসন্তান কখনো মা-বাবার প্রতি এমন অমানবিক আচরণ করতে পারে না। বৃদ্ধ অবস্থায় মা-বাবা সন্তানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁদের অসুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক নজর দিতে হবে। তাঁদের সেবা-শুশ্রূষার প্রতি যত্নশীল হওয়া সন্তানের একান্ত কর্তব্য।

উপসংহার : পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সুসন্তান হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে মা-বাবার সেবা ও তাঁদের প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালন করে সন্তান হিসেবে নিজের জন্মঋণ শোধ করা উচিত। যদিও মা-বাবার ঋণ অপরিশোধ্য, তবু তাঁদের যেন অযত্ন, অবহেলা না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের মনে কষ্ট হয়, এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষত, বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা যদি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না পান, এর চেয়ে দুঃখের আর পরিতাপের কিছু নেই। এ অমানবিক ও হীন কাজ কেউ যেন না করে।

স্বদেশপ্রেম

ভূমিকা : স্বদেশপ্রেম জন্মভূমির জন্যে মানুষের একধরনের অনুরাগময় ভাবাবেগ। স্বদেশপ্রেম বলতে বোঝায় নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসা। জন্মসূত্রে জন্মভূমির সঙ্গেই গড়ে ওঠে মানুষের নাড়ির যোগ। স্বদেশের জন্যে তার মনে জন্ম নেয় নিবিড় ভালোবাসা। এই অনন্য ভালোবাসাই হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ : জন্মভূমির মাটি, আলো-বাতাস, অন্ন-জলের প্রতি মানুষের মমত্ব অপরিসীম। জন্মভূমির ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি থাকে তার একধরনের আবেগময় অনুরাগ। জন্মভূমির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সঙ্গে গড়ে ওঠে তার শেকড়ের বন্ধন। স্বদেশের প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি এই অনুরাগ ও বন্ধনের নাম স্বদেশপ্রেম। মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসার আবেগময় প্রকাশ ঘটে স্বদেশপ্রেমের মধ্যে। সেই তীব্র আবেগের পরিচয় আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বন্দনায় :

> ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
> সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে।’

স্বদেশপ্রেম মানুষের অন্তরে সদা বহমান থাকে। বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তা আবেগ-উদ্বেল হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনামলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্তের দেশাত্মবোধক গানে-কবিতায় স্বদেশপ্রেমের আবেগময় প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৩০-এ মাস্টারদা-র নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ স্বদেশপ্রেমেরই বলিষ্ঠ প্রকাশ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে জ্বলন্ত প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে একপ্রাণ হয়ে মহৎ লক্ষ্য সাধনে ব্রতী করে।

স্বদেশপ্রেমের ভিন্নতর বহিঃপ্রকাশ : কেবল স্বাধীনতা অর্জন কিংবা স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামেই দেশপ্রেম সীমাবদ্ধ থাকে না, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করাতেও স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটে। শিল্প-সাহিত্য চর্চায় কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখে, বিশ্ব-সভ্যতায় অবদান রেখে বিশ্বসভায় দেশের গৌরব বাড়ানো যায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জগদীশচন্দ্র বসু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এফ আর খান, ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রমুখের অবদানে বিশ্বে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

স্বদেশপ্রেমের বিকৃত রূপ : স্বদেশপ্রেম পবিত্র। তা দেশ ও জাতির জন্যে গৌরবের। কিন্তু উগ্র ও অন্ধ স্বদেশপ্রেম কল্যাণের পরিবর্তে রচনা করে ধ্বংসের পথ। অন্ধ স্বদেশপ্রেম উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তা জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানিতে হিটলার ও ইতালিতে মুসোলিনি উগ্র জাতীয়তা ও অন্ধ দেশপ্রেমের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। তার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লাখ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। বিপন্ন হয়েছিল বিশ্বমানবতা।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম : স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমেরই একটি অংশ। দেশকে ভালোবেসে মানুষ বিশ্বকে ভালোবাসতে পারে। তাই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কখনো বিশ্বপ্রেমের পথে বাধা হতে পারে না। বস্তুত, বিশ্বমায়ের বুকের আঁচলের ওপর দেশজননীর ঠাঁই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর বাণীতে বলে গেছেন সে কথা—

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

দেশপ্রেমের উজ্জ্বল প্রতিভূ : অনন্য দেশপ্রেমের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে দেশে দেশে। সারা বিশ্বের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত তাঁরা। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য অবদান রেখেছেন অনেক বাঙালি। তাঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ চিরদিন আমাদের প্রেরণা হয়ে থাকবেন। বিশ্বের দেশে দেশে বহু রাষ্ট্রনায়ক দেশ ও জাতিকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইতালির গ্যারিবাল্ডি, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, রাশিয়ার লেনিন, চীনের মাও সে তুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা, ভারতের মহাত্মা গান্ধী এবং বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ রচনা করেছেন দেশপ্রেমের অমরগাথা।

উপসংহার : স্বদেশপ্রেম এক জ্বলন্ত মহৎ প্রেরণা। সে প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনার উর্ধ্বে উঠি। যুক্ত হই সমষ্টির কল্যাণচেতনায়। দেশের সংকটে ঐক্যবদ্ধ হই। সর্ব অমঙ্গল থেকে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হই। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিতে সাধ্যমতো অবদান রাখি। স্বদেশপ্রেমের ভেতর দিয়েই আমরা বিশ্বপ্রেমের সেতুবন্ধন রচনা করতে পারি।

কর্তব্যনিষ্ঠা
(সংকেত)

ভূমিকা : কর্তব্যনিষ্ঠা মানবজীবনে সাফল্য লাভের অন্যতম উপায়। জীবন ও সমাজের অগ্রগতির জন্য কর্তব্যনিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম।

কর্তব্যের ধরন : কর্মজীবনে মানুষকে নানারকম কর্তব্য পালন করতে হয়। পারিবারিক, পেশাগত, সামাজিক ইত্যাদি কর্তব্য এর মধ্যে পড়ে।

কর্তব্যনিষ্ঠার গুরুত্ব : দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্তব্যনিষ্ঠার গুরুত্ব অনেক। কর্তব্যে শৈথিল্য দেখালে দায়িত্ব সুচারুভাবে পালিত হয় না। কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা থাকে না। এতে সমাজে অমঙ্গল দেখা দেয়।

কর্তব্যনিষ্ঠার ভিত্তি : ভালোভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। অনেক কর্তব্যে পালনের জন্য দীর্ঘদিনের শ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় একাগ্রতার। বস্তুতপক্ষে, নিষ্ঠা ছাড়া জীবনে সাফল্য আসে না।

কর্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার : জীবনে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনই কর্তব্যনিষ্ঠার বড় পুরস্কার।

উপসংহার : বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কর্তব্যনিষ্ঠ লোকের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের এ যুগে সাফল্য ও অগ্রগতির বহুলাংশ নির্ভর করে কর্তব্যনিষ্ঠার ওপর।

সত্যবাদিতা
(সংকেত)

ভূমিকা : সত্যবাদিতা ব্যক্তিমানুষের আচরণগত একটি মূল্যবোধ। এটি মানুষের অন্যতম একটি মহৎ গুণ ও আদর্শ। এই গুণ অন্যের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের সহায়ক।

সত্যবাদিতার গুরুত্ব : সত্যবাদী লোক সমাজে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হন। বিভিন্ন ধর্মে সত্যবাদিতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজজীবনেও সত্যবাদিতার পরিণতি সবসময় মঙ্গলজনক হয়ে থাকে।

সত্যবাদিতার সুফল : সত্য অনুসন্ধান করেই মানুষ জীবন ও জগতের রহস্য উন্মোচন করেছে। সত্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও সভ্যতা। মানুষ মানুষে আস্থা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তি সত্যবাদিতা।

মিথ্যার কুফল : সমাজের অন্যায় ও অপরাধমুলক কাজের সঙ্গে মিথ্যার সম্পর্ক। সাময়িকভাবে কখনো কখনো মিথ্যার জয় হয়, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় সত্যেরই হয়ে থাকে।

উপসংহার : মানবসমাজের অগ্রগতি ও কল্যাণের ভিত্তি সত্যবাদিতা। তাই শৈশব থেকেই সবার আদর্শ হওয়া উচিত 'সত্য কথা বলা ও সত্য পথে চলা'।

জনসেবা
(সংকেত)

ভূমিকা : সেবা মানবচরিত্রের এক মহৎ গুণ। আর্তজনের সেবার মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে পাওয়া যায়। অন্যের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহান ব্রতের নামই জনসেবা। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মেই মানবসেবার কথা বলা হয়েছে। যীশুখ্রিস্ট, গৌতমবুদ্ধ, হযরত মুহম্মদ (স) প্রমুখ মনীষী জীবনে জনসেবার অজস্র উদাহরণ রেখে গেছেন।

জনসেবার স্বরূপ : নানাভাবে জনসেবা করা যায়। অর্থ দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, শুশ্রূষা করে, দুর্বলের পাশে সবল হয়ে দাঁড়িয়ে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়ে, জনকল্যাণে পথ, ঘাট, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেও জনসেবা করা যায়। তবে জনসেবার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নিঃস্বার্থ। কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জনসেবা করা উচিত নয়।

সমাজজীবনে চলতে গেলে একে অপরকে সাহায্য করতে হয়। পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া কেউ চলতে পারে না। বিপদে-আপদে, প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ানোই হচ্ছে মনুষ্যত্বের মহান দায়িত্ব। এজন্য কবি বলেছেন—

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

কোনো নাম-যশের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করাই প্রকৃত জনসেবা।

জনসেবার মহিমা : জনসেবা একটি মহৎ কাজ। মহৎ হৃদয়ের মানুষই কেবল জনসেবা করতে পারে। কোনো প্রতিদানের আশায় নয়, অপরের প্রয়োজনে যে আত্মোৎসর্গ করতে পারে সে-ই মহৎ মানুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক মহৎ হৃদয়ের মানুষ আছেন, যাঁরা মানবকল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে রয়েছেন।

উপসংহার : জনসেবা মানুষের এক মহৎ হৃদয়বৃত্তি, অনন্য মানবধর্ম। উদার মনের মানুষ জনসেবার মাধ্যমে অনাবিল সুখ ও শান্তি খুঁজে পায়। কথায় বলে—'অন্যের জীবন বাঁচাবার জন্য যে জীবন দিতে পারে, বাঁচার অধিকার একমাত্র তারই আছে।'

খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা : ক্রীড়া বা খেলাধুলা শরীরচর্চা ও আনন্দ লাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্রিয়াকলাপ। সুন্দর ও সুস্থ জীবন গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, এমনকি জাতীয় জীবনের সফলতা লাভের পেছনে কাজ করে সুস্থ ও সুঠাম দেহ। আর এই সুস্থ দেহ গঠনের জন্যে খেলাধুলা অপরিহার্য।

খেলাধুলার উদ্ভব : সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষকে সুস্থদেহী, সবল ও কর্মক্ষম করে রাখার জন্যে বিভিন্ন খেলার প্রচলন ছিল। কুস্তি খেলার প্রথম সূচনা হয় ইরাকে, ৪০০০ বছরেরও বেশি আগে। খ্রিস্টপূর্ব ২০৫০ বছর আগে মিশরে শুরু হয় হকি খেলা। এ ছাড়া মুষ্টিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদির ইতিহাসের সূচনাও প্রায় ৪০০০ বছর আগে। প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক খেলার সূত্রপাত। সেই বিশাল প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলীরা দৌড়, ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। এভাবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে।

ব্যক্তিত্ব অর্জনে খেলাধুলা : ব্যক্তিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি প্রবাদে বলা হয় : All work and no play make Jack a dull boy. বস্তুত, মনের সতেজতা ও প্রাণময়তা বৃদ্ধিতে খেলাধুলার ভূমিকা যথেষ্ট। খেলাধুলায় রয়েছে সুস্থ প্রতিযোগিতা। তা অনুশীলনের মাধ্যমে মনে আত্মবিশ্বাস ও সবলতার জন্ম দেয়। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব অর্জনের মাধ্যমে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা সহজ হয়ে ওঠে। খেলাধুলা অনেক ক্ষেত্রে মানসিক দুশ্চিন্তা লাঘবের উপায়। তা ছাড়া দাবা, তাস ইত্যাদি চিন্তামূলক খেলা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করে। আত্মশক্তি অর্জনে খেলাধুলার ভূমিকা অসামান্য। ছোটবেলায় যিনি নানা রোগে ভুগে মরতে বসেছিলেন সেই জনি ওয়াইজমুলারই অলিম্পিক সাঁতারে সোনা জয় করেন। ১৯৬০-এর অলিম্পিক দৌড়ে তিনটি সোনা বিজয়ী 'হিউম্যান লোকোমোটিভ' নামে পরিচিত চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জটোপেক ছোটবেলায় খুঁড়িয়ে চলতেন।

শিক্ষায় খেলাধুলা : জীবন গঠনের সূচনায় সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই খেলাধুলা শিক্ষার উপায়। উন্নত বিশ্বে বিদ্যাশিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করতে শিক্ষাব্যবস্থায় এখন খেলাধুলা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে টেবিল টেনিস, ব্যায়াম, দাবা, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা থাকে। আজকাল ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলায় উৎসাহী করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

মানব-মৈত্রী গঠনে খেলাধুলা : খেলাধুলা দেশে-দেশে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করায়ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের সবচেয়ে বড় সম্মেলন অলিম্পিক গেমস্। এই বিশাল ক্রীড়া সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় সব দেশের হাজার হাজার খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। ২০০০ সালে সিডনি অলিম্পিকের অনুপম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিটি বিশ্ববাসী অনুভব করেছে, দেশভেদ জাতিভেদ সত্ত্বেও মানুষ এক ও অভিন্ন সত্তা। অলিম্পিক ছাড়াও এমনিভাবে ক্রিকেট ও ফুটবল বিশ্বকাপ, ইউরোপিয়ান গেমস, এশিয়ান গেমস ইত্যাদি বহু খেলার আসর আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রক্ষায় সহায়তা করে। এভাবে বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের জয়গান ধ্বনিত হয়।

স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধে খেলাধুলা : স্বাস্থ্য বজায় রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। শরীরের কোষগুলোর পুষ্টিসাধন, সহজ ও স্বাভাবিক রক্তচালনা, পরিপাকযন্ত্রকে কর্মক্ষম রাখা প্রভৃতির জন্যে প্রত্যেকের উচিত প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো শারীরিক খেলায় অংশ নেওয়া বা শরীরচর্চা করা। শুধু স্বাস্থ্য উন্নয়নেই নয়, বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি থেকে স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতেও খেলাধুলা প্রয়োজনীয়। হৃৎপিণ্ডের ও ফুসফুসের বিভিন্ন অসুখ প্রতিরোধেও প্রয়োজন খেলাধুলা। খেলাধুলা মানুষের মনের দুশ্চিন্তা লাঘব করে, সহনশীলতা বাড়ায় এবং দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সাঁতারের মতো খেলাধুলা মানুষের ফুসফুসের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। মেদ চর্বি ইত্যাদি দূর করে সুন্দর ও সুঠাম শরীর গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই।

চরিত্র গঠনে খেলাধুলা : খেলাধুলা মানুষের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করে। খেলাধুলার নিয়মকানুন মেনে চলতে গিয়ে মানুষ শেখে নিয়মানুবর্তিতা। খেলাধুলা মানুষকে করে সুশৃঙ্খল। কোচ ও রেফারির কথা মান্য করে দলপতি। দলপতির অধীনে দলবন্ধ হয়ে খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়রা সকলে মিলেমিশে কাজ করার শিক্ষা পায়। এভাবে যৌথ পরিকল্পনা, যৌথ কাজ ও যৌথ শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ নৈতিকভাবে সবল হয়ে ওঠে।

অত্যধিক খেলাধুলার অপকারিতা : খেলাধুলা অনেক উপকার করলেও এর কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খেলাধুলা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকি হতে পারে। ফুটবল, কাবাডি, রাগবি, কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদি খেলায় রয়েছে মারাত্মকভাবে আহত হবার আশঙ্কা। অতিরিক্ত ক্রীড়া-আসক্তি অনেক সময় জীবনের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় কোনো প্রতিযোগিতায় পরাজিত দল ও তাদের অন্ধ সমর্থকরা জয়ী দলের বা তাদের সমর্থকদের সাথে মারামারি বাধিয়ে দেয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে এ ধরনের উগ্রপন্থী মনোভাব কখনও কাম্য হতে পারে না।

উপসংহার : খেলাধুলা যেমন শরীর-গঠনের সহায়ক তেমনি আনন্দদায়ক। প্রতিটি খেলায় থাকে একধরনের কর্তব্যবোধ। খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষ দায়িত্বশীল হয় কর্তব্য সম্পাদনে, একই সঙ্গে পায় মর্যাদা অর্জনের শিক্ষা। ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে আমাদের তরুণ খেলোয়াড়দের অর্জন জাগরণ ঘটিয়েছে জাতির মর্যাদাবোধের। জাতীয় জীবনে খেলাধুলার প্রসার ঘটলে জাতি সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে শেখে, ঐক্যচেতনা গড়ে ওঠে। জাতি এগিয়ে যেতে পারে নিত্যনতুন অর্জনের পথে।

বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশ

ক্রিকেটকে নিয়ে এখন সারা বিশ্বে কৌতূহলের অন্ত নেই। এই কৌতূহল চূড়ায় পৌঁছায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে। উপমহাদেশে শুরু হয় ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি। এখন বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে ক্রিকেট-জ্বর।

ক্রিকেটের জন্ম সুদূর ব্রিটেনে। ব্রিটেনে ক্রিকেট খেলার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের আমলের একটি গ্রন্থে। একটা সময় ছিল যখন ক্রিকেট খেলত শুধুই ব্রিটিশরা, পরে ব্রিটিশদের বিশাল সাম্রাজ্যে (উপনিবেশে) এই খেলা ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশদের হাত ধরেই।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন আমলেই প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করে ক্রিকেট খেলা। অবিভক্ত বাংলায় ১৭৯২ সালে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববাংলায় ক্রিকেটের প্রচলন ঘটিয়েছিল ব্রিটিশরাই। তখন অবশ্য ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরাই কেবল ক্রিকেট খেলতেন। পাকিস্তান আমলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মূলত বাংলাদেশে ক্রিকেটচর্চা পরিপূর্ণভাবে শুরু হয় সত্তরের দশকের শেষার্ধে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বিশ্বকাপ জয় করার পর বাংলাদেশের ক্রিকেট গতিশীলতা লাভ করে। এরপর সময়ের সাথে সাথে পরিপক্বতা লাভ করে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট।

বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল ৭০-এর দশকের শেষদিকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথম সাংগঠনিক স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৭৭ সালের ২৬শে জুলাই। এই সময় বাংলাদেশ আইসিসি-র সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয়। তাতে বাংলাদেশ ফিজি ও মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল।

আইসিসি-র পূর্ণ সদস্য না হয়েও বিশ্বক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৮৬ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হয় এ যাত্রা। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের ক্রিকেট যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তার প্রথম সফল প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৯৭ সালের আইসিসি ট্রফি জয়ের মাধ্যমে। এ ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটের সংগঠক ও খেলোয়াড়দের ধৈর্য ও পরিশ্রমের অভাবনীয় ফসল। তা একদিনের ক্রিকেট মর্যাদা লাভের পথ প্রশস্ত করে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন ঘটনা ঘটে ক্রিকেটের ওয়ানডে পরিবারে অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভের মাধ্যমে।

টেস্ট-ক্রিকেটে বাংলাদেশ : বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সকে প্রধানত দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়: ১. টেস্ট স্ট্যাটাস পূর্ববর্তী; ২. টেস্ট স্ট্যাটাস পরবর্তী। এ হিসাবে দেখা যায় বাংলাদেশ ২০০১ সালের মধ্যে কেনিয়া, স্কটল্যান্ড এবং পাকিস্তানকে একবার করে হারিয়েছে। অপরদিকে ২০০১ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জিম্বাবুয়েকে চারবার, ভারতকে একবার, অস্ট্রেলিয়াকে একবার এবং নামিবিয়াকে একবার হারিয়েছে। এর মাঝে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া-বধের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে গিয়েছে শ্রেষ্ঠ অঘটন হিসেবে। এ সবই অবশ্য ওয়ানডে পারফরম্যান্স। টেস্টে বাংলাদেশের একমাত্র সাফল্য জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ১-০ তে সিরিজ জেতা। এ ছাড়া বাকি সবই ব্যর্থতার করুণ প্রদর্শনী। বাংলাদেশের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে যখন বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছিল, তখন ইংল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার ২৫০ রান তাড়া করে ৫ উইকেটের জয় সব সমালোচকের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। টেস্ট পরিবারের নবীনতম এবং বয়সের গড়ে সবচেয়ে তরুণ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অনেকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিখ্যাত। আফতাব, আশরাফুলের ঝড়ো ব্যাটিং, খালেদ মাসুদের দুর্দান্ত উইকেট কিপিং, রফিকের স্পিন কিংবা নড়াইল এক্সপ্রেস খ্যাত মাশরাফি এরা সকলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ : আইসিসি ক্রিকেট জয়ের দু বছর পর ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে এবং স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ৭ম বিশ্বকাপের ফেভারেট দল পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে নতুন চমক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে বাংলাদেশ। ৯৯-এর বিশ্বকাপ দিয়ে সূচিত হয় বাংলাদেশের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের নতুন অধ্যায়। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ বাজে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। কিন্তু ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট দল দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠায় সফল হয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পথে তারা ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে হারিয়ে অভাবনীয় চমক সৃষ্টি করে। ফলে ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য বিশ্লেষণের হিড়িক পড়ে যায়।

ক্রিকেটের উন্নয়নে পদক্ষেপ : ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্রিকেট আন্তর্জাতিক অঙ্গানে আরো ভালো অবস্থানে আরোহণ করবে সবাই তাই আশা করে। আর এ জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা, সর্বোপরি ভালো কোচিং। বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে বিব্রতকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রে ঘরোয়া লিগে টেস্ট ম্যাচ বা চারদিনের ম্যাচ চালু করা দরকার। এ ছাড়াও দরকার নিবিড়ভাবে অনুশীলন অব্যাহত রাখা এবং বাউন্সিং পিচে ব্যাটিং করা অনুশীলনের জন্য সেরকম পিচ তৈরি করে খেলার ব্যবস্থা করা। এসব পদক্ষেপ ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। তা ছাড়া ক্রিকেটে যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রাধান্য দিতে হবে। দেশীয় কোচদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ সঞ্চার করতে হবে, যেন নতুন নতুন দক্ষ ক্রিকেটার দেশে জন্ম নেয়।

উপসংহার : বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের দূত হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বিশ্বক্রিকেটে বাংলাদেশ সামান্য হলেও যে মর্যাদাটুকু লাভ করেছে তা বাড়িয়ে দিয়েছে দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সম্পাদনে সর্বমুখী ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বক্রিকেট অঙ্গানে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

খেলাধুলায় বাংলাদেশ
(সংকেত)

ভূমিকা : খেলাধুলা কেবল বিনোদনের অঙ্গ নয়। শারীরিক ও মানসিক সুস্থ বিকাশের ক্ষেত্রেও খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। সারা বিশ্বে নানা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খেলাধুলা পেয়েছে নতুন মাত্রা।

বাংলাদেশে খেলাধুলার ঐতিহ্য : বাংলাদেশে খেলাধুলার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে দেশীয় নিজস্ব খেলা ও বিদেশি খেলার সমন্বয়ে। বাংলার লোকায়ত খেলাধুলার মধ্যে রয়েছে : লাঠিখেলা, হা-ডু-ডু, কুস্তি, নৌকাবাইচ, ডাংগুলি, এক্কাদোক্কা, লুকোচুরি, দাঁড়িয়াবান্ধা, ঘুড়ি ওড়ানো, বউছি, সাঁতার, গোল্লাছুট ইত্যাদি। ঘরোয়া খেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবা, তাস, বাঘবন্দি, পাশা ইত্যাদি। বিদেশি খেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, মুষ্টিযুদ্ধ, ভলিবল, জুডো, শুটিং ইত্যাদি।

খেলার জগতে বাংলাদেশ : বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গানে নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। টেস্ট ক্রিকেট, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, সাফ গেমস, এশিয়ান গেমস, অলিম্পিক গেমস-এ অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গানে বাংলাদেশের পরিচিতি বাড়ছে। কোনো কোনো প্রতিযোগিতায় পদকও জিতে আনছে বাংলাদেশ।

উপসংহার : বাংলাদেশে খেলাধুলাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। খেলাধুলার মান উন্নত করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা, প্রচুর চর্চা ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলেই বাংলাদেশ খেলাধুলার জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

দেশভ্রমণ

ভূমিকা: জন্মসূত্রেই মানুষ কৌতূহলী প্রাণী। তাই অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। পরিচিত গণ্ডির বাইরে তার মনে ভিড় করে দূর অজানার নানা আকর্ষণ, যেখানে গেলে তার আনন্দ হবে, চিত্তের মুক্তি ঘটবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই লিখেছেন-

‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী-গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।’

কোথাও নদী-নির্ঝর, কোথাও গিরি-পর্বত, সবুজ অরণ্য, মরুভূমির ধূসর বালি, কোথাও বরফে ঢাকা সব —এ সবই মানুষের জন্য এক অদ্ভুত আকর্ষণ। এ আকর্ষণই মানুষকে টানে দেশভ্রমণে।

দেশভ্রমণের ইতিহাস ও শিক্ষা : আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আগে, প্রাচীনকালে ভ্রমণ ছিল শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। সেকালে মানুষ জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। বিখ্যাত পর্যটকদের কথা আমরা জানি—চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং, আরব পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার—এঁরা সবাই ভারতবর্ষ ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকেই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। সেসব বৃত্তান্তে ইতিহাসের অনেক তথ্য জানা যায়। প্রাচীনকালে যোগাযোগব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। তবু পরিব্রাজকরা হাজার প্রতিকূলতা অতিক্রম করে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন, অজানাকে জানার প্রয়োজনে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে রেখেছেন তাঁদের পদচিহ্ন। আধুনিক যুগে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশভ্রমণকে একেবারে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। এখন আমরা খুব সহজে, অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভ্রমণ করতে পারি।

শিক্ষা ও আনন্দের জন্য ভ্রমণ : ভ্রমণ মানুষের মনে নিয়ে আসে নতুন আনন্দের বন্যা। বাইরে প্রসারিত পৃথিবী, তার বিচিত্র নৈসর্গিক শোভা, মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন দেখে মন একটা ভিন্নতার স্বাদ পায়। শুষ্ক মন সজীব হয়ে

ওঠে। সংসারের সীমাবন্ধ জীবন আর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মাঝে মন হাঁফিয়ে ওঠে। ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতায় মানুষ হারিয়ে ফেলে মনের ঐশ্বর্য। বিরূপ বাস্তবতার কারণে অনেক সময় মানুষের মন রুক্ষ, বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে পারে। ভ্রমণ মানুষকে এসব থেকে মুক্তি দিতে পারে, দিতে পারে প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা। দেশভ্রমণে ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের যোগাযোগ ঘটায় বলে ভ্রমণ শুধু নিছক আনন্দের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে না, জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। বহির্বিশ্বকে নিজের চোখে দেখে যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, প্রাচীরঘেরা বিদ্যায়তনে তা অনেক সময় অর্জন করা সম্ভব হয় না। দেশভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের অধীত বিদ্যা পূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমনঃ ইতিহাস, ভূগোল এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের বইতে এমন অনেক ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ আছে, সেগুলি যদি নিজ চোখে দেখি, তখন প্রাচীন ইতিহাস আমাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেজন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষামূলক ভ্রমণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা ছাড়া একটা নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘকাল আবন্ধ থাকলে মানুষের হৃদয় ও মন সংকুচিত হয়ে যায়। চিত্তের স্বাভাবিক প্রসারতা ব্যাহত হয়। দেশভ্রমণের আনন্দই মানুষকে এসব সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। বৃহত্তর জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মুছে যায় মনের সব ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা। দেশভ্রমণ মনের বন্ধ দরজাগুলো খুলে দিয়ে চেতনার নতুন আলো ছড়ায় প্রাণে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন-

'আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী।'

মানুষের দূরাচারী কল্পনাই তাকে দেশান্তরের পথে টেনে নিয়ে যায়। কেউ বের হয় আবিষ্কারের নেশায়, কেউ তীর্থ দর্শনের পূর্ণ বাসনায়। নিছক আনন্দের জন্যেও কেউ কেউ দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। আজকাল শিক্ষা এবং বাণিজ্যের জন্য মানুষ দেশান্তরের অভিযাত্রী হয়। উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভ্রমণ মানুষকে আনন্দ দেয়, অন্তরকে উদার করে, জ্ঞানকে করে প্রসারিত।

উপসংহার : ভ্রমণ মানুষের স্বভাবসিন্ধ। সুদূরের আকর্ষণে মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই দেশান্তরের অভিযাত্রী হয়েছে। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার দুর্বার আকর্ষণে ছুটে গেছে বিপুলা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। এ ভ্রমণ মানুষকে যেমন আনন্দ দিয়েছে, তেমনি নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে মানুষ দেশভ্রমণের মাধ্যমে। দেশভ্রমণের তীব্র বাসনাই প্রকাশ পেয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের 'সংকল্প' কবিতায়—

'থাকব না ক বন্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ॥'

বইপড়ার আনন্দ

ভূমিকা: বইয়ের পৃষ্ঠায় সঞ্চিত থাকে হাজার বছরের সমুদ্র-কল্লোল। বই অতীত আর বর্তমানের সংযোগসেতু। বই জ্ঞানের আধার। একটা ভালো বই বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো। যুগে যুগে মানুষ তাই বই পড়ে নিজেকে সমৃন্ধ করেছে, বাড়িয়ে নিয়েছে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জগৎ। পুস্তকপাঠ মানুষের মনের ভেতর অনেকগুলো আনন্দময় ভুবন তৈরি করতে পারে। সেই আনন্দময় ভুবনে ডুব দিয়ে সংসারের নানা জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের এই উক্তি ও উপলব্ধি অত্যন্ত খাঁটি।

বইপড়ার প্রয়োজনীয়তা: বইপড়ার মাধ্যমে আমরা সত্য, সুন্দর, কল্যাণ, ন্যায়ের শাশ্বত রূপের সাথে পরিচিত হই। এক ঘণ্টার বইপড়া আমাদের ভ্রমণ করিয়ে আনতে পারে বিশ্বজগৎ। চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে পারে মহাকাশের অজানা রহস্য। বইপড়া আমাদের মনের প্রসার ঘটায়। নির্মল আনন্দ লাভের উৎস হিসেবে বিকল্প কিছু নেই। পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম বলেছেন 'রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা, যদি তেমন বই হয়।'

কবি ওমর খৈয়াম তাই মৃত্যুর পরেও স্বর্গে গিয়ে যাতে তার পাশে একটি বই থাকে, সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি। পৃথিবীর বিপুল বৈচিত্র্যের দিকে তাকালে আমাদের মনে অদম্য কৌতূহল আর অনন্ত জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়। জীবন ও জগতের সান্নিধ্যে এসে মানুষ যে বিপুল জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, তা বিধৃত রয়েছে বইয়ের কালো অরে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, মানবজাতির অগ্রগতির ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি হৃদয়ে ধারণ করতে হলে আমাদের বইয়ের কাছে যেতে হবে। মননশক্তি অর্জন আর হৃদয়শক্তি বিস্তার করতে হলেও প্রয়োজন বইপড়া।

বইপড়া আনন্দের সেরা উৎস : বিনোদনের হাজার মাধ্যম আছে পৃথিবীতে। কিন্তু সেই বিনোদন অনেক সময় নির্মল হয় না। ভালো বইয়ের সান্নিধ্য মানুষের অশান্ত মনে এনে দিতে পারে স্বর্গীয় সুখ, হৃদয়ে বইয়ে দিতে পারে আনন্দের বন্যা। প্রিয় কোনো কবির অমর কাব্যের রসময় পঙ্ক্তি অমৃতসুধার মতো লাগে অবসর কোনো মুহূর্তে। অবসর আর অবকাশের সময়গুলো আমরা ভরিয়ে তুলতে পারি বইপড়ার আনন্দে।

বইপড়ার আনন্দকে আমরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ধরা যাক, আমি কোনো রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করব। যেখানে আমার জন্য স্তরে স্তরে সাজানো প্রিয় ফুলের লাবণ্য আছে। সুস্বর পাখিরা ডাকছে মধুর কণ্ঠে। রয়েছে ঈপ্সিত ঝরনার চঞ্চলতা। চন্দনসুগন্ধি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। রাজপ্রাসাদের এক এক কক্ষে এক-একরকম আয়োজন। প্রবেশ করলেই সৌন্দর্যস্রোতে অবগাহন করা যায়। বস্তুত একটি ভালো বই সুসজ্জিত, আনন্দময় রাজপ্রাসাদের মতোই। জ্ঞানান্বেষী পাঠক হলে তো কথাই নেই, আনন্দ আর জ্ঞানার্জন— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুটি কাজ একই সঙ্গে করতে পারবে সে। বিলাসী পাঠক, সিরিয়াস পাঠক, অসতর্ক পাঠক, এরকম নানাধরনের পাঠক আছে। আবার কেউ বই পড়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য, কেউ অস্থায়ী চাকরি স্থায়ী করতে, কেউ বা উচ্চতর পদ বা বেতনের লোভে, কেউ জ্ঞানার্জনের জন্য পড়ে বই। এসব পড়া কাজের পড়া, আনন্দের পড়া নয়। আমার মতে যারা আনন্দের জন্য বই পড়ে, তারাই শ্রেষ্ঠ পাঠক। কারণ, পৃথিবীতে অনুপম শ্রেষ্ঠ আনন্দ কেবল বইপাঠেই পাওয়া যায়।

উপসংহার : বইয়ের পাতার কালো অক্ষরে অমর হয়ে আছে মানুষের চিরন্তন আত্মার দ্যুতি। বইপড়া মানুষের মনে সঞ্চার করে অনাবিল আনন্দ। মনকে সতেজ ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করে বই। ফরাসি দার্শনিক আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন, বইপড়ার মাধ্যমে আমরা মাছির মতো মাথার চারিদিকে অজস্র চোখ ফুটিয়ে তুলতে পারি। সেই চক্ষুপুঞ্জ দিয়ে একসাথে পৃথিবীর অনেককিছু দেখে নিতে পারি।

বইপড়ায় যে কত আনন্দ তা গ্রন্থপিপাসু মানুষ মাত্রেই জানেন। সেই আনন্দের স্পর্শ যিনি একবার পেয়েছেন, তাঁর অন্তর হয়েছে ঐশ্বর্যময়, হয়েছে আলোকিত। সৌন্দর্যময় জগতে অবগাহনের শক্তি আছে একমাত্র তাঁরই। তিনিই কেবল গাইতে পারেন-

'আলো আমার আলো ওগো
আলোয় ভুবন ভরা।'

গ্রাম্যমেলা

ভূমিকা : মেলা আবহমান গ্রামবাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বাঙালি জীবনের সঙ্গে মেলার যোগ দীর্ঘকালের। এই সম্পর্ক নিবিড় এবং আত্মিক। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলাতেই সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। গ্রামীণ মানুষের জীবনে মেলা এক অফুরন্ত আনন্দের উৎস। চৈত্রসংক্রান্তি মেলা, বৈশাখী মেলা, পৌষমেলা, মহররমের মেলা, বইমেলা, বৃক্ষমেলা ইত্যাদি নানা উপলক্ষে বাংলাদেশে মেলা বসে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক গদ্যরচনায় মেলা সম্পর্কে লিখেছেন :

'পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার বাড়ির মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়- তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ।'

মেলার উপলক্ষ: সারা বছরই দেশের কোথাও-না-কোথাও মেলা হতে দেখা যায়। এক-এক জায়গায় এক-একটা উপলক্ষে মেলার আয়োজন হয়। কোনো মেলার আয়োজনের পেছনে থাকে কিংবদন্তি, অলৌকিক কোনো লোকগল্প বা পির, ফকির, দরবেশের কথা। কোথাও হিন্দুসম্প্রদায়ের রথযাত্রা, দোলযাত্রা, পুণ্যস্নান, দুর্গাপূজা ইত্যাদি উপলক্ষে এবং মুসলমানদের মহররম উপলক্ষে বসে মেলা। সাধারণত গ্রামবাংলার মেলা বসে নদীতীরে, বিশাল বটের ছায়ায় অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে। যে উপলক্ষেই মেলা বসুক না কেন, মেলায় সাধারণত উৎসব-উৎসব একটা আমেজ থাকে। বর্ণাঢ্য সাজ, চারিদিকে কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে মেলার প্রাঙ্গণ থাকে মুখরিত। এক থেকে সাত, আট, দশ দিন কিংবা মাসব্যাপীও মেলা চলতে দেখা যায়। মেলার উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে যায় স্থানীয় অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে।

যে উপলক্ষেই মেলার আয়োজন হোক না কেন, হরেক রকম পণ্যের পসার থাকে মেলায়। ঘর-গেরস্থালির নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী, সাজসজ্জার উপকরণ, শিশু-কিশোরদের আনন্দ-ক্রীড়ার উপকরণ, রসনালোভন খাবারের সমারোহ থাকে মেলায়।

গ্রাম্যমেলার বিবরণ : গ্রামীণ মেলায় গ্রামবাংলার রূপ যেন সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। মেলায় গ্রামীণ মানুষদের নতুন আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে একটা সার্বজনীন রূপ আছে। মেলা যে মিলনক্ষেত্র, তাই ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের আনাগোনা। মেলায় আগত দর্শকদের মনোরঞ্জনের নানা ব্যবস্থা থাকে। নাগরদোলা, লাঠিখেলা, কুস্তি, পুতুলনাচ, যাত্রা, কবিগান, বাউল-ফকিরের গান, ম্যাজিক, বায়োস্কোপ, সার্কাস ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে ওঠে। কখনো সার্কাসের জোকার ও সঙের কৌতুকে হেসে লুটিয়ে পড়ে কেউ। কামার, কুমার, ছুতার, কৃষক, কাঁসারুর সাজানো পসরার বিকিকিনি চলতে থাকে অবিরাম। মেলায় পণ্যের কারিগরের সাথে ক্রেতার সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়। নতুন নতুন নকশা ও কারুকাজের চাহিদা বাড়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান পূর্ণতা পায়। স্বল্প পুঁজির অবহেলিত পেশাজীবী, যেমনঃ কামার, কুমোর, তাঁতি— তাঁদের তৈরি পণ্য সহজে বেচা-বিক্রি করতে পারে। এটা গ্রামীণ মেলার একটা তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক দিক।

মেলায় বিচিত্র সামগ্রীর সমাবেশ : মেলায় আসা বৈচিত্র্যময় পণ্যের শেষ নেই। হস্ত ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ বাঁশ-বেতের তৈরি ডালা, কুলা, হাতপাখা, শীতল পাটি, নকশিকাঁথা, ডালঘুঁটনি, নারকেলকোরা, মাছধরার কোঁচ, পলো, ঝাঁকিজাল ইত্যাদি। মৃৎশিল্পের সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পাতিলের ঢাকনা ইত্যাদি। কামারের তৈরি লোহার জিনিসের মধ্যে রয়েছেঃ দা, কাস্তে, ছুরি, খুন্তি, কোদাল, শাবাল, বঁটি ইত্যাদি। কাঠের তৈরি সামগ্রীর মধ্যে দেখা যায়ঃ পিঁড়ি, বেলন, জলচৌকি, চেয়ার, টেবিল, খাট-পালঙ্ক, লাঙল-জোয়াল ইত্যাদি। এ ছাড়া মেলায় আসে নানারকম শিশুখেলনা, যেমনঃ পুতুল, বাঁশি, বল, গুলতি, লাটিম, মার্বেল ইত্যাদি। মেয়েদের প্রসাধন উপকরণের আকর্ষণ যথেষ্ট। যেমন : ফিতা, চুড়ি, কিপ, স্নো-পাউডার, হালকা প্রসাধনী। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেঃ মুড়ি-মুড়কি, খই, খাজা, কদমা, চিনিবাতাসা, জিলেপি, আমিত্তি, নিমকি, রসগোল্লা, নারিকেলের নাড়ু, পিঠেপুলি ইত্যাদি নানা মুখরোচক খাবার ক্রেতা-দর্শকদের আকৃষ্ট করে।

উপসংহার : গ্রামীণ মেলা, গ্রামবাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য। আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির অংশ। মেলার মাধ্যমে এক গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের মানুষের পরিচয় ঘটে, পরিচিতজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ভাবের আদান-প্রদান হয়। এতে সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেলার চিত্র-চরিত্রের পরিবর্তন এসেছে। বদলে গেছে এখন গ্রামীণ মেলার রূপও। বৈদ্যুতিক বাতি, মাইক, ব্যান্ডসংগীত মেলার পুরানো ঐতিহ্যকে অনেকটাই পালটে দিয়েছে। গ্রামে এখন এমন প্রাণোচ্ছল মেলা আর বসে না।

অবসর যাপন
(সংকেত)

ভূমিকা : মানুষের জীবনে অবসর যাপনের গুরুত্ব অনেক। অবসর মানুষের ক্লান্তি ঘোচায়, নতুন কর্মের প্রেরণা দেয়।

অবসর যাপনের বৈচিত্র্য : মানুষ নানাভাবে অবসর বা ছুটি কাটায়। কেউ গান শোনে, কেউ টিভি দেখে, কেউ বই

পড়ে, কেউ বঁড়শিতে মাছ ধরে। কেউ ছুটে যায় বেড়াতে পাহাড়ে, অরণ্যে, সমুদ্র-সৈকতে। কেউ নানা জায়গায় নানা পুরাকীর্তি দেখে বেড়ায়।

অবসরের প্রয়োজনীয়তা : অবসর ও ছুটি কাজের অবসাদ দূর করে। একঘেয়েমি থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। শরীরে দেয় শক্তি। মনে দেয় আনন্দ। মনকে করে তোলে সজীব।

উপসংহার : ছুটি ও অবসর আমাদের জীবনে নিজের ইচ্ছেমতো চলার অবকাশ এনে দেয়। রুটিনমাফিক কাজের তাড়া থাকে না। থাকে না আদেশ-নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতা। ছুটি ও অবসর জীবনে এনে দেয় মুক্তির আনন্দ। আনে খেয়ালখুশির পরিতৃপ্তি। মানুষের জীবনে অবসরের আনন্দের তাই তুলনা হয় না।

মানবকল্যাণে বিজ্ঞান

ভূমিকা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এক যুগান্তকারী যুগ। বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ আজ ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে অভাবনীয় গতি, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে করেছে দ্রুততর ও বহুমাত্রিক। বিজ্ঞান ঘুচিয়ে দিয়েছে দূর-দূরান্তরের ব্যবধান; মানুষকে দিয়েছে অনিঃশেষ সম্ভাবনা।

মানবসভ্যতায় বিজ্ঞান : প্রাচীনকালে গুহাবাসী মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের অসহায় ক্রীড়নক। আদিম মানুষ যখন প্রথম পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করে, পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালায় তখন থেকেই শুরু হয় মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। তারপর যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই মানুষ সমগ্র পৃথিবীর ওপর বিস্তার করেছে কর্তৃত্ব।

মানবজীবনে বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অবদান : মানবজীবনের প্রতিটি শাখা আজ বিজ্ঞানের বহুবিধ অবদানে সমৃদ্ধ। যাতায়াত, কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ মানবজীবনের সবক্ষেত্রে বিজ্ঞানের রয়েছে অপরিহার্য ভূমিকা। বিজ্ঞানকে এখন বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের বদৌলতে কৃষিতে মানুষ এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মানুষ আবিষ্কার করেছে ট্রাক্টরসহ নানারকম কৃষি-সরঞ্জাম। পাম্প ব্যবহার করে ভূ-অভ্যন্তর থেকে পানি উত্তোলন করে সেচ-কাজ সম্পন্ন করছে। কীটনাশকের সাহায্যে পোকামাকড় ও পঙ্গপালের হাত থেকে ফসল রক্ষা করছে। বর্তমানে ক্লোনিং পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল বীজ তৈরি করা হচ্ছে। মরুভূমির মতো উষর জায়গায়ও কৃষিকাজ সম্ভব হচ্ছে।

যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের অবদানে মানুষ আবিষ্কার করেছে দ্রুতগামী যানবাহন, বুলেট ট্রেন, শব্দাতিগ উড়োজাহাজ। আজ মানুষ পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে অপরপ্রান্তের মানুষের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে পারে। টেলিভিশন, ফ্যাক্স, রেডিও, ই-মেইল, মুঠোফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্বের খবর যে-কোনো মুহূর্তে পেয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, রকেটে করে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে পাড়ি জমাতে প্রস্তুত এখন মানুষ। যোগাযোগের ক্ষেত্রে আলোকতন্তু নিয়ে এসেছে নতুন প্রযুক্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন করা হচ্ছে কম্পিউটারের তথ্যাবলি। এককথায় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সারা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে।

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাফল্যগুলোও কম বিস্ময়কর নয়। জন্মপূর্ব রোগ নির্ণয়ের সাফল্যের ক্ষেত্রে বড় রকমের উত্তরণ ঘটেছে। জিন-প্রতিস্থাপন চিকিৎসা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এক বিশাল সম্ভাবনা হাজির করেছে। চোখের কর্নিয়া থেকে শুরু করে যকৃতের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সাফল্য অভাবনীয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আলোকতন্তু বিদ্যা ব্যবহারের ফলে মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ ফুসফুস, পাকস্থলী, শিরা, ধমনী ইত্যাদির অবস্থা যন্ত্রের সাহায্যে অবলোকন করে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। অতিকম্পনশীল শব্দ ও লেজারকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে। এর ফলে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের অবস্থা দেখা যেমন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি মূত্রথলি ও পিত্তকোষের পাথর চূর্ণ করার কাজেও এর সফল ব্যবহার হচ্ছে। বহুমূত্র রোগীর অন্ধত্ব প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে লেজাররশ্মি। কম্পিউটার প্রযুক্তি চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছে সর্বাধুনিক পর্যায়ে। এর মাধ্যমে ছবি তুলে রোগ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান : শিক্ষাক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর প্রায় সবই বিজ্ঞানের উদ্ভাবন। বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থাকে করেছে আরও আধুনিক ও উন্নত। এখন বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে রেডিও-টেলিভিশন শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। কম্পিউটার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত করেছে এক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি।

আবহাওয়ায় বিজ্ঞান : আবহাওয়ার খবরাখবর বের করতে গিয়ে বিজ্ঞান তার প্রচণ্ড ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এখন ৭/৮ দিন আগে থেকেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানিয়ে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। তা ছাড়াও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে খনিজ সম্পদ, তেল ও গ্যাসের উৎস, মাটির উপাদান ও জলজ সম্পদ সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, পঙ্গপালের আক্রমণের আশঙ্কা সম্পর্কে।

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ : বিজ্ঞান মানবসভ্যতার উন্নতির সর্ববৃহৎ হাতিয়ার। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান শুধু মানুষের উপকারই করেনি। স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র মানুষের কাজ সম্পাদন করতে শুরু করার পরপরই অসংখ্য মানুষ বেকারে পরিণত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসংবলিত বড় বড় শিল্প-কারখানা ও মোটরচালিত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনেক সময় পরিবেশ ও মানুষের ক্ষতি করছে। পরিবেশদূষণের ফলে পৃথিবীর উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছে ও মেরুদ্বয়ের বরফ গলা শুরু করছে। মানুষ বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখে চমকে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে হিরোশিমা-নাগাসাকির মতো শহর ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। তাই প্রশ্ন উঠেছে—বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ?

উপসংহার : বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ হলেও বিজ্ঞানের অবদানকে মানুষ কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। সচেতন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাজ হল বিজ্ঞানের সার্থক ও ইতিবাচক প্রয়োগ ঘটানো। বিজ্ঞানের আলোকে মানবজীবনকে আলোকিত করা। বিজ্ঞানের অপব্যবহার রোধে সচেতন হয়ে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে তা মানবজীবনে আরও ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান

মানবজীবনে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এটি মানুষের আদিমতম জীবিকার উপায়। দেশে দেশে কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এই উন্নতিতে অনন্য ও অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আজ বাড়িয়ে দিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী কল্যাণী হাত।

কৃষির আধুনিকায়নে বিজ্ঞান : আঠারো শতকের শেষদিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়নের সূচনা ঘটে। এর ফলে কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও কৃষিপদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়। জন্তু আর কাঠের লাঙলের পরিবর্তে কৃষকদের হাতে আসে কলের লাঙল, ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার। বিজ্ঞানের কল্যাণে উন্নত দেশগুলোতে জমিকর্ষণের পুরনো পদ্ধতিগুলো লোপ পেয়েছে।

সেচব্যবস্থাতেও বিজ্ঞান অনেক পরিবর্তন এনেছে। কৃষকদের এখন ফসলের জন্যে প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। গভীর ও অগভীর নলকূপের সাহায্যে জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সেচের জন্যে ভূগর্ভস্থ পানি তুলতে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি চালিত পাম্প। অতিবৃষ্টিও আজ কৃষককে ভীত করছে না। বিজ্ঞানের বদৌলতে জমির অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন আজ অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে কৃষিক্ষেত্রে নতুন অকল্পনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছেন।

উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে বিজ্ঞান কৃষিক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছে তাও অভাবনীয়। বিশেষ করে কৃত্রিম উপায়ে উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদনে সাফল্য বিস্ময়কর। এসব বীজ সাধারণ বীজের তুলনায় ফসল উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে সময়ও কম নেয়। সুতরাং বীজ নিয়ে কৃষকদের অতীতের অনিশ্চয়তা দূর করেছে বিজ্ঞান।

শক্তিশালী রাসায়নিক সার আবিষ্কৃত হওয়ায় ফসল উৎপাদনে এসেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বৃষ্টিহীন শুষ্ক মরু অঞ্চলে চাষাবাদ শুরু করার প্রচেষ্টা চলছে বিজ্ঞানের সহায়তায়। সেদিন দূরে নয় যেদিন এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা সাফল্য অর্জন করবেন।

উন্নত বিশ্বের কৃষি : উন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র, যেমনঃ মোয়ার (শস্য-ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াই যন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তারণ যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ হচ্ছে কেবল এক-একটি ট্রাক্টরের মাধ্যমে। সেগুলো আবার একসাথে তিন-চারটি ফসল কাটার যন্ত্রকে একত্রে কাজে লাগাতে সক্ষম। তারা বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। যেমন বলা যায় জাপানের কথা। জাপানে জমির উর্বরাশক্তি বাংলাদেশের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা এ দেশের তুলনায় ৬ গুণ বেশি ফসল উৎপাদন করছে।

কৃষি ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের মাটি ও জলবায়ু বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় কৃষির অনুকূলে। কিন্তু উন্নত দেশগুলো যখন প্রতিকূল অবস্থা ঘুচিয়ে ফসল উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক নেশায় মেতেছে, সেখানে বাংলাদেশের কৃষকেরা তার কাঠের লাঙল আর একজোড়া জীর্ণ-শীর্ণ বলদ নিয়ে চেয়ে আছে আকাশের পানে বৃষ্টির প্রতীক্ষায়। তবে ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জমি চাষের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ইঞ্জিন চালিত চাষযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়াও কৃষিকাজে ট্রাক্টর, সিডড্রিল (গর্তখনক), ধান-বুনন যন্ত্র, বিরিড্রাম সিডার, স্প্রেয়ার, উন্নত সেচ-পাম্প, ড্রায়াফ্রাম পাম্প, ট্রেডল পাম্প, রোয়ার পাম্প, শস্যকাটা যন্ত্র, ঘাসকাটা যন্ত্র, মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে। এ কথা অবশ্য সত্যি যে বাংলাদেশেও কৃষি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় সফলতা এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের শতকরা আশিভাগ কৃষক এখনও সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে চলেছে। শিক্ষা, সচেতনতা, মূলধন, পুঁজি ইত্যাদির অভাবে তারা কৃষিকাজে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তারা শ্রম দিচ্ছে কিন্তু উপযুক্ত ফসল পাচ্ছে না। কেননা তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করতে পারছে না।

উপসংহার : বিজ্ঞান আজ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। উন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানের সাহায্যে পাহাড় কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে বিভিন্নভাবে কৃষিজমি তৈরি করা হচ্ছে। ফসল আবাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তারা বিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ তারা কৃষিক্ষেত্রে লাভ করছে বিরাট সাফল্য। কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সুজলা-সুফলা আমাদের এই দেশে বিজ্ঞানের জাদুর ছোঁয়া আমরা যত বেশি কাজে লাগাতে পারব ততই কৃষি আমাদের দেবে সোনালি ফসলসহ নানা ফসলের সম্ভার। কৃষকদের সচেতনতা, সরকারি ও বেসরকারিভাবে তাদের সাহায্য প্রদান এবং বাংলাদেশে কৃষি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাই পারে আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে বাংলাদেশকে একটি সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশ হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

কম্পিউটার

ভূমিকা : আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে কম্পিউটার। 'কম্পিউটার' শব্দটি ইংরেজি। এর অর্থ হল যন্ত্রগণক। কম্পিউটার যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ ইত্যাদি সবধরনের অঙ্ক কষতে পারদর্শী। কিন্তু এর কাজ শুধু গণনা কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ ও তুলনা করা এবং সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে এ যন্ত্রটির। কাজের গতি, বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার দিক থেকে কম্পিউটারের ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ও অনেক উন্নত। তাই বিশ শতকের শেষপ্রান্তে কম্পিউটার ঘরে, অফিসে, ব্যাংকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিমানে, পত্রিকায়, কারখানায় ইত্যাদি প্রায় সর্বত্র বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।

কম্পিউটারের আবিষ্কার : আধুনিক কম্পিউটারের জনক ব্রিটিশ গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজ। পাঁচটি অংশে বিভক্ত আধুনিক কম্পিউটারের গঠনকৌশল আবিষ্কারের কৃতিত্বও তার। ১৯৫২ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী জন ডন

নিউম্যানের পরিকল্পনা মতে ইলেক্ট্রনিক অটোমেটিক ক্যালকুলেটর আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কম্পিউটার তৈরির কাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে।

গঠন ও শ্রেণীবিভাগ : কম্পিউটারের গঠনরীতির প্রতি লক্ষ করলে এর প্রধান দুটি দিক আমাদের নজরে পড়ে। একটি হল এর যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং অপরটি হল প্রোগ্রাম সরঞ্জাম। কম্পিউটারের যন্ত্রপাতির সাধারণ নাম 'হার্ডওয়্যার'। যান্ত্রিক সরঞ্জামের আওতায় আসে তথ্য সংরক্ষণের স্মৃতি, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত বহির্মুখ অংশ। কম্পিউটারকে প্রদেয় নির্দেশাবলির নাম 'প্রোগ্রাম'। প্রোগ্রাম ইত্যাদিকে বলা হয় 'সফটওয়্যার'। কাজের ধরন বা পদ্ধতি অনুসারে কম্পিউটার দু ধরনের : ডিজিটাল ও এনালগ। কাজের গতি এবং গঠন-প্রকৃতি অনুসারে কম্পিউটারকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন : সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার ও মাইক্রো কম্পিউটার।

ব্যবহার : কম্পিউটার মানবজীবনের নানা ক্ষেত্রে দিনদিন খুলে দিচ্ছে নিত্যনতুন দিগন্ত। কম্পিউটার শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশই কষে না, নানা কাজে কম্পিউটারের রয়েছে ব্যাপক ব্যবহার। বহু মানুষের কাজ সে একাই করে; করে নির্ভূলভাবে এবং বলতে গেলে চোখের পলকে। কম্পিউটারের সাহায্যে জটিল হিসাব সহজেই নিরূপণ করা হচ্ছে। সর্বাধুনিক কল-কারখানা ও পারমাণবিক চুল্লি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটার সূচনা করেছে নতুন যুগের। এর সাহায্যে রোগ নিরূপণে খুলে গেছে বিস্ময়কর ও অভাবনীয় দিক-দিগন্ত। তা ছাড়া বহুতল ভবন, বিমান, ডুবোজাহাজসহ বহু বড় বড় কাজের জটিল নকশা কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে।

বড় বড় শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে কম্পিউটার। বিমান ও রেলের যোগাযোগব্যবস্থা সংরক্ষণ ও টিকেট বিক্রিতেও তা তৎপর। কম্পিউটারের সাহায্যে বর্তমানে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির কম্পোজ ও মুদ্রণের কাজ নির্ভুল এবং দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল তৈরির কাজে কম্পিউটার পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কম্পিউটার খেলার জগতেও অসামান্য চৌকশ। কম্পিউটারে দাবাসহ নানারকম খেলা খেলা যায়। তার মধ্যে রয়েছে নানারকম ভিডিও গেমস। সেগুলো ইতোমধ্যেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে : কার গেমস, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, ভিনগ্রহীদের মোকাবেলা, জলে-জঙ্গালে শিকার এবং এমনি আরও কত কী। রয়েছে শিক্ষামূলক নানা তাক-লাগানো খেলা। খেলার মাধ্যমে টাইপ শেখার সুযোগও এনে দিয়েছে কম্পিউটার।

কম্পিউটারে চলচ্চিত্র দেখা যায়, গান শোনা যায়, ছবি স্ক্যানিং করে সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে যোগাযোগ করা যায় ই-মেইলের মাধ্যমে; পড়া যায় দেশবিদেশের পত্রপত্রিকা; সংগ্রহ করা যায় যে-কোনো বিষয়ের তথ্য। সেখানে নানা তথ্য সংরক্ষণও করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও কম্পিউটারের অবদান অনেক। কম্পিউটারের মাধ্যমে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত সবই শেখা যায়।

কম্পিউটার ও বেকার সমস্যা : কম্পিউটার মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে অনেক কাজ। বহু লোকের কাজ একা করার ফলে কলকারখানাসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বসানো হয়েছে কম্পিউটার-চালিত স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক ব্যবস্থা। এর ফলে নিয়োগ কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। তাই আমাদের দেশের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক সাশ্রয় ও বহুমুখী কর্মসংস্থানের দিক বিবেচনায় রেখে কম্পিউটার ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে যে এই সমস্যা সমাধান করা যায় সেই বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

উপসংহার : কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর উদ্ভাবন। তা মানুষকে বেকার করলেও তার বিস্ময়কর কার্যক্ষমতা মানুষের মনকে জয় করেছে। আমাদের দেশও তাই কম্পিউটারকে স্বাগত জানিয়েছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন অধিকাংশ মানুষ কম্পিউটারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমাদের দেশেও কম্পিউটারের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিনদিন বেড়ে চলেছে। মানুষ ক্রমেই হয়ে পড়ছে কম্পিউটারনির্ভর।

প্রাত্যহিক জীবনে বিদ্যুৎ

(সংকেত)

ভূমিকা : একুশ শতক সর্বতোভাবে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের সর্বমুখী যে অগ্রাভিযান চলছে তার মূলে রয়েছে বিদ্যুতের অবদান।

আধুনিক জীবনে বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ ছাড়া আধুনিক জীবন বলতে গেলে অচল। কল-কারখানায়, কৃষিকাজে, চিকিৎসা কেন্দ্রে, অফিস-আদালতে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র বিদ্যুৎ এখন অপরিহার্য।

আবাসিক জীবনে বিদ্যুৎ : বহুতল ভবনে ওঠানামায় লিফট এবং পানীয় জল সরবরাহ বিদ্যুৎ ছাড়া চলে না। গৃহস্থালি কাজে হিটার, কুকার, ফ্রিজ চালাতে দরকার পড়ে বিদ্যুতের। বিনোদনের জন্য রেডিও, টিভি, ক্যাসেটপ্লেয়ার চালাতে বিদ্যুতের দরকার। বিদ্যুৎ ছাড়া কম্পিউটার অচল। বাতি জ্বালাতে কিংবা পাখা চালাতেও বিদ্যুৎ অপরিহার্য।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিদ্যুৎ : বিদ্যুতের সাহায্যে নিখুঁতভাবে রোগ নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। ইলেকট্রো থেরাপি নামে একটি শাখাও রয়েছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। বিদ্যুতের কল্যাণে রাতারাতি সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটের সাহায্যে মুহূর্তে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগ করা যায়, তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

উপসংহার : জীবনের সর্বক্ষেত্রে দিনদিন বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। শিল্প বিকাশেও বিদ্যুতের ভূমিকা বিস্ময়কর। অথচ দেশে বিদ্যুৎ সংকট রয়েছে। তাই উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান

(সংকেত)

ভূমিকা : বিজ্ঞানের অগ্রগতি বহুমুখী। তা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ে এক কথায় মানুষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিজ্ঞান আজ পরম আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে।

রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান : রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞানের ভূমিকা অভাবনীয়। এক্স-রে, ইসিজি, এন্ডোসকপি, সিটি স্ক্যান, আলট্রাসনোগ্রাফি, এম.আর.আই. ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিজ্ঞান রোগ নিরূপণে অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে।

রোগ প্রতিরোধে বিজ্ঞান : বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে রোগ প্রতিরোধে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এখন হাম, যক্ষ্মা, কাশি, ধনুষ্টংকার, বসন্ত, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি জটিল রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান : রোগ নিরাময়ে আশ্চর্য ও জাদুকরি ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন ওষুধ আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান। এসব ওষুধের কল্যাণে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। এমনকি ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদি চিকিৎসায়ও ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানবদেহে চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, কিডনি ইত্যাদি সংস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। কোনো অঙ্গ হানি হলে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন সম্ভব হচ্ছে।

উপসংহার : চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানুষকে কঠিন রোগের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অবধারিত অকালমৃত্যুর হাত থেকে অনেক রোগীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনছে।

পরিবেশদূষণ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : সারা পৃথিবী জুড়ে ঘনিয়ে আসছে পরিবেশ-সংকট। মানুষের সৃষ্ট যন্ত্রসভ্যতার গোড়াপত্তন থেকেই চলেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের নির্মম কুঠারাঘাত। ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। মারাত্মক পানিদূষণ ও বায়ুদূষণ নিয়ে পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা আজ উদ্বিগ্ন। এ থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে চলছে নানা গবেষণা। এ ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ৫ই জুনকে ঘোষণা করেছে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'।

পরিবেশ দূষণের কারণ : পরিবেশ দূষণের কারণ অগণিত। তবে মূল কারণগুলি হচ্ছে: অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি এবং বৃক্ষ ও বনভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার। পরিবেশ দূষণের আর একটি কারণ পৃথিবীর বুকে জনবসতি বৃদ্ধি। এর ফলে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাহিদার চাপ পড়েছে প্রচণ্ডভাবে। ভূমিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে চাষের তীব্রতা, ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের। এতে বিনষ্ট হচ্ছে চাষযোগ্য ভূমির সঞ্জীবনী শক্তি, অন্যদিকে নতুন নতুন বসতি আর কলকারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে চাষযোগ্য ভূমি ও বনভূমি। কারখানার কালো ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের পাশাপাশি রাসায়নিক শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিদিন নদী, হ্রদ, সমুদ্রে মিশছে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত বর্জ্যদ্রব্য। মাটি, পানি, বাতাস এবং আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ওপর বিষক্রিয়ার প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ হয়ে উঠছে ভারসাম্যহীন, দূষিত ও বসবাস-অযোগ্য।

পরিবেশ-বিপর্যয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তর সাগরের বরফ গলে উঁচু হয়ে উঠছে সাগরের পানি। ফলে আমাদের দেশের মতো নিম্নাঞ্চল অদূর ভবিষ্যতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের জন্যে মূলত পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ী। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে,পরিবেশের বিপর্যয় এককভাবে কোনো দেশ বা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। এটা সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে দেবে।

পরিবেশদূষণ সমস্যা ও বাংলাদেশ : সীমিত ভূ-খণ্ড ও সম্পদ এবং তুলনামূলকভাবে অতি ঘন জনবসতি ও দুর্যোগপ্রবণ ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের মানুষকে পরিণত করেছে পরিবেশ দূষণের শিকারে। বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে :

১. **জনবিস্ফোরণ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বাংলাদেশে মুক্তাঞ্চল ও বনভূমির পরিমাণ কমছে। জলাভূমি ভরাট করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২. **সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার :** জমিতে ব্যাপক হারে সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হওয়ায় মাটির দূষণ ঘটছে এবং জমির গুণ নষ্ট হচ্ছে। এইসব রাসায়নিক উপাদান নদী ও জলাশয়ের পানিতে মিশে গিয়ে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হচ্ছে।

৩. **শিল্পদূষণ :** কলকারখানা থেকে নিঃসৃত তরল রাসায়নিক বর্জ্য পানিকে দূষিত করছে, তা মাছের বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে জনস্বাস্থ্যের জন্যেও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৪. **বন উজাড়করণ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে প্রতিবছর উজাড় হচ্ছে ১.৪ শতাংশ বন। ফলে ভূমিক্ষয়ের মাত্রা বাড়ছে, বন্যা প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং দেশের গড় তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে।

৫. **ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন :** ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন ও ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আরও নিচে চলে যাচ্ছে। এর ফলে উত্তরাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট বাড়ছে। প্রকট হচ্ছে পানিতে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা।

৬. **আবর্জনা সমস্যা:** শহরাঞ্চলের ময়লা আবর্জনার পচা গ্যাস বায়ুদূষণ সৃষ্টি করছে।

৭. **ভূমির অপর্যাপ্ততা :** পাহাড় কেটে বসতবাড়ি তৈরি করায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শহরের ভাসমান মানুষ ও বিপুল বস্তিবাসীর চাপেও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

প্রতিকার : আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণ রোধে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে সেগুলো হল : পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। দেশের মোট আয়তনের ন্যূনতম ৫০% এলাকায় বনায়ন করতে হবে। বর্তমান জ্বালানি পরিবর্তন করে বাতাস, সৌর ও পানি বিদ্যুতের মতো পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির প্রচলন করতে হবে। বন উজাড়করণ ও ভূমিক্ষয় রোধ করতে হবে। শিল্প-কারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। বর্জ্য থেকে সংগৃহীত গ্যাস জ্বালানি হিসেবে এবং পরিত্যক্ত পদার্থটি সার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে জৈবসারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের কাজকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। শিল্প-কারখানাগুলো আবাসিক এলাকা থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে। শিল্পে এবং যানবাহনে ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ ব্যবহার রোধ করতে হবে এবং অল্প জ্বালানিতে অধিক কার্যকর যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে। এ ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ ও শিক্ষার হার বাড়ানো, যে-কোনো পরিকল্পনার পূর্বে তার পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করা, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং বাঁধের পাশে বনায়ন করা দরকার।

উপসংহার : পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবল সরকার বা কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি-বিশেষের নয়; দায়িত্ব সকল বিশ্ববাসীর, প্রতিটি ব্যক্তির। যারা অজ্ঞতাবশত পরিবেশ দূষণে যুক্ত হচ্ছেন তাদের যেমন সচেতন করা প্রয়োজন তেমনি যারা অতি মুনাফার লোভে জেনেশুনেও পরিবেশের তোয়াক্কা করছেন না, তাদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও পরিকল্পনার নীতি-কর্মসূচির মধ্যে থাকতে হবে বিরল সম্পদ রক্ষার জন্যে বিকল্প উপায় উদ্ভাবন এবং পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই পরিবেশ দূষণ রোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন

ভূমিকা : বৃক্ষ কেবল নিসর্গ-প্রকৃতির শোভা নয়, তা মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনে বৃক্ষের ভূমিকা এত অপরিহার্য যে বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। দেশের অর্থনীতিতে যেমন বনাঞ্চলের ভূমিকা আছে, তেমনি আবহাওয়া ও জলবায়ুসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনজ সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করে দেশে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরিবেশ ও বনায়ন : বিশেষজ্ঞ গবেষকদের মতে, বর্তমানে বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্ব-পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। অথচ মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর জন্যে দরকার গাছপালা। গাছপালা কেবল অক্সিজেন দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়ও পালন করে অপরিহার্য ভূমিকা। প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বৃক্ষ আবহাওয়ামণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখে, জলীয় বাষ্প তৈরি করে বাতাসের আর্দ্রতা বাড়িয়ে বায়ুমণ্ডলকে রাখে শীতল। বৃক্ষ বৃষ্টি ঝরিয়ে ভূমিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বাড়িয়ে দেয় মাটির জলধারণ ক্ষমতা। এ ছাড়াও গাছপালা মাটির উর্বরতা বাড়ায়, মাটির ক্ষয় রোধ করে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা রোধেও পালন করে সহায়ক ভূমিকা। মাটির ওপর শীতল ছায়া বিছিয়ে দিয়ে ঠেকায় মরুকরণের প্রক্রিয়াকে।

বাংলাদেশে বৃক্ষনিধন ও তার প্রতিক্রিয়া : ভারসাম্যমূলক প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যে দেশের মোট ভূমির অন্তত ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। সে ক্ষেত্রে সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১৭ শতাংশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ঐ বনভূমির পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপক হারে নির্বিচারে বৃক্ষনিধনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর আবহাওয়ায়। দিনের বেলা দুঃসহ গরম আর রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, এ লক্ষণ মরুকরণ প্রক্রিয়ার আশঙ্কাজনক পূর্বাভাস।

প্রয়োজন বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন : ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে অনাবৃষ্টির কারণে দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিনের পর দিন দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। এ বিপর্যয়ও পর্যাপ্ত বনভূমি না থাকারই ফলাফল।

দেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে বহু এলাকা বৃক্ষহীন হয়ে পড়েছে। দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলো বলতে গেলে পরিণত হয়েছে বৃক্ষহীন ইটের স্তূপে। নাগরিক জীবনে যন্ত্রযান ও কলকারখানার উৎসারিত কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস ও ধুলাবালির নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে নগরবাসীর স্বাস্থ্যের ওপর। তা থেকে পরিত্রাণের উপযোগী বৃক্ষের ছায়া-শীতল স্নিগ্ধতা নগরজীবনে কোথায়? তাই নগরের সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাকল্পেও বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। আমাদের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রার জন্যে তাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বাড়ির আঙিনায়, আনাচে-কানাচে, সড়ক ও মহাসড়কের দু-পাশে, অনাবাদী ভূমিতে এবং খাল, পুকুর ও নদীর পাড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপর্যয় রক্ষা করা প্রয়োজন।

বনায়নের উপায় : বাংলাদেশে বনায়নের সম্ভাবনা বিপুল। নানাভাবে এ বনায়ন সম্ভব। একটি পন্থা হল : সামাজিক বন উন্নয়ন কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হল : রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণে জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা। এ কাজে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার।

তা ছাড়া দরকার নানা জাতের বৃক্ষ মিশ্রণ করে রোপণ করা যাতে গ্রামবাসী খাদ্য, ফল, জ্বালানি ইত্যাদি আহরণ করতে পারে। ওয়ার্ড মেম্বারের নেতৃত্বে এবং শিক্ষক, সমাজকর্মী, মসজিদের ইমাম প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম সংস্থা এই বনায়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। এ সংস্থার কাজ হবে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের সাথে সামাজিক বনায়ন-বৃক্ষায়ণ সম্পর্কিত সকল বিষয় তদারক করা এবং গ্রামের জনসাধারণকে পরিবারভিত্তিতে বনায়নের কাজে সম্পৃক্ত করা। যেমন-বাঁধ, সড়ক, রেলপথ, রাজপথ, খালের পাড়, পুকুর পাড়, খাস জমি ইত্যাদির আশেপাশে যেসব পরিবার বাস করে তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ দেওয়া। তারা বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করবে এবং এ থেকে যে আয় হবে, নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সে আয়ের অংশ তারা পাবে। এভাবে যেসব পরিবার খালি জায়গা বা পাহাড়-পর্বতের আশেপাশে থাকে তাদের সেখানে বনায়নে সম্পৃক্ত করা হবে। সাধারণ জনগণকে যদি বিপন্ন পরিবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করা এবং বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে অনেকেই বনায়নের কাজে এগিয়ে আসবেন। এ জন্যে শুরু হয়েছে নতুন এক আন্দোলন: 'গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও।'

বনায়নে গৃহীত পদক্ষেপ : গত একশো বছরে বনাঞ্চল ব্যাপকভাবে উজাড় হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ যে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি তা পূরণের প্রচেষ্টা এখন চলছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে 'কমিউনিটি বনায়ন' কর্মসূচির আওতায় বারো হাজার একর জ্বালানি কাঠের বাগান, তিনশো একর বন-বাগান, তিন হাজার একর স্ট্রিপ-বাগান স্থাপন উল্লেখযোগ্য। ৭ হাজার গ্রামকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। বনায়ন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে ৮০ হাজার ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে ৬ কোটি চারা বিতরণ করা হয়। এভাবে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উপকূলীয় চরাঞ্চলে, সবকটি মহাসড়কের দুপাশে, রেলসড়কের উভয় ধারে এবং বাঁধ এলাকায় বনায়নে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

উপসংহার : বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি শুধু প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় নয়, এটি গরিব জনসাধারণের অনেক চাহিদাই পূরণ করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করার ভূমিকাও পালন করে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রামীণ লোকদের জ্বালানি, খাদ্য, পশুচারণ ভূমি ও পশুখাদ্য, শস্য ও পশুসম্পদ উৎপাদনের উপায়, গৃহস্থালি ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী, আয় ও কর্মসংস্থান ইত্যাদির চাহিদা পূরণ করে। বনায়নের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তা যেন গরিব জনসাধারণের সহায়ক হয়। এটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হলে এর সুফল সরাসরি সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছাবে। সর্বোপরি বনভূমি বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতি আবারো সবুজ ও সজীব হয়ে উঠবে।

মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য অংশ আজ এক সর্বনাশা মরণনেশার শিকার। সে নেশা মাদকের। যে তরুণের ঐতিহ্য রয়েছে সংগ্রামের, প্রতিবাদের, যুদ্ধজয়ের—আজ তারা নিঃস্ব হচ্ছে মরণনেশার করাল ছোবলে। মাদকনেশার যন্ত্রণায় ধুঁকছে শত-সহস্র প্রাণ। ঘরে ঘরে সৃষ্টি হচ্ছে উদ্বেগ। ভাবিত হচ্ছে সমাজ। এ পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না।

সর্বনাশা নেশার উৎস : নেশার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, চরস, তামাকের নেশার কথা মানুষের অজানা নয়। কিন্তু সেকালে তা ছিল অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত মাদক 'ড্রাগ' নামে পরিচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নেশার উপকরণ হিসেবে ড্রাগের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ইত্যাদি এলাকায় ড্রাগ তৈরির বিশাল বিশাল চক্র গড়ে ওঠে। ক্রমে বেদনানাশক ড্রাগ পাশ্চাত্যের ধনাঢ্য সমাজে নেশার উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে বিশ্বের দেশে দেশে মাদক মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে যন্ত্রণা ও মৃত্যুর দিকে।

বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ ও তাদের ব্যবহার : সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক ড্রাগ ব্যবসায়ীরা নানাধরনের মাদকের ব্যবসা ফেঁদেছে। এসব মাদকের ব্যবহারের পদ্ধতিও নানারকম। ধূমপানের পদ্ধতি, নাকে শোঁকার পদ্ধতি, ইনজেকশনের মাধ্যমে ত্বকের নিচে গ্রহণের পদ্ধতি এবং সরাসরি রক্তপ্রবাহে অনুপ্রবেশকরণ পদ্ধতি। বিভিন্ন রকম ড্রাগের মধ্যে হেরোইন আজ সব নেশাকেই ছাড়িয়ে গেছে। এর মাদকশক্তিও অত্যন্ত তীব্র। নিছক কৌতূহলবশত যদি কেউ হেরোইন সেবন করে তবে এই নেশা সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো তার ঘাড়ে চেপে বসে।

মাদকাসক্তির পরিণাম : কোনোভাবে একবার কেউ মাদকাসক্ত হলে অচিরেই নেশা তাকে পেয়ে বসে। সে হয়ে পড়ে নেশার কারাগারে বন্দি। মাদকাসক্তির ফলে তার আচার-আচরণে দেখা যায় অস্বাভাবিকতা। তার চেহারার লাবণ্য হারিয়ে যায়। আসক্ত ব্যক্তি ছাত্র হলে তার বইপত্র হারিয়ে ফেলা, পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যাওয়া, মাদকের খরচ জোগাতে চুরি করা ইত্যাদি নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দেয়। নেশার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাগ না পেলে মাদকাসক্তরা প্রায়ই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। লোকের সঙ্গে এরা দুর্ব্যবহার করে। মাদকের প্রভাবে রোগীর শারীরিক প্রতিক্রিয়াও হয় নেতিবাচক। তার মননশক্তি দুর্বল হতে থাকে। তার শরীর ভেঙে পড়ে। ক্রমে স্নায়ু শিথিল ও অসাড় হয়ে আসে। এভাবে সে মারাত্মক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

মাদকের নেশা দ্রুত প্রসারের কারণ : সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ক্ষেত্রে হতাশা ও দুঃখবোধ থেকে সাময়িক স্বস্তিলাভের আশা থেকেই এই মারাত্মক নেশা ক্রমবিস্তার লাভ করছে। পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে, অনেক দেশে বিপথগামী মানুষ ও বহুজাতিক সংস্থা উৎকট অর্থলালসায় বেছে নিয়েছে রমরমা মাদক ব্যবসার পথ। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে বিভিন্ন দেশের মাফিয়া চক্র। মাদকের ঐ কারবারিরা সারা বিশ্বে তাদের ব্যবসায়িক ও হীনস্বার্থ রায় এই নেশা পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ : বিশ্বজুড়ে যে মাদকবিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার থাবা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমাজসেবীরা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। দেশে দেশে নানা সংস্থা ও সংগঠন মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। আমাদের দেশেও মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যম মাদকবিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় হয়েছে। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে :

১. মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভেষজ ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ
২. সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নেশার হাতছানি থেকে তাদের দূরে রাখা
৩. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা
৪. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা
৫. বেকার যুবকদের জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপসংহার : মাদকাসক্তির মতো সর্বনাশা নেশার করাল গ্রাসে পড়ে তরুণ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য অংশ যেভাবে জীবনশক্তি হারিয়ে ফেলতে বসেছে তাতে সমাজ আজ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। এ মারাত্মক সমস্যা সম্পর্কে ঘরে ঘরে সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। সুস্থ, সুন্দর, আনন্দ-উজ্জ্বল সমাজজীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য ব্যবহার রোধ করার বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কঠোর হাতে দমন করা দরকার মাদকচক্রের হোতাদের। মনে রাখতে হবে, মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব দল-মত নির্বিশেষে সবার।

বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী শিক্ষা

ভূমিকা : বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের ধারণা ক্রমেই পালটে যাচ্ছে। উন্মোচিত হচ্ছে নিত্যনতুন কাজের দিগন্ত। বংশানুক্রমিক পেশাগত বৃত্তি অবলম্বন করে নিশ্চিত জীবনযাপনের দিন এখন নেই বললেই চলে। এখন এমন সব কর্মদিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে যার সঙ্গে বিশেষায়িত শিক্ষার যোগ হয়ে পড়েছে অপরিহার্য। ফলে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কর্মমুখী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্রমেই অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে।

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব : যে শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থী ঘরে-বাইরে, খেতে-খামারে, কলে-কারখানায় যে-কোনো কাজে বা পেশায় অংশ নিতে পারে তা-ই কর্মমুখী শিক্ষা। কর্মমুখী শিক্ষা একধরনের বিশেষায়িত শিক্ষা। তা শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে এবং তাকে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী কাজ করতে সাহায্য করে।

এককালে মানুষের ছিল অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষ তখন সুখে জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু এখন জনসংখ্যা বেড়েছে বিপুলভাবে। তার প্রচণ্ড চাপ পড়েছে সীমিত সম্পদের ওপর। কম্পিউটার ইত্যাদির মতো প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ব্যবহারের ফলে কল-কারখানা, অফিস-আদালতে কর্মসংস্থানের সুযোগ যাচ্ছে কমে। অন্যদিকে নবতর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নব নব কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলোকে কাজে লাগানো না হলে বেকারত্ব অসহনীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু দেশে এখনও ইংরেজ প্রবর্তিত চাকুরিজীবী তৈরির সাধারণ শিক্ষার প্রাধান্যই রয়ে গেছে। ফলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণদের ব্যাপক অংশই বেকার থেকে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে কর্মমুখী শিক্ষা জীবন ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করছে বেশি। তাই যতই দিন যাচ্ছে কর্মমুখী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব সবাই উপলব্ধি করছেন। কারণ এতে রয়েছে স্বকর্ম-সংস্থানের নানা সুযোগ। তা দারিদ্র্য দূরীকরণেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কর্মমুখী শিক্ষা স্বাধীন পেশা গ্রহণে ব্যক্তির আস্থা গড়ে তোলে এবং তাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। তা বেকারত্বের সমস্যা উত্তরণেও সহায়ক।

কর্মমুখী শিক্ষার স্বরূপ : কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। এর লক্ষ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক জনশক্তি সৃষ্টি করা। কর্মমুখী শিক্ষার ভূমিকা ত্রিমুখী :

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো এবং তার সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।
২. নৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে শিক্ষার্থীকে সঞ্জীবিত করা এবং গণতন্ত্রমনা, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিক হিসেবে তাকে গড়ে তোলা।
৩. কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে বৃত্তিমূলক, কর্মমুখী, উপার্জনমূলক জনশক্তি গড়ে তোলা।

কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস : বাংলাদেশে কর্মমুখী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের মাধ্যমে চিকিৎসাবিদ্যা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রকৌশল, পলিটেকনিক, গ্রাফিক আর্ট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, ভেটেরনারি কলেজ ইত্যাদির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ছোটখাটো কারিগরি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। এ ছাড়া হোটেল-ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, উদ্যান পরিচর্যা, বিজ্ঞাপন ব্যবসা, সূচিশিল্প, মুদ্রণ, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, ফলমূল চাষ, কম্পিউটার চালনা, কুটির শিল্প ইত্যাদি পেশা ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তবে সব মিলিয়ে এরপরও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিদ্যমান সুযোগ এখনও বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য।

কর্মমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা : কর্মমুখী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক, অন্যান্য লোকবল সংস্থান, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, আর্থিক ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রকট সমস্যা বিদ্যমান। শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এসব সমস্যা মোকাবেলার জন্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উপসংহার : ক্রমবর্ধমান বৃত্তিমূলক শিক্ষা এ দেশে বেকারত্ব দূরীকরণ, আত্মকর্মসংস্থান ও জীবিকার সংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রচুর সম্ভাবনাময় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই তরুণ সমাজকে উপযুক্ত গঠনমূলক ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান করা দরকার। এ কাজে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে দরকার উপযুক্ত বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। তাহলেই এ মহৎ প্রয়াস জাতীয় জীবনে ইতিবাচক সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

নারীশিক্ষা

ভূমিকা : একুশ শতকে পদার্পণ করে বর্তমান বিশ্ব যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলে অংশ নিচ্ছে, নারী সেখানে এক অপরিহার্য অংশীদার। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারে পিছিয়ে পড়া নারীর পক্ষে সেই প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাই আজ দাবি উঠেছে ব্যাপক নারীশিক্ষার।

নারীশিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : এককালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ছিল প্রাধান্য। তাই প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ সাহিত্যে শিক্ষিত নারীর দেখা মেলে। পরবর্তীকালে সমাজজীবনে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে নারী হয়ে পড়ে অন্তঃপুরবাসী। আধুনিককালে নারীর অধিকার ও স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকৃত হয় পাশ্চাত্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহক ইংরেজদের মাধ্যমে এ দেশে নারীরাও শিক্ষার অঙ্গনে আসার সুযোগ পায়। অবিভক্ত বাংলায় নারীশিক্ষা ও নারী-প্রগতির রুদ্ধ দুয়ার যায় খুলে। কিন্তু তখনও বাংলাদেশে মুসলমান নারীসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথে বাধা দূর হয়নি। ধর্মীয় কুসংস্কার সেখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বাধা কাটিয়ে মুসলমান নারীকে শিক্ষার অঙ্গনে আনার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন বেগম রোকেয়া। ক্রমে বাঙালি মুসলিম নারীরা আধুনিক শিক্ষার পথে পা বাড়াতে থাকেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে নারীশিক্ষা : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় জীবনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং গণতান্ত্রিক চেতনার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। সমাজে নারী-পুরুষের সমান মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি পায়। দেশে নারী-আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। বিশ্বপরিসরে নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রের প্রেক্ষাপটে জীবন ও জীবিকার নানা স্তরে নারীরা এগিয়ে আসতে থাকে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নারীসমাজে সৃষ্টি হয় নতুন উদ্দীপনা। এখন বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে কোনো শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নারীর দেখা পাওয়া যাবে না।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা : নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও আমাদের দেশে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা মাত্র ২৬ শতাংশ। ব্যাপক সংখ্যক নারী এখনও কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকার কাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা আমাদের দেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। বিশেষ করে পর্দার কড়াকড়ি এখনও একটা বড় বাধা। এ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও চরম দারিদ্র্য নারীশিক্ষার পথে বাধা হিসেবে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, বিপুল সংখ্যক নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে নিয়ে আসার জন্যে যে বিশাল উদ্যোগ, আয়োজন ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো দরকার তা আমাদের নেই।

নারীশিক্ষা প্রসারের উপায় : প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে নারীসমাজ যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় সে জন্যে প্রয়োজন প্রচলিত ধারার পাশাপাশি বিশেষ ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা। সে ক্ষেত্রে রেডিও, টিভি ইত্যাদি মাধ্যম, লোকরঞ্জনমূলক ও কর্মমুখী শিক্ষা-কর্মসূচি ইত্যাদি নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। নিরক্ষর নারীর প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে। তাই এসব কর্মসূচিকে গ্রামীণ সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এসব দিক বিবেচনায় রেখে নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে :

১. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যেন স্কুলগামী ছাত্রী তাদের প্রতিষ্ঠানে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে।

২. প্রতিটি নারীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে গ্রামপর্যায়ে ছোট ছোট স্কুল স্থাপন, যেন বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব খুব বেশি না হয়।

৩. শিক্ষাগ্রহণে নারীকে উদ্যোগী ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি উপবৃত্তি যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

৪. শিক্ষাখাতে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ অবকাঠামো নির্মাণের চেয়ে নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে বেশি করে কাজে লাগানো এবং সে ক্ষেত্রে জবাবদিহিতাকে গুরুত্ব প্রদান।

৫. সারা দেশে নারীশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলনে শিক্ষানুরাগী সম্প্রদায়কে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা। অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষকদের এ কাজে বিশেষভাবে নিয়োগ প্রদান।

৬. ধর্মীয় বাধা, সামাজিক কুসংস্কার, আর্থিক দারিদ্র্য ইত্যাদি অন্তরায় কাটিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আনার জন্যে সামাজিক প্রণোদনা সৃষ্টি করা। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো।

উপসংহার : মানবাধিকার, অগ্রগতি ও প্রগতির একুশ শতকে ধর্মীয় বাধা, সামাজিক কুসংস্কার কাটিয়ে নারীকে এগিয়ে আসতে হবে মানুষের ভূমিকায়। আলোকিত মানুষ হিসেবে তাকে গড়ে উঠতে হবে। যুগ যুগ ধরে যে নারী চোখের জলের কোনো মূল্য পায়নি, আধুনিক সমাজে সে নারীকে দাঁড়াতে হবে শিক্ষিত, মার্জিত, আলোকিত মানুষ হিসেবে। তাহলেই সমাজে ফিরে আসবে নারীর মর্যাদা। এ ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

গ্রন্থাগার

ভূমিকা : গ্রন্থাগার হচ্ছে নানাধরনের বইয়ের সংগ্রহশালা। এখানে বইপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। গ্রন্থাগারে সঞ্চিত থাকে মানুষের যুগযুগান্তরের চিন্তা ও জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থাগারের সঞ্চিত সম্পদ একদিকে বহন করে কালের সাক্ষ্য, অন্যদিকে মুছে দেয় অতীত আর বর্তমানের সীমারেখা।

গ্রন্থাগারের উদ্ভব : গ্রন্থাগারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বই উদ্ভাবনের অনেক আগেই গ্রন্থাগারের জন্ম। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ মৃৎফলকে লিখে রাখা হত। আড়াই হাজার বছরেরও আগে অ্যাসিরিয়ার রাজা আশুরবানিপাল মৃৎফলকের গ্রন্থাগার করেছিলেন। তাতে প্রায় ৩০ হাজার মৃৎফলক ছিল। প্রাচীনকালের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থাগার হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার। সাধারণ পাঠাগার প্রথম গড়ে ওঠে রোমে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রোমে ২৫টিরও বেশি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদশাহ হারুন-অর-রশিদের পাঠাগারের বেশ নাম ছিল। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে কনফুসিয়াস ও বুদ্ধের ধর্মাদর্শে প্রভাবিত সমাজ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে এসেছে। মুসলিম বিশ্বে কর্দোভা, দামেস্ক ও বাগদাদেও বেশকিছু গ্রন্থাগার ছিল।

বিশ্বের বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থাগার : বর্তমানে পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ফ্রান্সের বিবলিওথিক ন্যাশনাল লাইব্রেরি, মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি, আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ১৯৫৩ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি।

গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগ : গ্রন্থাগার ব্যক্তিগত হতে পারে, হতে পারে রাষ্ট্রীয়। সাধারণ গ্রন্থাগার সবার জন্যে উন্মুক্ত। পাঠকদের রুচি ও চাহিদার ভিন্নতা অনুযায়ী বিচিত্র গ্রন্থের সমাবেশ ঘটে সাধারণ পাঠাগারে। এখানে গ্রন্থের সংখ্যাও হয় প্রচুর। অন্যদিকে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ব্যক্তির অভিরুচিই প্রধান। এর কারণ, বিশেষ ধরনের বইয়ের প্রতি সংগ্রাহকের আগ্রহ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপাখানা আবিষ্কার হলে বই ছাপানোর কাজ সহজতর হয়। তখন থেকে পারিবারিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। গ্রন্থাগার বেসরকারি উদ্যোগে অর্থাৎ ক্লাব বা গোষ্ঠীর উদ্যোগেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও গ্রন্থাগার থাকে। অনেক অফিস-আদালতেও নিজস্ব গ্রন্থাগার রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতি অনুসারে গ্রন্থাগারের নামেও ভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন : জাতীয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি।

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা : গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। কখনো বিশেষ প্রয়োজনে, কখনোবা শুধুই মনের খোরাক জোগাতে মানুষ ছুটে যায় গ্রন্থাগারে। একঘেয়ে, ক্লান্ত জীবনে বই এনে দিতে পারে সজীব প্রাণস্পন্দন। গ্রন্থাগারের বিচিত্র সংরক্ষণ থেকে পাঠক সহজেই খুঁজে নিতে পারেন পছন্দের বইটি।

ছাত্ররা প্রধানত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে পাঠ্যবিষয়ের বই পেতে কিংবা কোনো বিষয়ের উত্তর খুঁজতে। গবেষক গ্রন্থাগারে আসেন নানা তথ্যের সন্ধানে। শখের পড়ুয়ারা গ্রন্থাগারে আসেন খেয়ালখুশি মাফিক বই পড়ে আনন্দ পেতে। ভালো বই ভালো মানুষ গড়তে বিশেষ অবদান রাখে। বই হতে পারে মানুষের নিঃসঙ্গতা কাটানোর বিশেষ বন্ধু। নৈতিক অধঃপতন থেকে মানুষকে টেনে তুলে আনতে পারে ভালো বই, ভালো গ্রন্থাগার। বই ছাড়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ এক দুরূহ ব্যাপার। একটি জাতিকে উন্নত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। যে জাতির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নেই, সে জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাসও নেই।

আধুনিক গ্রন্থাগার : আধুনিককালে গ্রন্থাগার বলতে কেবল বই-এর সংগ্রহ বোঝায় না। তা মুদ্রিত, চিত্রসংবলিত, ধারণকৃত, ইলেকট্রনিক কৌশলে সংরক্ষিত সবধরনের যোগাযোগ মাধ্যমের সংগ্রহশালাকে বোঝায়। তাই গ্রন্থাগারে এখন বই ছাড়াও ফিল্ম, ভিডিও স্ট্রিপ, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ শুরু হয়েছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বায়নের ফলে ঘরে বসেই আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত সব গ্রন্থাগারের বই, পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

গ্রন্থাগারের কাজ : প্রত্যেক গ্রন্থাগারে দক্ষ শিক্ষিত ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োজিত থাকেন। এঁদের কাজ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সহায়তা করা। গ্রন্থাগারের কর্মীরা প্রধানত যেসব কাজ সম্পাদন করে থাকেন সেগুলি হল : বই নির্বাচন ও ক্রয়, বই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় (আক্ষরিক ও বিষয়ভিত্তিক) সাজানো, গ্রন্থাগার থেকে বই ইস্যু করার ব্যবস্থা, সুনির্দিষ্ট আগ্রহের ক্ষেত্রে পাঠককে পরামর্শ দান প্রভৃতি।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার : আমাদের দেশে সরকারি গ্রন্থাগার রয়েছে ৬৮টি, বেসরকারি গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ৯০০। সরকারের বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি ও পুরস্কার প্রদান, গণ-উন্নয়ন পাঠাগারের পরিচালনায় ২৭টি গ্রন্থাগারসহ অন্যান্য গ্রন্থাগার পাঠাগার আন্দোলনে অবদান রেখে চলেছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রকল্পও চালু করেছে।

উপসংহার : বর্তমান বিশ্বে গ্রন্থাগার শিক্ষাপ্রসারের অপরিহার্য অঙ্গ। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গ্রন্থাগার অনবদ্য ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামের স্বল্পশিক্ষিতরা প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জ্ঞান আহরণ করতে পারে গ্রন্থাগারে এসে। তাই গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও এর প্রসার ঘটানো উচিত। প্রতিটি স্কুল-কলেজে উন্নতমানের গ্রন্থাগার গড়ে তোলা দরকার। স্কুলে বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা গেলে পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার স্থাপন করা সহজ হবে। এতে সামাজিক অবক্ষয় রোধের পথ অনেকখানি প্রসারিত হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ভূমিকা: মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিমেয়। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়ের সেরা কষ্টিপাথর মাতৃভাষা। মাতৃভাষা অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। মাতৃভাষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের এক মৌলিক সম্পদ। বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৫২ সালে বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালি বিশ্ব-ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারই স্বীকৃতি পেয়েছি আমরা শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে। বিশ্ব এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পূর্ববাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিল মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা। তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার জনগণের ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করার পথ বেছে নেয়। তারা ঘোষণা করে— বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে না, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে উর্দু, যা কিনা ছিল মাত্র ৭ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা। এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হয় সমগ্র পূর্ববাংলা। বাঙালি ঘোষণা করেছিল, সকল মাতৃভাষাই সমান মর্যাদা লাভের অধিকারী। তাই উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকেও দিতে হবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ন্যায্য দাবি নস্যাৎ করার জন্যে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি চালায়। এতে

শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। আন্দোলন আরও প্রচণ্ড হয়, গর্জে ওঠে সারা বাংলা। আতঙ্কিত সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে শহীদের স্মরণে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারির চেতনাই বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। এই সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, "১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্যে অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সেদিন যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাব করা হচ্ছে।" আজ ভাষা দিবস কেবল আমাদের একার নয়, বিশ্বের দেশে দেশে পালিত হয় এই দিন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : কানাডার প্রবাসী বহুভাষী জনের সংগঠন 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড' প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর পেছনে যে দুজন প্রবাসী বাঙালির অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম। বহুভাষী ভাষাপ্রেমিক ঐ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানকে একটি চিঠি লেখা হয়। কফি আনান ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ জানালে ইউনেস্কোতে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষা বিভাগের প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ বেসরকারি উদ্যোগে কোনো প্রস্তাব গ্রহণের অপরাগতার কথা জানান। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়। ২৭টি দেশ এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩১তম সম্মেলনে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের স্বীকৃতি পায়। যে দিবসটি কেবল 'ভাষা শহীদ দিবস' হিসেবে পালিত হত আজ তা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য : ভাষা একটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ইউনেস্কোর সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য, বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুধাবন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য হল প্রতিটি মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া, বিশেষ করে দুর্বল ও জীর্ণ মাতৃভাষাগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, দুর্বল বলে কোনো ভাষার ওপর প্রভুত্ব আরোপের অপচেষ্টা না করা। এ দিবসে প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষ নিজের মাতৃভাষাকে যেমন ভালোবাসবে তেমনি অন্য জাতির মাতৃভাষাকেও মর্যাদা দেবে। এভাবে একুশকে ধারণ করে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার প্রেরণা পাবে মানুষ।

উপসংহার : আমাদের মহান একুশ আজ স্বদেশের আঙিনা পেরিয়ে পরিণত হয়েছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষার প্রেরণা। এখন আমাদের করণীয় হল, জ্ঞানের সব ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রয়োগ বৃদ্ধিতে সাধ্যমতো প্রয়াস চালানো। মাতৃভাষার শক্তি বাড়িয়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে নতুন শতকের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করা। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে মাতৃভাষায় চর্চার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মাতৃভাষার সেবা করার পাশাপাশি বিশ্বের তাবৎ মানুষের মাতৃভাষার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এই চেতনাকে সবার মধ্যে সঞ্জীবিত করার মধ্যেই নিহিত আছে এই মহান দিবসের সার্থকতা।

বিজয় দিবস

সূচনা : ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১-এর এই দিনে অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় বিজয়। এই দিনে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রে জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাই 'বিজয় দিবস' আমাদের আত্মমর্যাদার ও আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

পটভূমি : বাংলাদেশের বিজয় দিবসের পটভূমিতে রয়েছে বিপুল ত্যাগ ও সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসের এক গৌরবময় মাইলফলক মহান ভাষা-আন্দোলন। এই আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বাঙালির ভাষাভিত্তিক

জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। পরে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী জঙ্গিবাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম। এ পটভূমিতেই ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন স্বাধীনতা। পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বীর বাঙালি। শুরু হয় এ দেশে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা—মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চলে মুক্তিসেনাদের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালি জীবন বিসর্জন দেয়। অবশেষে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় সূচিত হয়। এই দিনে ঢাকায় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যানে) ঘটে ইতিহাসের অন্যতম গৌরবময় ঘটনা—পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মাথা নিচু করে অস্ত্র মাটিতে ফেলে আত্মসমর্পণ করে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে।

তাৎপর্য : ত্রিশলক্ষ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। অনেক অশ্রু বিসর্জনে পাওয়া এ স্বাধীনতা আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে নিয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পতাকা, গাইছে বিজয়ের গৌরবগাথা। তাই বিজয় দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতি বছর এই দিনটি পালনের মাধ্যমে আমরা নতুন প্রজন্মকে এবং বিশ্বকে বারবার মনে করিয়ে দিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, বীর শহীদদের কথা। আমরা অনুপ্রাণিত হই আমাদের দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা স্মরণ করে। উদ্বুদ্ধ হই অগ্রগতির পথযাত্রায় এগিয়ে যেতে।

বিজয় দিবস ও বর্তমান বাস্তবতা : শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হলেও আমাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবের আঘাতে আজ ছিন্নভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনেককিছুই এখন চলে গেছে আড়ালে। গণতন্ত্র এখন সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এখন স্বপ্ন-বিলাসিতা। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ হয়েছে পরিত্যক্ত। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা বিভেদ ও সংঘাতে পর্যবসিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিজয় দিবস এখনও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

অনুষ্ঠানমালা : বিজয় দিবস উদযাপিত হয় মহাসমারোহে। এ দিন সারাদেশ ছেয়ে যায় লাল-সবুজের সাজে। বাড়ির ছাদে, দোকানে, রাস্তার পাশে, গাড়ির সামনে, স্কুল-কলেজে, এমনকি রিকশার হ্যান্ডেলেও শোভা পায় লাল-সবুজ রঙের জাতীয় পতাকা। প্রতিটি শহরে পরিলক্ষিত হয় উৎসবের আমেজ। রাজধানী ঢাকার রাস্তায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আয়োজন করে গণমুখী নানা অনুষ্ঠানের। স্বাধীনতার আবেগে উদ্বেলিত নরনারী উৎসবের সাজে সেজে সেখানে জমায়েত হন। স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীরা নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এইদিন সকালবেলা ঢাকার জাতীয় প্যারেড ময়দানে সেনাবাহিনীর উদ্যাগে কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, কূটনীতিবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষ এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। চট্টগ্রামে বিজয় দিবস উপলক্ষে ৭ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম এবং তার আশেপাশের এলাকা থেকে প্রতিদিন হাজার মানুষ এই মেলা দেখতে আসেন। দেশের প্রতিটি জেলায়ও উৎসবমুখর পরিবেশে এই দিনটি পালিত হয়।

উপসংহার : বিজয় দিবস আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন হলেও এর সাথে জড়িয়ে আছে ৭১-এর মহান শহীদদের স্মৃতি, স্বজন হারানোর আর্তনাদ আর যুদ্ধাহত ও ঘরহারা মানুষের দীর্ঘশ্বাস। এ দিনটি শুধু আমাদের বিজয়ের দিন নয়, এটি আমাদের চেতনার জাগরণের দিন। তাই এই দিনে প্রতিটি বাঙালি নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় দেশকে গড়তে— বিশ্বসভায় সামনের সারিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে।

শহীদ দিবস ও একুশের চেতনা

(সংকেত)

সূচনা : একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে চেতনার এক অগ্নিমশাল। ভাষা-আন্দোলনের অমর স্মৃতি বিজড়িত এই শহীদ দিবস বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপনের দিন।

পটভূমি : ভাষা-আন্দোলনের সূচনা ১৯৫২ সালের আগেই। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মের সময়ে এর শাসনক্ষমতা দখল করে পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের কুখ্যাত সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিল। পূর্ববাংলার জনগণ তা মেনে নিল না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হল তীব্র গণ-আন্দোলন।

পুলিশ মিছিলে গুলি চালালো নির্বিচারে। তাতে শহীদ হল সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ নাম না-জানা অনেক ছাত্র ও পেশাজীবী। শহীদের রক্তের প্রেরণায় সে আন্দোলন আরও দুর্বার হয়ে উঠল। শেষে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাধ্য হল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে।

শহীদ দিবসের তাৎপর্য : আমাদের জাতীয় জীবনে আন্দোলনমুখর এ দিনটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। বুকের রক্তঝরা ঐ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার। তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুর্বার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের পথ ধরেই আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল হয়েছি, অর্জন করেছি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়।

শহীদ দিবসের স্বীকৃতি : একুশে ফেব্রুয়ারির মহান গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর এই দিনটিকে ইউনেস্কো দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ বিশ্বের সকল দেশে সকল জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতির এক অনন্য স্মারক।

উপসংহার : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষার জন্য আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এ দিনের মহান আত্মদানের ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি তার স্বদেশের দিকে তাকিয়েছে। একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের তাই এগিয়ে যেতে হবে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল ও কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার পথযাত্রায়।

স্বাধীনতা দিবস

(সংকেত)

সূচনা : স্বাধীনতা দিবস জাতীয় জীবনের গৌরব ও তাৎপর্যময় দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ। এই দিনটি জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য, অগ্রগতি ও বিকাশের প্রতীক।

ঐতিহাসিক পটভূমি : বাংলাদেশ এক সময় ভারতবর্ষের অঙ্গ ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তা পাকিস্তানের অঙ্গ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি কুচক্রী শাসকদের কবলে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা শোষিত ও বঞ্চিত হয়। সকল ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালিরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ভাষা-আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন—'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন : এ উপলক্ষে কুচকাওয়াজ, আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। পত্রপত্রিকায় বিশেষ প্রকাশনা ও বেতার-টিভির বিশেষ অনুষ্ঠানে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

উপসংহার : এ দিনের অনুষ্ঠানমালা আমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে উজ্জীবিত করে।।

সংবাদপত্র

ভূমিকা : যেসব উপকরণ মানবজীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত করেছে তার অন্যতম হচ্ছে সংবাদপত্র। আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিহার্য। সংবাদপত্র যে কেবল সংবাদ পরিবেশন করে তা নয়, জনমতের প্রতিফলন ও জনমত গঠনেও সংবাদপত্রের রয়েছে ইতিবাচক ভূমিকা। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র বহু দল ও মতের ধারক-বাহক হিসেবেও কাজ করে। এভাবে সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে রচনা করে সেতুবন্ধন। কাজ করে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে।

আধুনিক সংবাদপত্রের বিষয়-বিস্তার : আধুনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা কেবল সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশ-বিদেশের রাজনীতি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা সংবাদ ছাড়াও তা পরিবেশন করে বিচিত্র তথ্য-প্রতিবেদন। শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য এবং সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বিনোদন জগতের বিচিত্র কর্মধারা এখন সংবাদপত্রের আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। অর্থনীতি ও রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইতিহাস ও ভূগোল, ধর্ম ও দর্শন, ব্যবসা ও বাণিজ্য সবই এখন সংবাদপত্রের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। সংবাদপত্রের থাকে

শিশু-কিশোর ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা বিভাগ, মেয়েদের জন্য আলাদা পাতা, থাকে জনজীবনের সমস্যাভিত্তিক চিঠিপত্রের কলাম। কোনো কোনো পত্রিকা আবার পাঠকদের নিয়ে গড়ে তোলে আলাদা ফোরাম। কোনো কোনো পত্রিকা বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে জনমত জরিপ করে এবং সরকার ও জাতিকে পরামর্শ দেয়। সব মিলিয়ে সংবাদপত্র এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চলমান নির্দেশিকা।

সংবাদপত্র ও জনমত গঠন : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনগণ জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র ও সরকারের নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে জনগণ অবহিত হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। ক্ষমতাসীনরা সবসময় তাদের পদক্ষেপকে জোর সমর্থন করেন আর বিরোধীরা তার সমালোচনা করেন। কিন্তু সংবাদপত্র উভয় পক্ষের মতামত, যুক্তি ও তথ্য-নির্ভর আলোচনা প্রকাশ করে পাঠকের নিজেস্ব অভিমত গঠনে সাহায্য করে। সংবাদপত্রের পাতায় জ্ঞানীগুণী ও বিশেষজ্ঞদের লেখা প্রবন্ধ ও অভিমত, কলাম লেখকদের তর্কবিতর্ক, যুক্তিপ্রদান ও যুক্তিখণ্ডন, পত্রিকার নিজস্ব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় জনমত গঠনে সাহায্য করে। এভাবে সরকারের জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপকে সমর্থন ও গণবিরোধী নীতির সমালোচনায় সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পরিপূরক ভূমিকা : বর্তমানে আমাদের দেশে পাঠক্রমভিত্তিক এবং পরীক্ষানির্ভর সার্টিফিকেটমুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা পরিণত হয়েছে নোট ও গাইডনির্ভর মুখস্থ বিদ্যায়। অন্যদিকে সংবাদপত্র এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রকেই তার আওতায় এনেছে। ফলে তাতে কেবল দৈনন্দিন জগতের খবরাখবর থাকে না, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য, খেলাধুলা, বিনোদন, স্বাস্থ্য, চাকরি, জীবিকা ইত্যাদি সম্পর্কেও নানা তথ্য থাকে। নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে বহুমুখী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়। এতে জনগণের জ্ঞানের ক্ষেত্র যেমন সম্প্রসারিত হয় তেমনি ভাষাজ্ঞানও বাড়ে। তা ছাড়া দেশ ও জাতির সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা অবগত হন। তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত হয়। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্প্রীতিবোধের প্রসার ঘটে। এভাবে সংবাদপত্র জনগণের সর্বতোমুখী শিক্ষায় অবদান রাখে।

সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতা : সংবাদপত্রের ইতিবাচক দিকের মতো কিছু সীমাবদ্ধতাও চোখে পড়ে। এখন অনেক সংবাদপত্র বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর মালিকানা বা রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়ে পড়েছে। এসব সংবাদপত্র প্রায়শ শিল্পগোষ্ঠীর কিংবা রাজনৈতিক দলের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে। তা ছাড়া মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বেশির ভাগ সংবাদপত্রই পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে। জনস্বার্থের চেয়ে বাণিজ্য-স্বার্থই এদের কাছে মুখ্য। তা ছাড়া এক শ্রেণির সংবাদপত্র হীন স্বার্থে রাজনীতিক বিভেদ সৃষ্টি ও বল্গাহীন মিথ্যা প্রচারে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে ব্যস্ত। এই প্রেক্ষাপটে দায়বদ্ধ নিরপেক্ষ সাংবাদিক আদর্শও নস্যাৎ হচ্ছে। এটি দেশ ও জাতির জন্যে কল্যাণকর নয়।

উপসংহার : বর্তমানে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানব উন্নয়ন এবং মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উন্নততর জীবন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আগ্রহ সৃষ্টিতেও সংবাদপত্রের দায়িত্ব কম নয়। আমাদের দেশে রয়েছে ব্যাপক নিরক্ষরতা ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা। এই প্রেক্ষাপটে সমাজ-জীবনে আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও বিজ্ঞানমুখী চেতনার বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা হতে হবে কল্যাণমুখী। দলীয় স্বার্থ ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে সংবাদপত্রকে। গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন সুশীলসমাজ গড়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে হবে। জনস্বার্থ ও মানবতার পক্ষে অবস্থান নিলে সত্যিকার অর্থে সংবাদপত্র হয়ে উঠবে জনগণের কণ্ঠস্বর।

টেলিভিশন

ভূমিকা : একালের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী গণমাধ্যম হচ্ছে টেলিভিশন। এ এক বিস্ময়কর গ্রাহকযন্ত্র। এর ছোট্ট পর্দায় মুহূর্তেই ভেসে ওঠে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্ত থেকে সম্প্রচারিত যে-কোনো ঘটনা, অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির সবাক জীবন্ত ছবি। সদ্য ঘটনার ছবি ছাড়াও ধারণকৃত ছবিও এতে দেখানো চলে। ফলে টেলিভিশন এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হয়ে উঠছে তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের অপরিহার্য মাধ্যম।

ইতিহাস : গ্রিক 'টেলি' আর লাতিন 'ভিশন' শব্দযোগে গঠিত টেলিভিশন শব্দটির অর্থ হচ্ছে দূরদর্শন। ১৯২৬ সালে বিজ্ঞানী লোগি বেয়ার্ড প্রথম সাদা-কালো ছবির সফল বৈদ্যুতিক সম্প্রচারে সফলতা দেখান। তারই পথ ধরে প্রকৌশলী আইজাক শোয়েনবার্গের কৃতিত্বে ১৯৩৬ সালে বিশ্বের প্রথম সফল টিভি সম্প্রচার শুরু করে বিবিসি। ৫০-এর দশকে উন্নত বিশ্বে টেলিভিশনই হয়ে ওঠে প্রধান গণমাধ্যম। সাম্প্রতিককালে টেলিভিশন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী অগ্রগতি হয়েছে। তারই ফসল রঙিন টেলিভিশন, ফ্ল্যাট টেলিভিশন, পকেট টেলিভিশন ইত্যাদি। এ ছাড়া মহাকাশ গবেষণা ঘিরেও টেলিভিশনের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। স্যাটেলাইট টিভি সম্প্রচার তারই প্রত্যক্ষ ফল।

বাংলাদেশে প্রথম টিভি সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৪ সালে, কেবল ঢাকা শহরে। ১৯৭৬ সালে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে টিভি সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৯৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে টিভি কেন্দ্র চালু হয়।

সংবাদ-মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন : স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে টেলিভিশন এখন চব্বিশ ঘণ্টা তথ্য প্রদানে সক্ষম। গণযোগাযোগের বিশ্বব্যাপী জাল বিস্তারে টেলিভিশন যে ভূমিকা পালন করছে তা অভাবনীয়। সংবাদ-মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের ভূমিকায় এখন গ্রামের নিরক্ষর মানুষও তথ্যসচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঘটনা বা পরিস্থিতিতে টেলিভিশন সংবাদমাধ্যম হিসেবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিনোদনমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন : টেলিভিশন আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে বৈচিত্র্যময় বিনোদনের সুযোগ। টিভিতে সম্প্রচারিত সৃজনশীল মনোমুগ্ধকর নানা অনুষ্ঠান আমাদের অভিভূত করে। সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপভোগের সুযোগ আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে পাচ্ছি। টেলিভিশনের সুবাদেই আমরা খেলার মাঠে না গিয়েও অলিম্পিক ও বিশ্বকাপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেলা দেখতে পারি, সিনেমা হলে না গিয়েও ঘরে বসে নানা চলচ্চিত্র উপভোগ করতে পারি।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন : টেলিভিশন গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেলিভিশনের পর্দায় পাঠ্যসূচির বিষয় আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়। ফলে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। ডিসকভারি, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, দি হিস্টরি চ্যানেল ইত্যাদি চ্যানেলের কল্যাণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। টেলিভিশনে প্রচারিত বিতর্ক, আলোচনা, সেমিনার, মুখোমুখি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞের অভিমত ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ টেলিভিশন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তা ছাড়া শিশু-কিশোরদের জন্যে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারেও আমাদের টেলিভিশন সচেষ্ট।

অন্যান্য ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা : টেলিভিশনের আরো কিছু ভূমিকা রয়েছে। দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের ভূমিকা জনগণকে অবহিত করার ব্যাপারে টেলিভিশন মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া জনমত সৃষ্টিতে টেলিভিশন কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে টেলিভিশন কূপমন্ডূকতা ও সংকীর্ণতার হাত থেকে আমাদের বাঁচায় এবং দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে টেলি-সম্মেলনের আয়োজন এখন তথ্য-বিনিময়ের সর্বাধুনিক পন্থা হিসেবে সমাদৃত।

টেলিভিশনের নেতিবাচক ভূমিকা : টেলিভিশনের কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। টিভির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। টেলিভিশনের আকর্ষণ তরুণদের খেলাধুলা থেকে বহুলাংশে বিরত করছে। টিভিতে খেলা দেখার চেয়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা যে দেহ-মনের জন্য শ্রেয় তা এখন তরুণরা ভুলতে বসেছে। তা ছাড়া স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারিত এক ধরনের অনুষ্ঠান তরুণ প্রজন্মকে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। কুরুচিপূর্ণ এবং স্থূল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে। অন্যদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টেলিভিশন চ্যানেলগুলি ক্রমেই পরিণত হচ্ছে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানে। পণ্যদ্রব্যের রমরমা বিজ্ঞাপন প্রচার করে ভোগ্যপণ্যের বাজার তৈরিই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভোগ্যপণ্যের প্রতি তীব্র আসক্তি সৃষ্টি করে এরা তরুণদের পরিভোগপ্রবণ জীবনদর্শনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা সমাজ-প্রগতির অন্তরায়।

উপসংহার : আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে টেলিভিশনকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উন্নয়নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। জাতির নৈতিক চরিত্রের উত্তরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে টেলিভিশন হতে পারে কার্যকর বাহন। তাই টেলিভিশন যেন সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিপন্থী ভূমিকায় অবতীর্ণ না হতে পারে তা নিশ্চিত করা দরকার।

বেতার
(সংকেত)

ভূমিকা : বেতার বা রেডিও আধুনিককালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম।

বেতারযন্ত্র উদ্ভাবন : বেতার যন্ত্র বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফল। এর আবিষ্কারে জগদীশচন্দ্র বসুর ভূমিকা থাকলেও আবিষ্কারক হিসেবে মার্কনির নামই প্রচলিত।

বেতার সম্প্রচার পদ্ধতি : ট্রান্সমিটারের সাহায্যে শব্দের শক্তি বৃদ্ধি করে দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা হয়।

বেতারের অবদান : সংবাদ ও তথ্য সম্প্রচারে, শিক্ষা বিস্তারে ও বিনোদনে বেতারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

উপসংহার : আধুনিক বিশ্বে বেতার মানব সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ।

বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আশ্রয় মানুষের মৌলিক পাঁচটি চাহিদার মধ্যে খাদ্য হচ্ছে প্রধান। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে আবাদি জমির অনুপাতে জনসংখ্যা বেশি। প্রতি বছর জনসংখ্যার হার আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবাদি জমি বাড়ছে না, বাড়ছে জনসংখ্যা। এ বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে। ফলে ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা মেটাতে সরকারকে প্রতিবছর হিমসিম খেতে হয়। জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন কম। এ ছাড়া প্রতিবছর বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচুর পারিমাণে খাদ্য-ফসল নষ্ট হয়। ফলে খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে প্রতি বছর বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। তবুও দেশে খাদ্যাভাব পূরণ হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপ। ফলে বাড়ছে দারিদ্র্য। ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার হচ্ছে বিশাল জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার স্বরূপ : গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, কিংবদন্তির সোনার বাংলার সেই অবস্থা এখন আর নেই যদিও আজো এ দেশের মাঠে ফসল ফলে, নদীতে মাছ জন্মায়। কিন্তু মানুষের ঘরে সেই সমৃদ্ধি নেই, নেই সেই সচ্ছলতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর কৃষিভূমি হ্রাসের ফলে উৎপাদিত খাদ্যশস্য মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। ফলে এ দেশে খাদ্য সংকট বেড়েই চলেছে।

আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের হানি প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমির উর্বরা শক্তি কমে যাচ্ছে। সার, কীটনাশক দিয়ে যতই উৎপাদন বাড়ানো হোক না কেন সীমিত জমির উৎপাদন শক্তির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। ফলে খাদ্য সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

খাদ্য সমস্যার কারণ : আমাদের দেশে খাদ্য সমস্যার অন্যতম কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। মানুষ বাড়ছে, কিন্তু জমি বাড়ছে না। ক্ষুদ্রায়তনের এই বাংলাদেশে আবাদি জমির পরিমাণ মাত্র শতকরা বিশভাগ, এটুকু জমির সবটাতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। তা ছাড়া জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে বাসস্থান ও কলকারখানা নির্মাণের কাজে আবাদি জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই ব্যয় হচ্ছে খাদ্যশস্য আমদানি করতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এভাবে অব্যাহত থাকলে, আগামীতে দেশের খাদ্যসংকট কী পরিমাণ হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। সনাতন পদ্ধতির কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের খাদ্যসংকটকে আরো প্রকট করে তুলেছে। আমাদের দেশে সর্বত্র আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও কৃষিউৎপাদন ব্যবস্থা এখনো রয়ে গেছে মান্ধাতার আমলে। সার এবং কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও, বৃদ্ধি পায়নি লাগসই কোনো প্রযুক্তি। হালের বলদ আর মই-

লাঙল আজো দরিদ্র কৃষকের কৃষিকাজের প্রধান হাতিয়ার। তা ছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়।

খাদ্যসমস্যার প্রতিকার : আমাদের দেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য সরকার ও জনগণকে মিলিতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। সরকারকে নিতে হবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং জনগণকে নিতে হবে উদ্যোগী ভূমিকা। সরকার ভূমিব্যবস্থাপনা ও কৃষিনীতি ঘোষণা করে কৃষিক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষককে সহযোগিতা দিতে পারে। আমাদের দেশে এখনো পনেরো শতাংশ জমি অনাবাদি রয়েছে। এ সমস্ত জমিকে চাষের আওতায় এনে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। অশিক্ষিত, দরিদ্র, গ্রামীণ কৃষককে প্রশিক্ষণ দান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, মাটির উর্বরাশক্তি আর গুণাগুণ সম্পর্কে কৃষককে সচেতন করে তুলতে হবে। এ ছাড়া কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করা ও ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তবেই কৃষক খাদ্যশস্য উৎপাদনে অধিক উৎসাহী হয়ে ওঠবে।

দরিদ্র কৃষকই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণ করে। অথচ সেই দরিদ্র কৃষক সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কৃষকের নেই কোনো সামাজিক মর্যাদা। কৃষিক্ষেত্রে অর্থঋণের সুবিধাও খুব সীমিত। এ ছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দুর্গত এলাকার কৃষকদের সার, বীজ, কৃষিযন্ত্রপাতি ও অর্থসাহায্য দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শুধু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই হবে না। দরকার জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ। এখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে লাগাম টেনে না ধরলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে খাদ্য সংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। পরিসংখ্যানবিদদের ধারণা, দু হাজার বিশ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় বিশ কোটিতে উন্নীত হবে। এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা কীভাবে পূরণ হবে, তা ভাবাই যায় না। সুতরাং এখনই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার : খাদ্য সমস্যা দেশের একটি মৌলিক সমস্যা। এ সমস্যা অবশ্যই সমাধানযোগ্য। তবে এর জন্য দরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, বাস্তবমুখী পদক্ষেপ এবং সরকার ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগী ভূমিকা। সরকার ইতোমধ্যে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি সংস্থা উচ্চ ফলনশীল নানা বীজ ও শস্যের উদ্ভাবন করেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসব প্রচেষ্টা সফল এবং বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করা কঠিন হবে না।

বাংলাদেশের বন্যা ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রকৃতিক দুর্যোগের দেশ। নদীমাতৃক এ দেশে ঝড় জলোচ্ছ্বাস আর বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছরই হয়। বন্যায় খেতের ফসল নষ্ট হয়। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়। বন্যায় গবাদিপশু ভেসে যায়। হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন, সাজানো সংসার সবই ভেসে যায় বন্যায়। বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, তখন বাংলাদেশের নদনদীগুলো উপচে পড়ে। বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি করে সর্বনাশা বন্যা। তলিয়ে যায় গ্রাম জনপদ, ফসলের মাঠ, বাড়িঘর সবকিছু। হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের মানুষ এই বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে বসবাস করছে। প্রবাদে বলে 'নদীর কূলে বাস, দুঃখ বারো মাস।'

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাস : বাংলাদেশে বন্যার ইতিহাস অনেক পুরোনো। বাংলা ১২৮৩ সালে এ দেশে এক ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালের বন্যা এখনো মানুষের মনে বিভীষিকার স্মৃতি হয়ে আছে। ১৯৭০ সালের ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লাখ মানুষ মারা গেছে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের ১৭টি জেলার মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া ১৯৮৪ এবং ১৯৮৮ সালের বন্যা এ দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। উপকূলীয় প্রায় পাঁচটি জেলার ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, গাছপালা, ফসলের খেত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এভাবে

হিসাব করলে দেখা যায়, বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন সময়ে মারা গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সম্পদের হানি হয়েছে প্রচুর। বন্যা ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাস বারবার আঘাত হানলেও এ দেশের মানুষ পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সেসব মোকাবিলা করেছে। নতুন স্বপ্ন নিয়ে আবার বেঁধেছে ঘর। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খেতে ফসল বুনেছে আবার।

বন্যা ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে জনদুর্ভোগ : প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ দেশের হতদরিদ্র সাধারণ মানুষ। তাদের শন-বাঁশের কাঁচা ঘরবাড়ি অধিকাংশই ডুবে যায় এবং পচে ভেঙে যায়। তারা আশ্রয়হীন অসহায় হয়ে পড়ে। নারী ও শিশু নিয়ে তারা ওঠে বেড়িবাঁধে, স্কুলঘরে, মসজিদে। বন্যার ফলে গ্রামের কাঁচারাস্তা, পোল-কালভার্ট ভেঙে পড়ে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বানভাসি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। তারা খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায় ছুটতে থাকে শহরের দিকে। ফলে শহরে বস্তির সংখ্যা বাড়তে থাকে। বন্যার সময় খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসার অভাব থাকে বলে দুর্গত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। চারিদিকে পানি, অথচ পান করার মতো পানি নেই। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে অনেক সময় তারা বন্যার পানি খেতে বাধ্য হয়। ফলে পানিবাহিত নানারকম অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ে। ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরায় অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে। বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। কৃষিক্ষেত্রে সমস্যা হয় আরো প্রকট। বন্যায় খেতের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কৃষকের ঘরে থাকে না বীজ, গোয়ালে থাকে না গরু, থাকে না কৃষি যন্ত্রপাতি। বন্যায় গভীর-অগভীর নলকূপগুলো অকেজো হয়ে যায়। বন্যা পরবর্তী দুর্গত অঞ্চলের জনজীবন এবং কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে বলে দেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দেয়।

বন্যা ও ত্রাণ বিতরণ : বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ নিয়ে মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অনেকে। সরকারি সাহায্য বা ত্রাণ সবাই পায় না, এ অভিযোগ অনেক পুরোনো। এক শ্রেণীর মেম্বার, চেয়ারম্যান, ক্ষমতাসীন দলের সদস্য সরকারি ত্রাণ আত্মসাৎ করে ফুলেফেঁপে ওঠে। সরকারি ত্রাণের মূল সমস্যা বিতরণের অব্যবস্থাপনা। সরকার এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণশিবির, লঙ্গারখানা খুলে দুর্গত মানুষদের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ত্রাণ সাহায্য দুর্গত মানুষদের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কখনো কখনো পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না সরকারের, বিশেষ করে আকস্মিক বন্যার সময়। ফলে দুর্যোগ যখন উপস্থিত হয় তখন তাড়াহুড়ো করে দুর্গত মানুষদের সাহায্য করতে গিয়ে নানা অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি ঘটে।

বন্যা ও তার প্রতিকার : বন্যা বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ সমস্যা। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ হয়তো মানুষের হাতে নেই। কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা অনেকাংশে সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশই এ সমস্যার সমাধান করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে এর ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যার প্রতিকার দুইভাবে করা যায়। একটি হচ্ছে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, অন্যটি হচ্ছে অস্থায়ী বা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। স্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে : বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীবিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিকল্পনা নিয়ে বাঁধ নির্মাণ করা, ভরাট নদীগুলো পুনর্খনন, জলাধার নির্মাণ, স্লুইজ গেট, রেগুলেটর ব্যারেজ নির্মাণ ইত্যাদি। অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে: বন্যার দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকারের পূর্বসতর্কতামূলক কর্মসূচি নেওয়া, যাতে উপদ্রুত অঞ্চলের লোকজন ও সম্পদ সরিয়ে আনা যায়। বন্যা চলাকালীন সময়ে দুর্গত মানুষ যাতে কষ্ট না পায়, সে জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, তাঁবুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া দেশের যেসব অঞ্চল বন্যা বা দুর্যোগপ্রবণ, সেসব এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা। বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর সে এলাকার কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার : প্রকৃতিকে জয় করে মানুষ সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছে। মিশরের নীলনদ, চীনের হোয়াংহো নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণে আনার পেছনে সংগ্রামী মানুষের শ্রমঘাম রয়েছে। আমাদের দেশের মানুষও কোনো অংশে কম নয়। দরকার শুধু পরিকল্পিত উদ্যোগের।

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মের অভাবকেই সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বেকারত্ব বলে। বেকারত্ব একটি দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। বেকারত্ব মানবজীবনের জন্য যেমন অভিশাপস্বরূপ, তেমনি জাতীয় জীবনের জন্য বিরাট বোঝা। বেকার মানুষ নানা অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এতে পরিবেশ ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়।

বাংলাদেশে বেকার সমস্যার স্বরূপ : বাংলাদেশ মূলত কৃষিনির্ভর, স্বল্প পুঁজির দেশ। শিল্পায়নের সুযোগ এখানে সীমিত। তাই অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের পাশাপাশি পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর একটি বড় কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার সমন্বয়হীনতা। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা মোটেও কর্মমুখী নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণরা শিক্ষা লাভের পর আর কেউ পিতৃপেশায়, যেমন : কৃষি, চাষাবাদ, কুটির শিল্প ইত্যাদি কাজে আর ফিরে যেতে চায় না। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার, অনেকের হাতের কাজ একজনকে দিয়ে করার মতো প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে একদিকে অশিক্ষা বা শিক্ষাবঞ্চিত তরুণ, অন্যদিকে শিক্ষিত অথচ অদক্ষ যুব সমাজ—এ দুই বিপরীতমুখী স্রোতধারা বেকারত্বের সমস্যাকে ভয়াবহ রূপ দিয়েছে, দেশের ভবিষ্যৎকে করে তুলছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে কর্মক্ষম অথচ কর্মহীন জনগোষ্ঠী সার্বিক অর্থনীতির ওপর মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

বিভিন্ন প্রকার বেকারত্ব : সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় স্থায়ী বেকারত্ব, অস্থায়ী বেকারত্ব, সাময়িক বেকারত্ব, ছদ্মবেশী বেকারত্ব ইত্যাদি নানারকম বেকারত্বের কথা বলা হয়েছে। মূলধন ও পুঁজির অভাবে আমাদের দেশে বড় ধরনের কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে না। স্বল্পপুঁজির ব্যবসাও আমাদের দেশের নানা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মার খায়। ফলে কর্মসংস্থানের তীব্র অভাবে দেশের যুবশক্তির বিরাট অংশ দীর্ঘকাল বেকারত্বের দায়ভার কাঁধে নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটাচ্ছে।

নির্দিষ্ট কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রম বিনিয়োগই প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। আমাদের দেশে কৃষি ক্ষেত্রে এই বেকারত্ব বর্তমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বছরের মাত্র কয়েক মাস কাজ থাকে, বাকি সময় কাজ থাকে না। এ ধরনের বেকারত্বকে সাময়িক বেকারত্ব বলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ছদ্মবেশী বেকার দেখা যায় বেশি। তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাদের অবদান আছে। এ ধরনের বেকারত্বকে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলে। আমাদের দেশে এক-এক মৌসুমে এক-একরকম কাজের বা লোকের চাহিদা থাকে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ ধরনের কাজের কোনো সুযোগ থাকে না। এরকম বেকারত্ব মৌসুমি বেকারত্বের পর্যায়ে পড়ে। বেকারত্ব যে ধরনের হোক না কেন, তা কখনো কাঙ্ক্ষিত নয়। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। উচ্চ শিক্ষিত তরুণ যোগ্যতা অনুসারে চাকরি পাচ্ছে না, কিংবা পছন্দের পেশায় চাকরি হচ্ছে না এরকম বেকার সবচেয়ে বেশি। চাকরি দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের সুযোগ যে অল্প, তা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। প্রতিযোগিতার এই মার্কেটে যোগ্য ও দক্ষ লোকের অভাব নেই। সবাই চায় নির্ঝঞ্ঝাট আকর্ষণীয় চাকরি। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব। তাই দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেকার সমস্যার সমাধান : বেকার সমস্যা আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের জাতীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন সমাজ কাঠামোর সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে, যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। দেশে শিল্প- কলকারখানা স্থাপন করে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। প্রযুক্তি শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে সেখানে যুবশক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের বেকারত্ব ঘোচাতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করা দরকার। বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা গড়ে তুলে দক্ষ, অদক্ষ তরুণ-তরুণীদের সেখানে কাজে লাগাতে হবে। দেশের শিক্ষিত যুব সমাজকে গ্রামমুখী করে গড়ে তোলা আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। চাকরির মানসিকতা পরিহার করে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রতি তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং শর্তহীন বা সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সরকার চালু করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের কার্যক্রম চালু করেছে। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ এবং ঋণের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর শিক্ষিত যুবক স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়েছে। দেশের যুব শক্তিকে কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, পশু পালন, কৃষি খামার, দুগ্ধ খামার ইত্যাদি কাজে উৎসাহী করে তুলতে হবে। এর জন্য গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শনী, পোস্টার ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : আমাদের দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। শিল্পায়নই এর অন্যতম পথ। দেশের কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়নের দিকেও নজর দিতে হবে। এর জন্য দরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার। তা ছাড়া, শিক্ষিত তরুণদের শুধু চাকরির সোনার চাবির পেছনে ঘোরার মানসিকতা পরিহার করে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের কথা ভাবতে হবে। যুবসমাজকে বেকারত্বের অভিশাপ ও অপবাদ ঘোচাতে হলে এবং জাতির কাঁধ থেকে বেকারত্বের বিশাল বোঝা নামাতে হলে সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি জনগণকেও সমবেত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পল্লী-উন্নয়ন

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমলে লাবণী,

ভূমিকা : হাজার বসতি নিয়ে এক একখানা গ্রাম। বাউলের একতারা মাটির সুবাসে ভরা গ্রাম। আটষট্টি হাজার গ্রামের সেই অতীত গৌরব এখন আর নেই। গোলাভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছের সুখকর সমৃদ্ধির কথা ম্লান হয়ে আছে স্মৃতির পাতায়। সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা গ্রামবাংলা তার সকল সমৃদ্ধি হারিয়ে এখন উপেক্ষিত। বিধাতা তৈরি করেছিলেন গ্রাম আর মানুষ তৈরি করেছে শহর। শহরের চাকচিক্য আর চোখ ধাঁধানো আলোয় বিভ্রান্ত মানুষ পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে শহরের নির্মম সৌন্দর্যে। ফলে গ্রাম হয়ে গেছে হতশ্রী। অশিক্ষা, দুঃখ-দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর নদীর আক্রোশে ভেঙেপড়া গ্রাম এখন রুগ্‌ণ, শুষ্ক, শ্রীহীন।

অতীতের গ্রাম: এককালে এ দেশের গ্রামগুলোই ছিল সম্পদ আর সমৃদ্ধির প্রাণকেন্দ্র। উদার প্রকৃতি, মুক্ত আকাশ, সতেজ হাওয়া ভরিয়ে দিত মন। বিস্তৃত ফসলের মাঠ, বিশাল নদীর বুকে পাল তোলা সওদাগরি নৌকা, সহজ সরল গ্রামবাসীদের অনাড়ম্বর সাধারণ জীবন যাপন, উৎসব-অনুষ্ঠান এসব ছিল গ্রামের সমৃদ্ধির নমুনা। কবি জসীমউদ্‌দীন সেই গ্রামের কথাই বলেছেন-

তুমি যাবে ভাই, যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায় ॥

সেই কিংবদন্তির গ্রামবাংলা এখন আর নেই। রোগ, শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অশিক্ষা-অন্ধকার, কুসংস্কার আর বেকারত্বে গ্রাম এখন পর্যুদস্ত।

গ্রামের বর্তমান অবস্থা : নানা সমস্যায় জর্জরিত এখন গ্রামের জীবন। গ্রামে যারা একটু লেখাপড়া শিখছে, তারা শহরে ছুটছে চাকরির আশায়। লেখাপড়া জানা লোক এখন আর গ্রামে থাকতে চায় না। কারণ গ্রামে শিক্ষিত লোকের কোনো কর্মসংস্থান নেই। জীবিকা নেই, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ নেই। দেশে মানুষ বেড়েছে, শিক্ষার সুযোগও অনেক বেড়েছে কিন্তু গ্রামে শিক্ষিত লোকের অভাব আগের মতোই। যোগাযোগ-ব্যবস্থা কোথাও কোথাও কিছুটা ভালো হলেও অধিকাংশ গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নত নয়। ফলে অবহেলিত গ্রামে স্বাচ্ছন্দ্যহীন পরিবেশে মানুষ বাস করতে চায় না। গ্রামের কথা ভাবলেই এখন চোখে ভাসে ক্লিষ্ট মানুষ, ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ বাড়িঘর ইত্যাদি।

পল্লী উন্নয়ন : বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই পল্লী-উন্নয়ন করতে হবে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামের উন্নয়ন প্রয়োজন। কারণ, গ্রাম উন্নয়ন ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। আর এ কারণেই গ্রামের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা, গ্রামের অর্থনীতিকে সবল করার জন্য স্বাস্থ্য, সেনিটেশন-ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন, কৃষিযন্ত্রপাতি, সেচ, সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। কৃষিঋণ ও কৃষিভর্তুকি-ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু সরকারি এসব উপকরণ গ্রামের সবার কাছে সময়মতো পৌঁছে না। মনে রাখতে হবে যে, গ্রাম উন্নয়ন মানে গ্রামের উচ্ছেদ নয়, গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন। গ্রাম উন্নয়নের জন্য দরকার বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন:

১. **কৃষি উন্নয়ন :** কৃষিই গ্রাম বাংলার অর্থনীতির প্রাণ। কৃষি অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে হলে দরকার কৃষিক্ষেত্রের আধুনিকায়ন। আমাদের সব জায়গায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও কৃষিক্ষেত্র রয়ে গেছে মান্ধাতার আমলে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সুলভ ও সম্প্রসারিত করতে হবে। সেচ, সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল করা যায়।

২. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** পল্লীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দরকার। এগুলো নিশ্চিত করা গেলে শিক্ষিত মানুষের গ্রামে বসবাস করার সুযোগ তৈরি হবে। শিক্ষিত মানুষ গ্রামে বসবাস করলে গ্রামের সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে ত্বরান্বিত হবে।

৩. **কুটির শিল্প :** কৃষিনির্ভর ব্যবসা, স্বল্পপুঁজির কুটির শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। অনুৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীকে কৃষির পাশাপাশি কাজে লাগাতে হবে কুটির শিল্পে।

৪. **ভূমিহীনদের পুনর্বাসন :** গ্রামে যেসব ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ আছে, তাদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ করে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে। তাদের বেকার হাতকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করা সম্ভব।

৫. **বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা :** গ্রামের দরিদ্র পরিবারের যুবক, যারা নানা কারণে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রামেই নিতে হবে। এতে গ্রামের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে বিপুলভাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণকারীদের গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার কাজে সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৬. **সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা :** সমবায় আনে সমৃদ্ধি, সমবায়ে সুখ। গ্রামের মানুষকে সমবায়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি-উন্নয়ন, কুটিরশিল্প স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এতে সর্বস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকেও গ্রামবাসী রক্ষা পাবে।

৭. **মৎস্য-চাষ, পশুপালন, দুগ্ধ-খামার তৈরি :** গ্রামের মানুষদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যতই যুক্ত করা যাবে ততই গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটবে। এ জন্য গ্রামীণ জনশক্তিকে কৃষিকাজের পাশাপাশি মৎস্যচাষ, পশুপালন, হাঁসমুরগির খামার স্থাপন ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার : দেশের বৃহত্তর স্বার্থে গ্রাম-উন্নয়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সরকারকে পাঁচসালা পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু কেবল শহর নয়, যুগপৎ গ্রামও হতে হবে। গ্রামকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নতি কখনও সম্ভব হবে না। জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অংশ আজও গ্রামই জোগান দিয়ে থাকে। শহরের চাল, ডাল, সবজি, মাছ গ্রাম থেকেই আসে। শহরের জনগণকে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রাম। অথচ সেই গ্রামই সবচেয়ে অবহেলিত। দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনেই তাই গ্রামের উন্নয়ন অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা

ভূমিকা : যোগাযোগের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, যোগাযোগের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের যোগ অবিচ্ছেদ্য। যেমন পরিবহণ যোগাযোগ উন্নত হলে কৃষিজাতপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল সহজে, স্বল্পব্যয়ে স্থানান্তর করা যায়। উৎপাদন ও বিপণন সহজতর হয়। এতে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। তাই বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে যোগাযোগকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকারভেদ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অকল্পনীয় গতিশীলতায় বিশ্ব আজ প্রবেশ করছে যোগাযোগ ও তথ্যবিপ্লবের যুগে। মানুষ ক্রমাগত তার জীবনযাপনে স্থানের দূরত্ব, সময়ের সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূল বাধা কাটিয়ে নিজেকে যুক্ত করছে যোগাযোগের মহাসড়কে। সমার্থক হয়ে উঠছে যোগাযোগ ও উন্নয়ন। যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। যেমন : সড়ক যোগাযোগ, রেল যোগাযোগ, নৌ-যোগাযোগ, বিমান যোগাযোগ, ই-মিডিয়া অর্থাৎ মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ। বিশ্বব্যবস্থার বহুমাত্রিক এ প্রক্রিয়াকে বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন বলা হয়। বিশ্বায়নের ফলে মানুষ ভাষার ব্যবধান, ভৌগোলিক দূরত্ব, সংস্কৃতিগত পার্থক্য, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি অন্তরায় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

সড়ক, রেল, নৌ এবং বিমান যোগাযোগ : সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর ও গ্রামভিত্তিক কাঁচামাল, শিল্পপণ্য সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য দ্রুত স্থানান্তর সহজ হয়েছে। কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য বাজারজাতকরণ, যাতায়াত ও পরিবহণ, বনজ সম্পদের সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সড়ক-যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। পল্লী-উন্নয়নই দেশের উন্নয়ন এবং তার জন্য সড়ক-যোগাযোগের বিশেষ অবদান রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে সড়ক উন্নয়ন ব্যবস্থা। এতে যাত্রীসাধারণ ও মালামাল পরিবহণে সুবিধা অনেক বেড়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেলপথের গুরুত্ব কম নয়। যাত্রী পরিবহণ, পণ্যসামগ্রী পরিবহণ, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন, বাজারব্যবস্থা সম্প্রসারণ, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, রাজস্ব আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে রেলপথের অবদান অপরিসীম।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌপথের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। বাংলাদেশে নদীপথে যোগাযোগের পরিমাণ প্রায় সাড়ে আট হাজার কিলোমিটার। তবে এই পথের সবটুকুতে সারাবছর নাব্যতা থাকে না। নৌপথে স্টিমার, লঞ্চ, কার্গো, ইঞ্জিনচালিত নৌকা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যজাহাজ পণ্যসামগ্রী বহন ও যাত্রী আনা নেওয়ার মাধ্যমে বিপুল আয় করে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিমান যোগাযোগ একটা নতুন মাত্রা স্থাপন করেছে। দ্রুত যাতায়াত, খাদ্য ও ঔষধ পরিবহণ, প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে বিমান-যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশে বাংলাদেশের শ্রমিক রয়েছে। এ বিপুল শ্রমশক্তি রপ্তানি এবং তাদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বিমানপথ। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিমান-যোগাযোগের একটি বিশেষ অবদান রয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ই-মিডিয়া : মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি অর্থনীতি। অর্থনীতির সঙ্গে মানুষের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন সবকিছু জড়িত। তাই বিশ্বায়ন বিশ্বমানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি আন্তঃপারিবারিক জ্ঞানময় যোগাযোগ হলেও তা একটি অর্থনৈতিক প্রত্যয় হিসেবে কাজ করে। আর এই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ড্যানিয়েল লার্নার উন্নয়নের গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন: গণমাধ্যমে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মানসিক গতিশীলতা বাড়ায়। এই মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যক উপাদান। এ কারণে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যমকে বলা হয়েছে মবিলিটি মাল্টিপ্লায়ার। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ গণমাধ্যমের ত্রিবিধ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন: ক. তথ্য জ্ঞাপন, খ. অংশগ্রহণ, গ. প্রশিক্ষণ। গণমাধ্যমের সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে আগামীতে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ

মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হবে। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির যোগাযোগও বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য-যোগাযোগের যে মহাসড়ক উন্মোচিত হয়েছে, তা বিস্ময়কর। প্রতিটি আধুনিক মানুষ এখন গ্লোবাল ইনফরমেশন অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন-এর আওতায় রয়েছে।

উপসংহার : মানব উন্নয়নের দুটো প্রধান দিক হল, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। আর এই দুটো দিকই যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যেসব কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণসচেতনতা ইত্যাদির প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে যোগাযোগ। যোগাযোগ মাধ্যম আজ সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার; এমনকি যে-কোনো যুদ্ধের চেয়েও শক্তিশালী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগের অবদান প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক।

শিশুশ্রম

ভূমিকা :

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

শিশুরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু একদিন বড় হয়ে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সে জন্য শিশুকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। উন্নত বিশ্বে তাই শিশুদের কল্যাণ ও বিকাশের জন্য নানারকম পরিচর্যার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে অধিকাংশ শিশুরই উপযুক্ত কোনো পরিচর্যা করা হয় না। বরং জীবনের শুরুতে তাদের বের হতে হয় জীবিকার খোঁজে। নিয়োজিত হতে হয় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে। শিশুশ্রম তাই এ দেশে খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। অথচ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সর্বনাশা ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা কেউ ভাবেন না।

শিশুশ্রমের প্রকৃতি : অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিশুদের খুব ছোটবেলা থেকেই উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। জীবিকার তাগিদ এমনই যে, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাদের যেতে হয় কাজের সন্ধানে। দরিদ্র পরিবারে অধিক ছেলেমেয়ে হওয়ার কারণে অসচ্ছল বাবা-মা তাদের সন্তানদের ঠিকমতো খাবার-দাবার দিতে পারে না। পিতামাতার আর্থিক দুরবস্থার কারণে শিশুরা অল্পবয়সেই শ্রমদানে বাধ্য হয়। যে-কোনো কাজে যৎসামান্য মজুরিতে নিয়োজিত হয়ে শিশুরা শ্রম দেয়। শিশুশ্রমের ক্ষেত্র বেশ প্রসারিত। বাসাবাড়ির কাজ, হোটেলে ধোয়ামোছার কাজ, গ্যারেজে গাড়ি মেরামত, গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, নালা-নর্দমায় টোকাইর কাজ, ইট ভাঙা, পাথর ভাঙা থেকে শুরু করে হেন কাজ নেই যা শিশুদের দ্বারা করানো হয় না। একধরনের অসৎ লোক আছে, যারা নানা কায়দায় শিশুদের অপহরণ করে বিদেশে পাচার করে দেয়। বিদেশে সেই শিশুদের উটের জকিসহ নানারকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্যই শিশুরা শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত হয়।

শিশুশ্রম ও আন্তর্জাতিক আইন : বিশ্বের প্রতিটি দেশেই শিশু-অধিকার একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। জাতিসংঘ সনদে শিশু-অধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও এই সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। তাই এ দেশের শিশুদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। শিশু অধিকারের আওতায় আঠারো বছরের নিচ পর্যন্ত বয়সী সকলকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শিশু অধিকার আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে: 'ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, অর্থনৈতিকভাবে শোষণ শিশুদের অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। শিশুর সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করবে যেসব, সেসব বিপদ থেকে শিশুদের রক্ষা করতে হবে (ধারা ৩২)। শিশুদের সকল প্রকার হয়রানি, নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে হবে (ধারা ৩৪)। শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে (ধারা ২৮)।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন—

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

এ কথার বাস্তবায়ন আজো সম্ভব হয়নি। বিশ্বের নানা জায়গায় চলছে যুদ্ধ। আর এসব যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। শিশুর পাঁচটি মৌলিক অধিকার শুধু ঘোষণাপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে অমানবিকতায়। অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে আমাদের দেশের হাজার হাজার শিশু।

শিশুশ্রম বন্ধকরণে কতিপয় পদক্ষেপ : এ দেশে জনসংখ্যার প্রায় ৪৪% দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। পরিবারের আর্থিক চাপে শিশুরা শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। দরিদ্র পরিবারে অধিক জন্মের হার শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রম প্রতিরোধে সীমিত আকারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :

১. শিশুদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রণয়ন।
২. মেয়েদের জন্য এস.এস.সি. পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন।
৩. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিনামূল্যে শিক্ষাসামগ্রী প্রদান।
৪. উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
৫. পোশাকশিল্পের শিশুশ্রমিকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

সরকারের এসব নীতিমালার পাশে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন:

১. সরকারের পাশাপাশি N.G.O.- গুলো প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। এই ব্যবস্থায় পথশিশু ও অবহেলিত শিশুদের সম্পৃক্ত করা উচিত।

২. কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতেও কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে।

৩. শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের শিশু মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

৪. শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। এর জন্য সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে হবে।

৫. শিশুপাচার কঠোর হস্তে রোধ করতে হবে। শিশু পাচারকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

৬. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে দরিদ্র শিশুদের সম্পৃক্ত করা যায় কিনা, ভেবে দেখতে হবে। এদের সাহায্যের জন্য অন্য কোনো কর্মসূচি নেওয়া যায় কিনা, তা যাচাই করা দরকার।

৭. দরিদ্র শিশুদের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয় নিশ্চিত করতে হবে। শিশু-অধিকারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৮. শিশু-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে গণসচেতনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার : বাংলাদেশের শ্রমবাজারে শিশুশ্রম একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। হঠাৎ করে শিশুশ্রম বন্ধ বা নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার আগে দেখা প্রয়োজন, শিশুরা কেন শ্রম দিতে বাধ্য হয়। এর কারণগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুশ্রম হ্রাস করতে হবে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ। সে হিসেবে সরকারের যেমন যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনি জনগণকেও শিশুশ্রমের ভবিষ্যৎ পরিণতি ও ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অভিহিত করতে হবে। তবেই বাংলাদেশে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা সম্ভব।

জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা

ভূমিকা : আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই নারী। সংসারে তারা শুধু বধূ-মাতা-কন্যার ভূমিকা পালন করে না। দেশের উন্নয়নে, দেশগড়ার কাজে, সমাজের মঙ্গলে, মানবসভ্যতার, অগ্রগতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অপরিসীম অবদান রেখে চলছে। নারীসমাজের এসব অবদানের কথা স্বীকার করতে গিয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন—

> বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

জাতিগঠনে, দেশের উন্নয়নে যুগে যুগে নারীরা রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। চাঁদ সুলতানা, লক্ষ্মীবাই, সুলতানা রাজিয়া, সরোজিনী নাইডু, মাদার তেরেসা, বেগম রোকেয়া, কবি সুফিয়া কামালের মতো মহীয়সী নারী দেশরক্ষায়, দেশগঠনে, জাতির উন্নয়নে রেখেছেন অসামান্য ও স্মরণীয় অবদান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও নারীদের অবদান অসামান্য।

নারীশিক্ষা ও নারীউন্নয়ন : নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, 'তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।'

শিক্ষা মানুষকে দেয় আত্মশক্তি, কর্মক্ষমতা, মনুষ্যত্ববোধ ও সুস্থ জীবনচেতনা। দুঃখজনকভাবে সত্য, আমাদের দেশে দীর্ঘকাল নারীশিক্ষা ছিল অবহেলিত। এর জন্য আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা যেমন দায়ী, তেমনি নারীরাও কম দায়ী নয়। প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা ছিল চরমভাবে অবহেলিত, নির্যাতিত। নানা সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে নারীরা ছিল অনেকটা বন্দিনী, অবরোধবাসিনী।

এ দেশে নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মহীয়সী বেগম রোকেয়া। এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন শিক্ষিত নারীসমাজ ও জাতিগঠনে পুরুষের পাশাপাশি সমান শক্তি ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে।

সম্প্রতি বেজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের স্লোগান ছিল— 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন।' আমাদের দেশে আজ অফিস-আদালতে, কলকারখানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সব জায়গায় সব কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এখন সমানভাবে এগিয়ে আসছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী তার শ্রম, মেধা, জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এগিয়ে চলছে। চিকিৎসা, প্রকৌশল, কম্পিউটার, গবেষণা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সবক্ষেত্রেই তারা যথাযোগ্য অবদান রাখছেন।

নারীর ক্ষমতায়ন : নারীর অবারিত কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত ও নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুবই দরকার। কারণ, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে দূরে রেখে কখনো দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে নারীরা যত বেশি প্রবেশাধিকার পাবে, তত তারা দেশের উন্নয়ন ও জাতিগঠনে বিশেষ অবদান রাখার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশে বর্তমানে পোশাকশিল্পে রপ্তানি আয় প্রায় পঁয়ষট্টি ভাগ। আর এ ক্ষেত্রে নারী-শ্রমিকদের অংশগ্রহণ প্রায় আশি শতাংশ। সুতরাং দেখা যায়, জাতীয় আয়ের প্রায় পঁয়ষট্টি ভাগই নারীদের হাতে অর্জিত হয়। এটি সম্ভব হয়েছে, পোশাকশিল্পে নারীশ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার কারণেই।

জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা : শিক্ষিত মা শিক্ষিত জাতির জন্ম দেয়। মায়ের দোষ-গুণ নিয়ে সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর যাতে আদর্শবান, সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে, তার জন্যে শিক্ষিতা জননীর প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে উপবৃত্তি প্রচলনের ফলে নারীশিক্ষার হার যথেষ্ট বেড়েছে। এটা আমাদের সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম লক্ষণ।

সামাজিক অপবিশ্বাস ও কুসংস্কার নারীদের আত্মবিকাশের প্রধান অন্তরায়। এসব কুসংস্কার নারীর অধিকারকে সংকুচিত করে। কুসংস্কারের কারণে তারা নিজের মতামত সাহস করে ব্যক্ত করতে পারে না। কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে নারীদের বের করে আনতে পারলে তারা জাতিগঠন ও দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। আশার কথা যে, বর্তমানে বাংলাদেশের নারীসমাজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, সমাজ উন্নয়নসহ নানাক্ষেত্রে নিজের শ্রম, মেধা প্রয়োগ করে জাতিগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

উপসংহার : নারীশিক্ষার ব্যাপারে অতীতের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। লিঙ্গবৈষম্য বা জেন্ডার ক্লাসিফিকেশন অনেক হ্রাস পেয়েছে। সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদাকর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এসব অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে নারীর ক্ষমতায়ন যত বৃদ্ধি পাবে, জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকারও তত প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : বাংলাদেশে যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে দুর্নীতি। কারণ, দুর্নীতিই আজ একশ্রেণীর মানুষের কাছে প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্চপর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির কালো থাবা বিস্তার লাভ করেছে। দুর্নীতির কারণে জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অগ্রগতির চাকা পশ্চাৎমুখী হচ্ছে। আমাদের এই সামাজিক ব্যধি সারাতেই হবে। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জন করতেই হবে।

দুর্নীতির সর্বগ্রাসী রূপ : দুঃখের ও লজ্জার বিষয় যে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপে পরপর পাঁচবার বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় প্রথম সারিতে নিন্দিত অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। দুর্নীতির বিস্তার দেখা যায় সমাজের সর্বস্তরে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বেমালুম হজম করে ফেলা, সরকারি সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করা, গরিবের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণের টিন, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি আত্মসাৎ করা, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চুরি, আয়কর ফাঁকি, শুল্ক ফাঁকি, চাকরির নামে হায়-হায় কোম্পানি খোলা, চোরাচালান, কালোবাজারি, শেয়ারবাজারে কারচুপি, প্রকৃত অপরাধের অভিযোগে থানায় মামলা না নেওয়া, কোথায় নেই দুর্নীতি? এমনকি দুঃস্থ মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত গম, এতিমদের বস্ত্র, দুর্গত মানুষের জন্য ঢেউ টিন ও খয়রাতি সাহায্য নিয়েও দুর্নীতি হয়েছে। উন্নয়নের নামে টেন্ডারবাজি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরিতে নিয়োগ, যোগাযোগ, এমনকি বিচারব্যবস্থায়ও দুর্নীতির আছর পড়েছে। সীমাহীন দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। মূল্যবোধ, ন্যায়নীতির প্রতি মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। যে দেশের মানুষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, সে দেশের মানুষ কখনো দুর্নীতির কাছে পরাজিত হতে পারে না। বাংলাদেশে দুর্নীতির ভয়াবহ ছোবলে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন জর্জরিত। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার বিভাগ সবকিছুকেই কলুষিত করেছে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। চাঁদাবাজিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে, টেন্ডারবাজি, টোলবাজি ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্নীতি সন্ত্রাসীর চরিত্র ধারণ করেছে।

দুর্নীতি উন্নয়নের অন্তরায় : বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। সাধারণ মানুষের শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সাফল্য দুর্নীতির কারণে ম্লান হয়ে যায়। দেশপ্রেমহীন নেতানেত্রী এবং দলতন্ত্রের ফলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন সার্বিকভাবে ব্যাহত হচ্ছে; লুণ্ঠিত হচ্ছে দেশের মূল্যবান সম্পদ; ব্যক্তি ও দলের স্বার্থে সেগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে। জনগণের দুঃখ ও দারিদ্র্য বিমোচন তো দূরের কথা, ক্রমেই বেড়ে চলছে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। সৃষ্টি হচ্ছে বিপুল ধনবৈষম্য। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সংস্থা ও দাতাদেশ, দুর্নীতিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় : আমরা জানি—সন্ত্রাস, কালোটাকা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন দুর্নীতিকে দিয়েছে ভয়াবহ ব্যাপ্তি। ফলে সাধারণ মানুষ তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে দুর্নীতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই

হবে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশকে এভাবে পতন-পচনের দিকে আমরা ঠেলে দিতে পারি না। রাজনীতি, অর্থনীতি যেহেতু একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক, তাই সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নকে প্রতিরোধ করতে হবে সর্বাগ্রে। যেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগে দুর্নীতি বিস্তার রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের পথ খুলে দিয়েছে, তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ ক্ষেত্রে সংস্কার করে নৈতিকভাবে উন্নত লোকদের নিয়োগ দিতে হবে। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ের ভিত্তিকে মজবুত করতে হবে। দুর্নীতির অভিশাপ থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, জনপ্রতিনিধি, আমলা, পুলিশ, কর্মচারী, পেশাজীবীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামাজিকভাবে নিন্দিত করতে হবে। দিতে হবে উপযুক্ত শাস্তি। সত্যিকার দেশপ্রেমিক জনদরদিকে নেতা নির্বাচিত করতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের প্রতি সমাজের সব মানুষের ঘৃণা জাগিয়ে দিতে হবে। তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। এ আন্দোলনে স্লোগান হতে পারে: 'দুর্নীতিবাজকে ঘৃণা কর', 'দুর্নীতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা কর', 'দুর্নীতিবাজদের প্রতিরোধ করার এখনই সময়'।

উপসংহার : দুর্নীতির মূলোৎপাটনে স্বাধীন দুর্নীতিদমন কমিশনকে আরো কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। এ কাজে সৎ, নির্লোভ ও দেশপ্রেমিক লোকদের সম্পৃক্ত করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। গণমাধ্যম, এনজিও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কালোটাকার মালিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের পথ রুদ্ধ করতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রত্যাশিত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের বিকল্প কিছু নেই।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ
(সংকেত)

ভূমিকা : জীবন-সংগ্রামী মানুষ প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করেই গড়ে তুলেছে সভ্যতার সৌধ। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। এদেশের মানুষও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বেঁচে আছে। বিপুল প্রাণের ক্ষয়, ফসলের ক্ষতি, সম্পদের হানি—সবকিছুর পরও মানুষ বেঁচে থাকে। নতুন করে গড়ে তোলে বাড়িঘর, জীবনের প্রবাহ।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বরূপ : ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, কখনো ভয়াবহ বন্যা, কখনো-বা খরা এ দেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সমুদ্রোপকূলে প্রাণ হারায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ। ১৯৮৮ সালের বন্যায় প্রায় এক কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৭ সালে দেশের মধ্য-অঞ্চলের বন্যায় ও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সোয়া কোটি মানুষ। খেতের ফসল, বাড়িঘর, গবাদি পশু, গাছপালা, সবই ধ্বংস হয়ে যায়। ভেঙে পড়ে দেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার : প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করার শক্তি মানুষের হাতে নেই। তবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ জন্য গণসচেতনতা দরকার, দরকার ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো অবকাঠামো নির্মাণ, উঁচু বাঁধ তৈরি। রাষ্ট্রীয় সুপরিকল্পনার মাধ্যমে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্র, সবুজ বেষ্টনী ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে।

উপসংহার : আমাদের দেশ ভৌগোলিক দিক থেকে অধিক দুর্যোগপ্রবণ। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যেমন থাকা দরকার তেমনি জনসচেতনতারও প্রয়োজন। প্রয়োজন দুর্যোগ মোকাবেলা করার মতো অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ

(সংকেত)

ভূমিকা : গ্রামই বাংলাদেশের প্রাণ। শহর-বন্দর যা কিছু আছে, তা দাঁড়িয়ে আছে কৃষিনির্ভর আটষট্টি হাজার গ্রামকে ভিত্তি করে। গ্রামীণ সমাজ জোটবদ্ধ সমাজ। এ সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবই একসাথে হয়ে থাকে। কেউ বিপদে পড়লে অন্যরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বিয়ে-শাদি, উৎসব-আয়োজনেও সবাই সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

গ্রামীণ জীবনের সুখ : বাংলাদেশর গ্রামগুলো অতীতকালে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল। এক কথায় তাকে বলা হত সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলা। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ছিল। পারিবারিক ও আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে গ্রামের মানুষ এক-একটি অঞ্চলে বসতি গড়েছিল। জনসংখ্যাও এত বেশি ছিল না। অভাব-অনটন, হাহাকার এতটা প্রকট ছিল না। মোটামুটি সচ্ছল, সুখী ছিল গ্রামের মানুষ। বর্তমানে গ্রামের সেই অবস্থা আর নেই।

গ্রামীণ জীবনের দুঃখ : জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে ভেঙে গেছে গ্রামের সেই ঐতিহ্যময় সুখী পারিবারিক জীবন। সেখানে সেই সম্প্রীতি আর নেই। শিক্ষিত গ্রামের ছেলেটি পড়ালেখা শেষ করে চাকরি পাওয়ার পর পরিবার নিয়ে আর গ্রামে থাকছে না। ফলে আগের মতোই অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিতরাই গ্রামে থাকছে। ভেঙে পড়া পথ-ঘাট, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অশিক্ষা, অচিকিৎসা, আর অন্ধকার—এ সবই জগদ্দল পাথরের মতো গ্রামীণ জীবনের দুঃখ হয়ে চেপে বসে আছে আজো।

উপসংহার : আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে দেশ বাঁচবে—এ কথা অতীব সত্য। সুতরাং গ্রামকে অবহেলা করে কখনো দেশকে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। গ্রামীণ জীবনে যেমন সুখকর অনেক সংস্কৃতি আছে, তেমনি অনেক কুসংস্কার, কু-প্রথা চালু রয়েছে। তাই বলা যায় গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ দু-ই বিরাজমান।

যানজট

(সংকেত)

ভূমিকা : বাংলাদেশের অধিকাংশ শহরে যানজট নাগরিক জীবনের নতুন সমস্যা। ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় নষ্ট হয় যানজটে।

যানজট পরিস্থিতি : যানজট বলতে গেলে নিত্যকার ঘটনা। স্কুল ও অফিসে সময়মতো পৌঁছানো যায় না। চাকরিপ্রার্থী, পরীক্ষার্থী, ট্রেনযাত্রী নিদারুণ সমস্যার মুখোমুখি হয়। দমকল ও অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ি যানজটে আটকা পড়ে জরুরি সেবা দিতে ব্যর্থ হয়। যানজটে পড়লে সময়ের যথেষ্ট অপচয় ও কাজকর্মের বিপুল ক্ষতি হয়।

প্রতিকারের উপায় : ট্রাফিক আইনে কড়াকড়ি করা, বিশেষ বিশেষ সড়কে ব্যস্ত সময়ে একমুখী যান চলাচলের নিয়ম চালু করা, যত্রতত্র বাস দাঁড়ানো বন্ধ করা, অবৈধ দখল থেকে ফুটপাত মুক্ত করা, সড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা; অফিস-আদালত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজ বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি যানজট সমস্যা নিরসনে সহায়ক হতে পারে।

উপসংহার : সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর না হলে ভবিষ্যতে যানজটের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

সমাপ্ত

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য